

ଆନନ୍ଦକୁ
ଆମକୁ

ଆମିତେଜନ



ଶିଳାଲିପି
୧୧, ନୀତାରାମ ପୋଷ ଷ୍ଟିଟ
କଟକ-୭୫୧୦୦୨

প্রকাশক : শ্রীমঙ্গলকান্তি বোষ
৫১, নীতারাম বোষ স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০০২

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৫৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক : শ্রীরামপ্রসাদ নাগ
সারদা প্রিন্টার্স
১৪ এ, ত্রিগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

আমার সমস্ত মারমৃত কর্মের প্রথম ও প্রধান প্রেরণাদাতা
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মধুম অধ্যক্ষ
পরমপূজনীয়
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজকে
সর্বোচ্চ প্রণাম ।

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যি সত্যিই ‘আনন্দরূপ’ ছিলেন। ‘আনন্দময়’ নয়, ‘আনন্দরূপ’, স্বয়ং ‘আনন্দ’। ‘আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যক্তানাং’ (তৈঃ উঃ ৩।৬।১)। ব্রহ্মই আনন্দ, আনন্দই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হয়েছিলেন, কারণ তিনি ব্রহ্মকে জেনেছিলেন— ‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ (মুণ্ডঃ উঃ ৩।২।৯)। শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানেই যেতেন সেখানেই আনন্দের হাট বসে যেত। দলে দলে সেখানে লোক এসে জড় হত, কিসের যেন দুর্বার আকর্ষণ! আনন্দরূপের কথা শুনে আনন্দ, গান শুনে আনন্দ নৃত্য দেখে আনন্দ। তাঁকে দেখলে আনন্দ, তাঁর কথা চিন্তা করলেও আনন্দ। তাঁকে ঘিরে সর্বদা এক আনন্দের পরিমণ্ডল বিরাজমান। তিনি সব আনন্দের উৎস।

স্বামী প্রভানন্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার কয়েকটিকে নিয়ে এই বই। ‘আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ’—বইয়ের এই নামটি সার্থক নাম, কারণ প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-রূপটি সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, তা হচ্ছে তাঁর আনন্দরূপ। এই দিক থেকে ‘শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ’ প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বইটিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। যে-দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে অভিনব, তা লেখকের ভাব ও ভাবার নৈপুণ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু সবগুলি মিলিয়ে একটি সুসংগত চিত্র ফুটে ওঠে। বইখানি সব জ্ঞানীর পাঠককে আনন্দ দান করবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

লোকেশ্বরানন্দ

নিবেদন

ভূঃসাধ্য এক সেতুবন্ধন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শ-গ্রাহ্য বাহ্যজগৎ ও অতীন্দ্রিয় এক আন্তর জগতের মধ্যে স্থগম সেই সেতুশব্দ। প্রাচীন ও নবীন, লৌকিক ও অলৌকিক, আধ্যাত্মিক ও ঐহিক তাঁর জীবনসেতুতে সন্মিলিত। সর্বদাই তিনি ঈশ্বরে আস্থার। সমাধিস্থ ও প্রকৃতিস্থ দুই তরেই তাঁর বহুদল সঞ্চারণ। সর্বদা ভিতরে তাঁর যোগসন্ধি, এমন কি বাবতীয় লোককল্যাণকর্মেও ঘটেছে তার আত্মপ্রকাশ। ফলে তাঁর জীবন কিঞ্চিৎ রহস্তাবৃত হলেও আনন্দঘন ও অনিন্দ্যাত্মক। সাধন-ভজনে, পোশাকে-আসাকে, চলনে-বলনে সমগ্র জীবনচর্চাতেই তিনি অনন্তস্বতন্ত্র।

চিৎ-জড়ের সন্মিলনে বিরচিত এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের জগৎ-মালক। সেখানে মাহুকের মাঝখানে, লোকায়ত এই জনজীবনের একজন হয়ে আনন্দস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছেন প্রায় একাধিক বছর। তিনি অকাতরে বিতরণ করেছেন আনন্দ। মহৎ শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত নৃত্য নাট্য চিত্র ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পের চর্চা আনন্দপিপাসু মাহুকে দিয়েছে অব্যতের স্পর্শ। জগৎ-মালকের চিৎ-জড়-গ্রন্থির রহস্ত অন্বেষণ করে বিরাজমান অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ। অপ্রতিরোধ্য রূপগন্ধ শক্তিমান পরমপুরুষ। নূতন যুগের যুগপুরুষ। তিনি বোধে বোধ করেন যে, বিশ্ববৈরাগের সর্বত্র অতুল্য পরমসত্য একটিই, সৎ-চিৎ-আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সত্যই ‘অপোরগীর্য়ান’, তিনিই ‘মহতো মহীয়ান’। তাঁরই বিচিত্র ক্ষুরণ, বাহ্য ও আন্তর জগতের সব কিছুতে। এবং তারই শ্রেষ্ঠ অভিপ্রকাশ মাহুকের মধ্যে। চিৎ-জড়ের মেল-বন্ধনে বাঁধা মাহু। সে জানে না যে তারই মধ্যে গ্রন্থিত সেই পরমসত্য, সকল আনন্দের অমল উৎস। জানে না যে একমাত্র সেই সত্যের উপলব্ধিতেই জীবন চির আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে। এই স্বর্ণসম্ভব সত্য সম্বন্ধে বেতসপ্রায় মাহুকে মানহীন করাই ছিল কল্যাণচিকীর্ষু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনা, একক অধিষ্ট। শুধু তাই নয়। এ বিষয়ে মানবদরদী শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষমতানৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। শিষ্য বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তাই বলেছিলেন, “পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাঁদার তালের মত হাতে দিয়ে ভাঙত, পিটুত, গড়ত, স্পর্শমাজেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতনভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়ি আত্মক ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি না।” এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ জীবন-শিল্পী। জীবন-শিল্পীরূপেও গ্রহণ করেছে বিশ্বের মানব সমাজ।

দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র চুরবগাহী হলেও তাঁর সকল আত্মল-প্রয়াসের মধ্যে উৎসারিত হত অপরূপ উজ্জল আনন্দধারা। স্থান কাল

ভেদে আনন্দস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের এই আনন্দোৎসার যে কত বিবিধ বিচিত্র আনন্দাবর্ত সৃষ্টি করেছে তারই আংশিক পরিচয় অণ্টু হাতে পরিবেশনের চেষ্টা করেছি। এই আনন্দাবর্তে অবগাহন করে ও সদানন্দময় মহৎ জীবনের অন্বেষণ করে পাঠক যদি সামান্যতম আনন্দরস গ্রহণ করতে পারেন তাহলেই লেখক নিজেকে ধন্য জ্ঞান করবে।

প্রায় পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের কালে লেখক এই গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে। 'উদ্বোধন' 'বিশ্ববাকী' ও অন্যান্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় তার এই বিষয়ে বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এইসব পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ। সেসময়ে কোন গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা ছিল না। সেই নিবন্ধগুলির কয়েকটি সংকলিত করে বর্তমান গ্রন্থ।

এই কাজে ঝারা প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী নির্বাহানন্দজী মহারাজ, স্বামী হিরণ্যরানন্দজী মহারাজ, স্বামী লোকেশরানন্দজী মহারাজ, স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, প্রয়াত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী মহারাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। গবেষক অধ্যাপক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বহুর উৎসাহদান এবং 'মাষ্টারমশায়ের' শৌভ্র শ্রীঅনিল গুপ্ত, সাংবাদিক শ্রীপ্রণবশু চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক শ্রীনিচেকেতা ভরদ্বাজ এবং আলোকশিল্পী শ্রীব্রজকিশোর সিন্হা ও শ্রীপার্বসারথি নিয়োগীর বিবিধ সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করছি।

শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদপট রচনা করেছেন। তাঁকেও আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের ত্র্যম্বকচরী তরুণ ও তাঁর সহকর্মীদের সাহায্য ভিন্ন এত অল্প সময়ে গ্রন্থ প্রকাশনা সম্ভব হত না। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা জানাই। প্রকাশক শ্রীঅরুণকান্তি ঘোষের তত্ত্ববধানে প্রেসের কর্মিগণ সযত্নে ছাপানোর কাজ করেছেন, তাঁরা সকলেই ধন্যবাদার্থ।

প্রধানত স্বল্প সময়ে গ্রন্থটির মুদ্রণকার্য সমাপ্তির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা সবেও কিছু প্রমাদ থেকে গেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

এই গ্রন্থ থেকে লেখকের প্রাপ্তব্য সকল অর্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বৃদ্ধ ও কৃৎ সাধুদের সেবার ব্যয়িত হবে।

স্বামী প্রভানন্দ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীরামকৃষ্ণের নামরহস্য	... ১
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা	... ১২
শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা	... ১৮
শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা	... ৩৫
শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন	... ৪৬
শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৬১
একটি ব্রাহ্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে বাবুরাম	... ৭২
কীর্তনে-নর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ	... ৯৮
শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসম্বন্ধ	... ১৫৪
‘হরেন্দ্রের পট’	... ১৫৫
শ্রামপুত্রে কালীপূজা	... ১৬৭
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী	... ১৮৫
নরেন্দ্রকে লোকশিকার চাপরাস দান	... ২০৭
মহাসম্মতির পরের তিনদিন	... ২২৬
২৩শে আগষ্ট, ১৮৮৬	— ২৩৮
রামকৃষ্ণ মঠে প্রথম কালীপূজা	... ২৪৭



ଆନନ୍ଦନାଥ ଶିଳାସତ୍ତ୍ୱ

শ্রীরামকৃষ্ণের নামরহস্য

ধর্ম তারতর্ঘ্যের জনসাধারণের ভাবানুভূতির প্রধান আশ্রয়, সেই চিরন্তন ভাবানুভূতি আশ্রয় করেই বিংশ শতাব্দীতে এক অভূতপূর্ব সর্বভারতীয় আগরণ ঘটেছিল, যে আগরণ বিশ্বমানুষে ক্রমেই বিস্তারলাভ করেছিল। এই আগরণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল অনন্তসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ নামে আজ ইতিহাস-বিখ্যাত। তাঁর জীবন ও বাণীর অমোঘ প্রভাব উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি বিচিত্র ধারায় বিভিন্ন রূপে বিশ্বের আঙ্গিনাতে ছড়িয়ে পড়েছে যে বিশ্বিত লেখক তাঁর জীবনকাহিনীকে বলেছেন একটি phenomenon—যেন একটি প্রতীতব্যাপার। এই স্মরণীয় জীবননাট্যের যে নায়ক তাঁর নাম নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে।

কোন সন্দেহই নেই যে প্রথমদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও অন্তরঙ্গ তত্ত্বাবধায় সাধারণভাবে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে ‘রামকৃষ্ণ’ তাঁর পিতৃদত্ত নাম। কিন্তু কালক্রমে অল্পপ্রবেশ করে সন্দেহের বীজ। এবিষয়ে সম্ভবতঃ তাঁর ভাগিনের ছদ্মরামের অবদানই প্রধান। কিন্তু অধিকাংশ অন্তঃকর্ত্তের মনের ভাব ছিল, “দর্শনেই কৃতার্থ, আমাদের পক্ষে নামতথ্য উত্থাপনে কৌতূহল হয় নাই।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলায়ত, পৃ: ৬৩) শ্রীরামকৃষ্ণ নাম কে দিয়েছিলেন, এবিষয় নিয়ে কেউ তখন তেমন মাথা ঘামাননি, প্রয়োজনও বোধ করেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে কি অন্তঃকর্ত্ত মহলে কি বাইরের পরিবেশে তিনি ‘পরমহংস’ নামেই পরিচিত ছিলেন। প্রথমদিকে পত্রপত্রিকাতেও উল্লেখ থাকত Ramkrishna, a Hindu devotee known as a Paramhansa. (The Indian Mirror, dated Feb 20, 1876) আরও উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—‘শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস’ (ধর্মতত্ত্ব ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২), ‘পরমহংস রামকৃষ্ণ’ (ধর্মতত্ত্ব ২৮ জাহুয়ারী, ১৮৭৮), ‘শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস’ (অলম্ব সমাচার, ২২ এপ্রিল, ১৮৮২)। কিছুকাল পরে বেধা সেল তথুবা ‘পরমহংস’ বা ‘হকিমেশ্বরের পরমহংস’ শব্দের ব্যবহার। যেমন ১৮৮৬ জুলাইয়ের ২৮শে জাহুয়ারী ধর্মতত্ত্ব লিখেন ‘হকিমেশ্বরের পরমহংস মহাপ্রভুর অভ্যুদয়’

কঠিন রোগ।' ঐ পত্রিকা ২৮শে এপ্রিল তারিখে লিখলেন 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয় অপেক্ষাকৃত অনেক আগ্রহ হইয়াছেন।' নামের ব্যবহারের যে পরিবর্তন এবং সেই কারণে সম্ভাব্য তুলনাত্মক যে সম্ভাবনা তা নিরসনের জন্যই যেন The Indian Mirror, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় পরিষ্কার করে লিখলেন, 'Ramkrishna Bhattacharji, better known in the Hindu community as Paramhansa of Dakshineswar'. নতুন সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য শুধুমাত্র 'পরমহংস'ই প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার সংবাদ। সেখানে পাই, 'পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের সাক্ষ্যের ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়।' 'পরমহংসের মাহাত্ম্য চিনিবার শক্তি আশ্চর্য্য ছিল', 'পরমহংস জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন।' ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'বেদব্যান' লিখেন, 'তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবারাজ্য সংগ্রহে...' 'ক্রমে পরমহংসের অন্ন অন্ন বাহুজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল' ইত্যাদি। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় 'সখা' পত্রিকাও লিখেন, 'পরমহংসকে দেখিয়া ত্রৈলোক্যবস্ত্র সেন মুগ্ধ হন, 'ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকা ও সে রূপ লাভন করা কেশবচন্দ্র সেন পরমহংস মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করেন।' তাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার The Theistic Quarterly Review, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যাতেও সাধারণভাবে শুধু 'পরমহংস' ব্যবহার করেছেন, যথা, 'Each form of worship...is to the Paramhansa a living and most enthusiastic principle of personal religion.'

তারিখ অনুযায়ী খ্রীষ্টীয়ামুত্তরকালীন অঙ্গনরূপ করলেই দেখা যাবে প্রথমদিকে উল্লেখ রয়েছে, কেশবচন্দ্র বলছেন 'পরমহংস মহাশয়', এদেশের গৌরী পণ্ডিত বলছেন, 'কোথা গো পরমহংসবাবু?' বিভাসাগর বলছেন 'পরমহংস' ইত্যাদি। কখনও কখনও কেউ ভক্তির আতিশয্যে 'পরমহংসদেব'ও ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে তিনি পরমহংস বা দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয়ামুত্তরকালীন ত্যাসী ও ল্যান্সি তত্ত্বের মধ্যেও 'পরমহংস' শব্দটিই ব্যবহার হত, যার স্থান পরবর্তীকালে অধিকার করেছিল ঠাকুর বা 'ঐঠাকুর' বা 'ঈশ্বী'। অন্তরঙ্গের মৌখিক আলাপ আলোচনাত্তেও দেখা গেছে, ঠাকুরের বৈখ্যকালীন সময়ে ত বটেই, তাঁর বহুসংখ্যক পরও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত

পরমহংস শব্দের ব্যবহার। মৌখিক কথাবার্তাতে যেমন অন্তরঙ্গ ভক্তদের লেখাতেও তেমনি পরমহংসদেব শব্দটির চল ছিল সমধিক। পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য তুলে ধরা যাক কয়েকটি নমুনা। স্বামী বিবেকানন্দ ৩০।১১.২৪ তারিখে লিখছেন, “The writer...keeping the very language of Paramahansa,” আবার ২৭।৪।২৬ তারিখে লিখছেন, “পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান।” ঠাকুরের অন্তর্গত সন্তানদের পত্রব্যবহারেও প্রথম দিকে দেখা যায় ‘পরমহংস’ শব্দের প্রচলন, ক্রমে সেখানে ‘শ্রীঠাকুর’ বা ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’ ইত্যাদি স্থানান্তরিত করেছিল। ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’ প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী রামচন্দ্র দত্তের ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত’ প্রকাশিত হয় ১২২৭ সালে রথযাত্রার দিন অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই। অবতরনিকাতে লেখা হয়েছে, ‘পরমহংসদেব সম্বন্ধে বাহা কিছু লিখিত হইল তাহার কিয়ৎংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়ৎংশ তাঁহার প্রমুখ্যৎ শ্রবণ করিয়াছি।’ এই গ্রন্থে প্রধানতঃ ‘পরমহংস’ শব্দেরই প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর এষ্ট ভাগ স্বামী সারদানন্দের ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’—পূর্বকথা ও বালাজীবন প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩২২ সাল এবং ‘সামকভাব’ ফাল্গুন, ১৩২০। শুক্লাব পূর্ণিমা ও উত্তরাব—যথাক্রমে জীবন ও আশ্বিন, ১৩১৮। ‘পূর্বকথা ও বালাজীবন’ খণ্ডে প্রধান চরিত্র ‘গদাধর’, অন্তর্গত তিনি ‘ঠাকুর’ বা ‘শ্রীশ্রীঠাকুর’ নামেই প্রধানতঃ অভিহিত হয়েছেন।

স্বামী অভেদানন্দের ‘আমার জীবন-কথা’ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্রমাস। এই গ্রন্থে লেখক ‘পরমহংসদেব’ ও ‘শ্রীশ্রীঠাকুর’ শব্দদুটির সার্বক সহাবস্থান ঘটিয়েছেন। একটি নমুনা তুলে ধরা যাক, “অবশ্য নিরঞ্জন বোম্ব প্রতিদিন পরমহংসদেবের দ্বারপালকরূপে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন।... অন্তর্ধারী শ্রীশ্রীঠাকুর নিরঞ্জনর কাণ্ডকারখানা বুঝিতে পারিয়া আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন...” (পৃ: ৭৬) অন্তর্ধারী তিনি ‘পরমহংসদেব’ ব্যবহার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শব্দের ব্যবহার এইসকল ক্ষেত্রেই ছিল খুবই সীমিত।

শ্রীঠাকুরের বসন্তরেল অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর অমূল্য ভায়েরীতে পরমহংসদেব বা ‘প’ হাত ব্যবহার করেছেন। এমনকি কথায়ও গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ছবিিকা বখন লেখেন তখনও পরমহংস শব্দের ব্যবহারই ছিল প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিজের প্রথম সাক্ষাতের পটভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, ‘তখন সিঁধু বলিয়াছিলেন, গদাধর দ্বারা একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।’ তা:

মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর ভাষ্যেতে ব্যবহার করেছেন 'Paramhansa'.

এই 'পরমহংস' শব্দ-ব্যবহারের উৎস সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। তৎসমকালী পত্রিকা আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ সংখ্যায় লিখেছেন, "সামুদ্রা রামকৃষ্ণকে পরমহংস বলিতেন এবং অম্বান হর তোতাপুরী এই উপাধি প্রদান করেক। অস্ত্রান্ত সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকালেও তৎ তৎ সাম্প্রদায়িক উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তৎসমুদয় এত গোপনভাবে রাখিয়াছিলেন যে আমরা কখন তাঁহার প্রামুখ্য প্রবণ করি নাই।...পরমহংস বৈদান্তিক সাধকদ্বিকের চরমাবস্থাকে বলে। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা জ্ঞানে সচ্চিদানন্দকে সার বোধ করাই পরমহংসের কার্য।"

অস্ত্রান্ত ঘটনার সংশ্যতসমূহ বিশ্লেষণ করেও বুঝা যায় পরমহংস নাম পূজ্যপাদ তোতাপুরীজীর প্রদত্ত। তোতাপুরীজী দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেও কেউ কেউ পরমহংস ব্যবহার শুরু করলেও এই নামের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় তোতাপুরীজীর নিজস্ব ব্যবহারের পর থেকে। এর পূর্বে তিনি পাগলা বামুন, ছোট বামুন, ছোট ভট্টাচার্য ইত্যাদি নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

স্বভাবতঃই প্রায় ওঠে তিনি কবে এবং কিভাবে রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হয়ে উঠলেন। দেখা যায় তাঁর জীবিতকালেই কোন কোন পত্রপত্রিকায়, বিশেষতঃ দেহান্তের পর বিভিন্ন লেখাতেও শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যবহৃত হচ্ছে। ম্যাকমুলার, টনী, ডিগবী সাহেব প্রভৃতির লেখায় তিনি Ramakrishna বা Ramkrishna। পরবর্তীকালে অধিকাংশের লেখায় বা কথ্যে তিনি শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বা রামকৃষ্ণের।

এই রামকৃষ্ণ নাম তাঁকে কে দিয়েছিল? এবং তার বিশেষ কোন কারণ ছিল কি? এ বিষয়ে সত্যমতের অভাব নাই। এ বিষয়ে প্রচলিত প্রধান সত্যমতগুলির সংক্ষেপে আলোচনা সর্বপ্রথম করা প্রয়োজন।

(১) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনকৃতান্তের' লেখক রামচন্দ্র দত্তের মতে "তাঁহাকে সকলে গদাই বলিয়া ডাকিত; কিন্তু প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ ছিল। ...গদাবিক্রম মাতা রামকৃষ্ণকে গদাধর বলিয়া ডাকিতেন।" (পৃ: ২৩) লেখক এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছুই আর বলেননি।

(২) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ'কার স্বামী সারদানন্দ লেখেন, "অনন্তর জাতকর্ম সমাপনপূর্বক বালকের রাস্তাশ্রিত নাম শ্রীযুক্ত শঙ্কর হির করিলেন এবং গদাধারে অবস্থানকালে নিজ বিচিত্র স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সর্বজনসমক্ষে শ্রীযুক্ত গদাধর নামে অভিহিত করিতে বনয় করেন।" (১। পৃ ৭৭)

তিনি আরও লিখেছেন যে ঐঠাকুর অবৈতবেদান্তে সিদ্ধান্তের পর “জাতিস্বরূপাত করিয়াই তিনি এইকালে সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্তমানকালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।” (২। পৃ: ৩৩০-১) ঐ গ্রন্থের ৩১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকাতে পাই, “আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষাদানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃ কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরমভক্ত সেবক, শ্রীযুক্ত মধুসূদনমোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটিই আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।”

অপর এক জীবনোলেখক ভগিনী দেবমাতার মতেও গদাধরকে রামকৃষ্ণ নাম দিয়েছিলেন তোতাপুরীজী। (Sri Ramakrishna and his disciples p. 43) লেখিকার তথ্যের উৎস স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

(৩) অপর একটি মতের প্রবক্তা বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। তিনি লিখেছেন, “তবে গদাধরের রামকৃষ্ণ নাম একটা রহস্য। যাঁর নাম তোতা, সেই নামবিরোধী বাগাবাদী, যিনি ঠাকুরকে দৈবীমায়। বলিতেন, তিনি যে আনন্দযুক্ত কোন নাম রাখিবেন, ইহা অসম্ভব। তবে হয়ত, প্রতিমধুর বা কটিকর নয় বলিয়া এবং অগ্রজদিগের নামের প্রথমে রাম শব্দটি থাকার বোধ হয় পরমভক্ত মধুসূদনাথ ‘রামকৃষ্ণ’ নাম রাখেন।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাসূত, পৃ: ৬৩)

(৪) উপরোক্ত মত অস্বীকার করেই যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুণ্ডিকার অক্ষয়কুমার সেন লিখলেন,

গদাধামে গদাধর কবি দরশন ।
পাইলেন কোলে হেন কুমার রতন ।
সেই হেতু রাখিলেন নাম গদাধর ।
তাকেন গদাই বলি করিয়া আদর ।
শুদ্ধনাম নাম রামকৃষ্ণ নাম খ্যাত ।
রামকৃষ্ণ পরমহংস কুবনে বিখ্যাত ॥ (পৃ: ৭)

এখানে প্রশ্ন উঠেছে, যে শুধু এই নাম দিয়েছিলেন তিনি কে? কেনারাম তট্টাচার্য, না ভৈরবী ব্রাহ্মণী, না তোতাপুরী, না অতঃ কেউ?

(৫) অপর একটি বিশিষ্ট মত প্রকাশ করেন শ্রীরামনাথ সিংহ ওয়কে গুরুদাস বর্মণ। তাঁর ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত’ গ্রন্থে উল্লেখ্যে ঐতিহাসিকভাবে বের হয় ;

গ্রন্থকারে প্রকাশ লাভ করে ১৩১৬ সালের ২৩শে ফাল্গুন। এই গ্রন্থের ছত্রিকাতে পাই, এই গ্রন্থের প্রধান উপাধান ঠাকুরের জীবনে নানাবিক্রিশ বছরের সেবক ও সঙ্গী স্বরানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি কথা বা' বরাহনগর মঠবাসিগণ সময়ে একটি খাতার লিখে রেখেছিলেন। এই গ্রন্থে আরও পাই, "বালকের নাম রাখা হইল রামকৃষ্ণ। কিন্তু ক্ষুদ্রায় পুত্রকে পূর্বদৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া গদাধর বা গদাই বলিয়া ডাকিতে ভালবাসিতেন, কাজেই অন্তঃস্বপ্নেও বালককে ঐ নামেই ডাকিতে লাগিলেন।" (১ম ভাগ, পৃ: ১০)

সুতরাং গ্রন্থকৃত তথ্যাদি হ'তে জানা যায় যে রামকৃষ্ণ নাম ছিল পিতৃদত্ত, নতুবা গুরু ভোতাপুত্রী-প্রদত্ত নতুবা প্রথম রসদার ও সেবক মুখুরানাথ-প্রদত্ত।^১

(৬) উপরে আলোচিত তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বারা অনুসরণ করে বিশ্লেষণমূলক বিচারের সাহায্যে শশিভূষণ ঘোষ আর একটি ধাপ এগিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের রাষ্ট্রাশ্রিত নাম সম্বন্ধে তাঁর অভিমতটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। স্বামী সারদানন্দজী আলোচ্য গ্রন্থকার সম্বন্ধে লিখেছেন যে, শশিভূষণ ঘোষনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে আত্মিকভাবে মেলাশেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং প্রথম রামকৃষ্ণ মিশন এসোসিয়েশনের বেশ কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রন্থকার লিখেছেন, "বিশেষ কারণবশতঃ পিতা তাঁহার গদাধর নাম রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের সকলেই তাঁহাকে গদাধর বলিয়া ডাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার বংশাঙ্কুরিক নাম তাহা বংশাবলী দেখিলেই বুঝা যায়। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাশি-নাম শকুন্তল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকা আচার্যের ও নারায়ণ জ্যোতিভূষণের প্রস্তুত কোম্পীতে তাঁহার রাশি নাম শকুন্তল রাখা আছে। কোম্পীগণনা ক্রিয়াকাল সময় জ্যোতির্বিগণ জাতকের রাশি অনুসারে কোন একটি নাম রচনা করিয়া থাকেন। অধিকা আচার্যের কোম্পী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসময়ের গণনা নয়, ইহা ১০৮১ বৎসর পরে তাঁহার পীড়ার সময় প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কৃতবাসিতে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য জ্যোতিষমতে তাঁহার নামের আত্মসমকর গ বা শ দুইটি বর্ণের একটি হওয়া

১। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত'-গ্রন্থের সম্পাদকের হাতে "ঠাকুরের ভাগিনের শ্রীমত স্বরানের হাতে এই নাম শ্রীমত ভোতাপুত্রী-প্রদত্ত। ঠাকুরের আত্মপুত্র শ্রীমত রামলাল ঠাকুরেরই নিকট তুলিয়াছিলেন যে, ঐ নাম বন্ধুধাবু রাখিয়াছিলেন।" (ঐ গ্রন্থ, পৃ: ৩ এর পাঠটীকা)

উচিত। সুতরাং তাঁহার রাশিনাম শব্দভাষ্য হইতে পারে এবং গদাধরও হইতে পারে। পিতা তাঁহার নামকরণের সময় বিশেষ কারণবশতঃ গদাধর নাম রাখেন, তাহাতে তাঁহার রাশিনামেই নামকরণ হইয়াছে। পিতা কর্তৃক তাঁহার যে শব্দভাষ্য বা শব্দচক্র নাম রাখা হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।” (শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৩১)

এখানে লেখক বলেন যে ‘রামকৃষ্ণ’ শ্রীঠাকুরের বংশোদ্ভূত নাম, কিন্তু এ নাম কে কোন সময় দিলেন সে সম্বন্ধে তিনি নীরব। সত্যকথা, তদানীন্তন গ্রাম বাংলার পুরুষদের সাধারণতঃ ‘ডাকনাম’ ও ‘রাশনাম’ ব্যতীত তৃতীয় নাম শোনা যেত না। কিন্তু জ্যোতিষী গণনার ভিত্তিতে শ্রীঠাকুরের নাম শব্দচক্র বা শব্দভাষ্য রাখা হইয়াছিল, এর ঐতিহাসিক সত্যতা ঘটখানি, তার চাইতে অনেক বেশী রয়েছে কল্পনার খোঁয়াসা। অপরপক্ষে রাশি-ভিত্তিক হোক বা পিতা ক্ষুদিরামের গদাধর নাম দিব্যদর্শনের লজ্জাই হোক শ্রীঠাকুরের বাল্যনাম যে গদাধর বা গদাই ছিল এবং শব্দচক্র বা শব্দভাষ্য ছিল না এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বরঞ্চ শ্রীঠাকুরের বাল্যকালের নাম প্রকৃতপক্ষে ‘রামকৃষ্ণ’ ছিল কি না এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ বহুস্তাবৃত রয়ে গেছে।

(৭) প্রাপ্ত আলোচনা থেকে ‘রামকৃষ্ণনামের’ তিনটি সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। কিন্তু চতুর্থ এক একমাত্র উৎস বলে পরবর্তীকালে দাবী করে বসেছেন নূতন এক ভাগীদার। ১৩৪৩ সালে দ্বারী কালীকৃষ্ণানন্দ গিরি তাঁর ‘শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমতী ভৈরবী যোগেশ্বরী’ গ্রন্থে দাবী করেছেন “মহামায়ার অংশভূতা শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেব্যাচ্ছাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত গুরু, তিনি পাচুকাগ্রহান এবং শিষ্টের নামকরণ যে করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করিবার আরও শাস্ত্র ও ব্যবহারসঙ্গত হেতু আছে।” (পৃঃ ৪২) তিনি আরও লিখেছেন, “‘রামকৃষ্ণ’ এই চতুরক্ষর নাম পূর্ণাভিষেককালীন ব্রাহ্মণী-কর্তৃক প্রদত্ত। ব্রাহ্মণীকৃ তথা ঠাকুরের কুলদেবতার নাম ‘শ্রীমতী’; সুতরাং ‘রাম’ এই কথাটির নির্বাচন সহজাতমের। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহে কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবলক্ষণ দেখিয়া চতুরাক্ষরী ‘রামকৃষ্ণ’-নাম যে নির্বাচিত হইতে পারে তাহাও স্বথবোধ্য।” (পৃষ্ঠা ৫৭) এই লেখকের যুক্তিতে শ্রীঠাকুরের ডাকনাম ছিল গদাধর বা সংক্ষেপে গদাই, কৃষ্ণ-প্রাণে তাঁর স্বাক্ষরিত নাম ‘শ্রীমতীনাথ’ এবং ‘রামকৃষ্ণ’ নাম তাঁর গুরু ভৈরবী যোগেশ্বরী-কর্তৃক প্রদত্ত। অপর এক সম্ভাব্য যুক্তির মধ্যে তিনি বলেছেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথায় রতে দক্ষিণেশ্বরে ডোতাপুতীর আবির্ভাব ঘটেছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীলাঙ্গন রতে সম্ভবতঃ ১৮৮০/৮১

খুঁটায়ে। ইখাযত বলেন, ব্রাহ্মণী ভোতাপুরীর পূর্বে ১৮৫২ খুঁটায়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কবিগঞ্জ গঙ্গাপ্রসাদ সেন খ্রীষ্টাকুরের কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা করেছিলেন ১৮৫৭।৫৮ খুঁটায়ে। (লীলাগ্রন্থ সাধকভাগ ১ম সংস্করণ) কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন ১৮৫৫।৫৬ খুঁটায়ে, যে সময়ে রাসমণি জীবিত ছিলেন (পৃ: ৫৭)। যথেষ্ট তথ্যাদি যুক্তির সাহায্যে উপস্থাপিত করলেও আমরা দেখতে পাই যে লেখকের এই রসাল দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের যে সময় তিনি দাবী করেছেন তা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়।

(৮) আবার স্মৃতিস্তম্ভ লেখক ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর “ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ”-গ্রন্থে একটি মনোজ্ঞ তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন “যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই ইহানীং রামকৃষ্ণ” তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত দেববাণী। এই বাণীতে নিজেই তিনি নিজ নামের প্রকাশক, বলা যায়। এই শ্রীরামকৃষ্ণ-নামই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারই ইচ্ছায়, চিন্ময় নামীর সঙ্গে চিন্ময় নাম একদিন স্বয়ং প্রকাশ হইয়াছিলেন ভক্তহৃদয়ে, অবিহ্বলদেয়ে স্বয়ম্বিভূত বেদমন্ত্রেণ মৃত, ইহাও বলা যাইতে পারে।” (পৃ: ১৭) এবং উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন, ‘কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেন্তে জানিয়া।’ এই তত্ত্বানুসারে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজ নামের প্রবর্তক হলেও নামটি সরাসরি দিয়েছিলেন সম্ভবতঃ তাঁর অধিসদৃশ পিতা।

এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-নামের বিভিন্ন দাবীদাওয়া সত্ত্বে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে এবার আমরা আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত অঙ্গুলরণ করব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ, সাধকভাগ, পরিশিষ্টে (বর্তমান সংস্করণে) দেখা যায় ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরের তত্ত্বসাধন আরম্ভ হয়েছিল ১২৬৭ সাল অর্থাৎ ১৮৬০-১৮৬১ খুঁটায়ে এবং ভোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ ঘটেছিল ১২৭১ সাল অর্থাৎ ১৮৬৪-৬৫ খুঁটায়ে। এদিকে অপর একটি নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যায়। রাসমণির দেবোত্তর দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছিল ১২৬৭ সালের ৮ই ফাল্গুন অথবা ১৮৬১ খুঁটায়ের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। এই দলিলাংশের মধ্যে পাওয়া যায় ১২৬৫ সাল অর্থাৎ ১৮৫৮ খুঁটায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সে সময়ে ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের মন্দিরে পূজা করছিলেন। দলিলে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য’র নামে বরাদ্দ রয়েছে নগদ ৫ টাকা এবং বাৎসরিক ৩ ছোড়া কাপড় ও ৪০ টাকার ব্যবস্থা। এই দলিলে স্থূলভাবে প্রমাণিত হয় যে তৈরবী ব্রাহ্মণী বা ভোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেই ঠাকুরের ‘রামকৃষ্ণ’ নাম প্রচলিত

হয়েছিল। হুতরাং রামকৃষ্ণনামের উৎস আক্ষণী বা পুরীজী কেউই নন।

অপর একটি দাবী রামকৃষ্ণ নাম দিয়েছিলেন মথুরানাথ। এবিষয়ে ইদানীং-কালের অগ্রতম জীবনীকার মানদাঁশঙ্কর দাশগুপ্ত তাঁর 'মুণ্ডাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে লিখেছেন, "...খুব সম্ভবতঃ রামকৃষ্ণ ও রামেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মথুরাবাবু [জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের নামের সহিত মিলে রাখিয়া] ঠাকুরের নাম রামকৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন।" (পৃ: ৭০ পাদটীকা)। হুঃখের বিষয় লেখকের এই একান্ত ব্যক্তিগত মতের সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'ঠাকুরের সরল বালকতাব, মধুর প্রকৃতি এবং স্বপ্নের রূপে' মথুরানাথ প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভাবভক্তি দৃঢ় হয় যখন তিনি বুঝতে পারেন যে "ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্ত নহেন; অগদগদা তাঁহারই প্রতি রূপা করিয়া ঠাকুরের শরীরের ভিতরে সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছেন।...মন্দিরের পায়ণময়ীই বা শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার জন্মপঞ্জিকার কথামত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, পূর্বার্ধ, পৃ: ১২৪-৫)। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে মথুরানাথের এই ধারণার পশ্চাতে রয়েছে তাঁর অগ্রতম অলৌকিক দর্শন—ঠাকুরের দেহে শিব ও কালীরূপ দর্শন, যা ঘটেছিল ১৮৬০-১৮৬১ খৃষ্টাব্দে (লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকতাব, পৃ: ৪৪৫)। ইতিপূর্বেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের দলিলের মধ্যে 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের' স্বশ্রুতি উল্লেখ রামকৃষ্ণ-নামে মথুরানাথের ভূমিকার দাবী নস্তাৎ করে। হুতরাং অবৈতাপ্রম-প্রকাশিত 'Life of Sri Ramakrishna' গ্রন্থে "Most probably it was given by Mathur Babu...as Ramlal, the nephew of Ramakrishna says on the authority of his illustrious uncle himself" (পৃ: ৫৩, পাদটীকা) প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না।

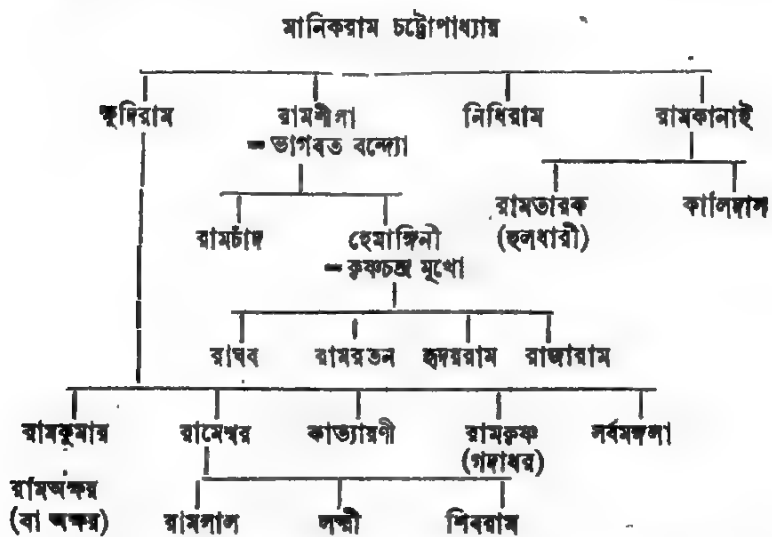
শ্রীঠাকুরের বংশ রাম-অল্পরাগী, রামের উপাসক। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন, "আমার বাবা রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামাংশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম।" (শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃ: ৪৫) রামোপাসক এই বংশের অধিকাংশ পুরুষের নাম অবতাবতঃই 'রাম' নামের সঙ্গে যুক্ত। হুতরাং গহজ ও স্বাভাবিকভাবেই মনে করা অস্বাভাবিক হবে না যে শ্রীঠাকুরের পিতৃদত্ত আসল নাম রামকৃষ্ণ, 'গদাধর' ছিল ডাক-নাম মাত্র।

তৃতীয়তঃ কেউ সন্দেহ তুলতে পারেন যে, যদি ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম 'রামকৃষ্ণ'ই হয়, তাহলে তাঁর লেখা পুঁথি কয়েকটির মধ্যে ঠাকুরের স্বাক্ষর 'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়' বাব বাব পাই কেন? উত্তরে বলা যায়, অধিকাংশ

কেন্দ্রে 'ঐগদাধর চট্টোপাধ্যায়' শব্দর থাকলেও একটি স্থানে অন্ততঃ ঐগদাধর শব্দর দেখতে পাই। (ঐগদাধরকর্মের গ্রন্থের গ্রন্থ প্রতিলিপি জটব্য)

চতুর্থতঃ আলোচ্য বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রমাণ ঠাকুরের নিম্নের উক্তি, বিশেষতঃ তাঁর উক্তি শ্রীমৎ মত জগীশ্বক্তির ভাষ্যরীতে পাওয়া গেলে তার মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকে না। দেখতে পাই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী (২রা ফাল্গুন) শনিবারদিন ঠাকুর তাঁর কণ্ঠে অসংখ্য যন্ত্রণার প্রসঙ্গে বলেছেন, “এই মুখে কত লবঙ্গ এলাচ ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি—বাঁচার আদরের ছেলে ছিলাম—রামকৃষ্ণবাবু—তারপর কত দীক্ষারী নাম হলো—তারপর পুঁজরক্ত আর এই যন্ত্রণা” (ভাষ্যের পৃঃ নং ৬৬১)। ঘরে সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন দেবেশ্রনাথ ব্রহ্মচারী ও সেবক লাটু। এই উক্তি থেকেও বুঝা যায় পিতা ক্ষুদ্রিয়াম তাঁর আদরের কনিষ্ঠপুত্রকে রামকৃষ্ণ নামে ডাকতেন, আদর করতেন। শোনা যায়, সময়ে সময়ে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল অস্ত্র দেব-দেবীর নামও। ঘাঘতীয় তথ্যাদি হতে জানা যায় যে এই তুবনবিখ্যাত রামকৃষ্ণ নাম তাঁর পিতা বালকের অল্পবয়সেই ব্যবহার করেছিলেন।

পক্ষমতঃ, ঠাকুরের বংশতালিকার নিম্নলিখিত নামগুলি ভালভাবে লক্ষ্য করা
দরকার।



খবর জারিযুক্ত কেবলবস্ত্রের প্রচারকার্য লিখতে সত্যতা করে বলেছিলেন, “আবার নার কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, কারকে বড় করা যায় না। ভগবান হাকে বড় করেন, তখন থাকলেও তাকে

লকলে জানতে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়।” (কথামৃত ভোগ/পরিশিষ্ট)। যে নামই দেওয়া হোক যুগান্ত প্রস্তুতি ফুল অজ্ঞাত থাকে না। একটি ব্যক্তিও কোনভাবেই চাপা থাকে না। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সপ্তম দর্শনকালে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আপনি কে?” তাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, “আমার কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ; কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ; আমি এখানেই (দক্ষিণেশ্বরে) থাকি।” রামপ্রসাদ ও রাজা রামকৃষ্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমানকালে তাঁদের চাইতেও অনেক বেশী পরিচিত এবং ইতিহাসে পরিচিত শ্রীরামকৃষ্ণ নামেই। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস বা শুধু রামকৃষ্ণ নামেই ভূবনবিখ্যাত।

বিশ্বকল্যাণের জন্য লোকসংগ্রহার্থ অবতীর্ণ হয়েছেন ঐশীশক্তি, অবতীর্ণ হয়েছেন ক্ষুদ্ররামগুণ-রামকৃষ্ণবিগ্রহ অবলম্বন করে। অবতীর্ণ শক্তির সূত্রে আবির্ভূত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ-ঘোষিত সত্যযুগ। এই যুগের নায়ক রামকৃষ্ণবিগ্রহে সম্পৃক্ত ঐশীশক্তি। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন: “সোহরং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণদ্বিতীয়ম্।” যে বিগ্রহে প্রকটিত হয়েছিল এই মহান শক্তি তাঁকে কে বা কারা প্রথম রামকৃষ্ণ নামে ব্যবহার করেছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিক কোতূহল থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু ঐ নরবিগ্রহ আশ্রয় করে যে মহান ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে—যাকে বলা হয়েছে রামকৃষ্ণ ফেনোমেনন তাঁর গুরুত্ব জন্মেই ব্যাপকতর ও গভীরতর হচ্ছে, তাঁর প্রভাব চতুর্দিকেই বিস্তারিত ও বিচিত্রভাবে অঙ্কিত হচ্ছে। এবং লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই প্রচার ও প্রসার ঘটেছে রামকৃষ্ণনাম অবলম্বন করেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি

ঐশীশক্তি অবতীর্ণ হয়েছেন অনেকবার। অবতীর্ণ হয়েছেন মাহুকের মাজে মাহুকের মাঝে। সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছেন পশ্চিমবাংলার এক শ্রামল পল্লীগ্রামে। তাঁর লীলাবিলাসের ইতিবৃত্ত চিরমুদ্রিত হয়ে আছে ভক্তজনের হৃদয়পটে। এবারকার অবতীর্ণ ঐশীশক্তির একটি বৈশিষ্ট্য—তাঁর বিগ্রহরূপের প্রতিচ্ছবি শুধুমাত্র ভক্ত সাধু সঙ্কনের হৃদয়কন্দরে উৎকীর্ণ হয়ে নেই বা শুধুমাত্র কবিসাহিত্যিকের লেখনী বা স্বরকারের কণ্ঠস্বরের মধ্যে তাঁর মহাজীবনের ভাবমূর্তি সংরক্ষিত নেই—তাঁর প্রতিচ্ছবি জীবন্ত হয়ে রয়েছে আলোছায়ায় পটে, শিল্পীর তুলির মায়াজালে, ভাস্করের ছেনি হাতুড়ির নানা নির্মাণে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহপট আজ বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত, মহাবৃদ্ধায় তিনি, লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে অপাবৃত অনাবৃত হয়েছে তাঁর মহিমার দ্ব্যতি, তিনি আজ বিশ্ববিজয়ী।

প্রতিকৃতি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কৃতির প্রতিমা ইতি অর্থঃ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব। ধর্মজীবনের একটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণপত্র, গোড়জনের আনন্দকৃতির উৎস।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম আলোছায়ায় পট তৈরী হয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে। কটো তোলা হয় তাঁর বাসভবন 'কমলকুটারে'। সেদিন ছিল ১৮৭২ খ্রষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর, রবিবার। বাংলা ১২৮৬ সালের ৬ই আশ্বিন। ভাদ্রোৎসবের শুরু হয়েছিল ৩১শে ভাদ্র। কমল কুটারে উৎসবের আয়োজন হয় ৬ই আশ্বিন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁর ভাগ্যে জগদ্ব্যমকে সঙ্গে নিয়ে উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন, তখন অপরাহ্ন প্রায় তিনটা, তিনি তাঁর স্বভাবস্বলভ মধুর কথাবাত্ত বর্ণন করে, তাঁর সুমিষ্ট স্বরে সঙ্গীত লহরী পরিবেশন করে সকল ব্যক্তিকে মুগ্ধ করেন। "তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথা বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্নত হইয়াছিলেন, কতবার ললাটে নিমগ্ন হইয়া অঙ্গ পুতলিকার দ্বারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, স্বরাস্ত্রের দ্বারা শিশুর দ্বারা ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রথম অবস্থার

কত গভীর গৃহ আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।”^১ ব্রাহ্মতন্ত্র জৈলোক্য সার্যালের কণ্ঠে ‘সচ্ছিন্দানন্দ ঘন’ নাম শুনে তিনি ভান হাত তুলে সহসা দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। দেখা গেল, তাঁর ভানহাতের আঙ্গুল দুগমুদ্রার বিস্তৃত, বাম হাত বুকের উপর সংস্থাপিত, তাঁর মুখাবলম্ব স্বর্গীয় লাবণ্যে সমুৎকৃত, চৈতন্যসম্পন্ন নিকাত ব্যক্তিসত্তার আনন্দনির্ব্বাক মুখকমলে পরিব্যাপ্ত। আলোছায়ার পটে বিধৃত এই প্রতিচ্ছবির বোধ করি তুলনা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের পিছনে দাঁড়িয়ে হৃদয়রাস, তাঁর পদতলে বসি জনাস্রোতক ব্রাহ্মতন্ত্র। সন্ন্যাসজ জৈলোক্যনাথের সামনে একটি মৃদব্দ। ধস্ত দেহী ক্যামেরাম্যান যিনি এই অনূর্ব্বদর্শন মনোহর মূর্তি সাদা কালোর পটে ধরতে পেরেছিলেন।

কেশবচন্দ্র এই আলোকচিত্রটি তাঁর বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালে সম্বন্ধে রেখেছিলেন। একদিন ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্র মিত্র ও মনোমোহন মিত্র তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলে কেশবচন্দ্র আলোকচিত্রটি দেখিয়ে বলেছিলেন, “একপ সমাধি দেখা যায় না। যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য এঁদের হত।”^২

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় আলোকচিত্র গৃহীত হয় স্বরেশ মিত্রের উদ্যোগে। সেদিন ছিল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার। ঠনঠনিয়ার বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। উপলক্ষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের মিত্র বাটীতে স্তভাগমন। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে সিমুলিয়াতে মনোমোহন মিত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তখন অপরাহ্ন প্রায় তিনটা, সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্বরেশ (স্বরেশ মিত্র) প্রস্তাব করেন, “আপনি কল দেখবেন বলেছিলেন চলুন।” শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হন। কল অর্থাৎ ক্যামেরা দেখতে যাওয়ার জন্য ঘোড়াগাড়ি করে রাধাবাজারে (অপরমতে বউবাজারে) বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের ষ্টুডিওতে উপস্থিত হন। ফটোগ্রাফার বুঝিয়ে দেন, কিতাবে ছবি তোলা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল জাবনা ঈশ্বরকেজিহ। ছবি তোলার পদ্ধতির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ‘আবিষ্কার করেন স্তম্ভস্রীবনের তাৎপর্য। সেদিনই ছবি তোলার কয়েকঘণ্টা পরে তিনি কেশবচন্দ্রকে বলেন, “আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে, শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। কাঁচের পিঠে একটা কালি

১। ধর্মতত্ত্ব: ১৩ই আখিন, ১৮৭১ শকাব্দ।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাবৃত্ত। ৫। পরিশিষ্ট (ঙ)

মাথিয়ে দেহ, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুনে যাছি ত্রাত্তে কিছু হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ফুলে যায়। যদি ভিতরে অহুয়াগ ভক্তিরূপ কালি রাখান থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়। নচেৎ শুনে আর ফুলে যায়।”

কল দেখতে দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময়ে তাঁর ছবি তোলা হয়।^৩ ছবিতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে, গায়ে বনাতের কোট, পায়ে চটিজুতা, কাপড়ের আঁচল কাঁধের উপর ফেলা। তাঁর ডান হাত একটি স্তম্ভের উপর আর বাম হাত বুকের নীচে রাখা। মুখকমল বিষলানন্দে উদ্ভাসিত, চক্ষু অর্ধ-নিম্নলিখিত। মন ঈশ্বরে আত্মস্থ। তৃপ্তির লাবণ্যে মুখকমল প্রদীপ্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের যে আলোকচিত্রটি বর্তমানে লুপ্ত সেইটি সম্ভবতঃ তাঁর তৃতীয় চিত্র, স্বামী নির্বাণানন্দজীর স্মৃতিকথায় জানা যায় ডাঃ রামচন্দ্র বসুতর উৎসাহে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি আলোকচিত্র তোলা হয়। ছবিটি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ যত্নস্ব করছিলেন, “আমি কি এত রাগী?” রামচন্দ্র বোসেন ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণের মনঃপূত হয় নি। তিনি নেগেটিভ সহ ছবিটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের চতুর্থ প্রতিকৃতি ৪২”x৩০” ক্যানভাসে আঁকা একখানি তৈলচিত্র। ডক্টর স্বরেন্দ্রের বিশেষ উদ্যোগে জর্নৈক স্বদেশ শিল্পী (সম্ভবত U. Ray) চিত্রাঙ্কন করেন। চিত্রের বিষয়বস্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে সর্বধর্মসম্বন্ধের উপদেশ দিচ্ছেন। কেশবচন্দ্র এই উপদেশবাণী সাক্ষীকরণ করে ‘নববিধান’ (The New Dispensation) সৃষ্টি করেন। সেই কারণে ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথায়ত’কার এই চিত্রের নামকরণ করেছেন ‘নববিধান’। তৈলচিত্রে গীর্জা মসজিদ ও হিন্দুর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে উপদেশ দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাচ্ছেন ভাববাহ্যের এক মনোরম চিত্র। ঈশাদৃত ও মহাপ্রভু প্রেমানন্দে দিব্যানুভূতি করছেন, তাঁদের বিবে জনাপনের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আনন্দ আবেশে কেউ খোল বাজাচ্ছে, কেউ শিঙা ফুঁকছে,

৩। এই দিনের ঘটনা সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “রাধাবাঙ্গারে আমাকে ছবি তোলাতে নিরে গিছলো। দেবিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী ঘাবার কথা ছিল কেনব সেন আর সব আগবে, তুলেছিলুম। গোটাকতক কথা বলবো বলে ঠিক করেছিলাম। রাধাবাঙ্গারে গিরে সব ফুলে গেলার। তখন বললাম, যা তুই বলবি। আমি আর কি বলবো।” (কথায়ত ৪।১১:২)

কেউ বা ধর্ষণতাকা ধরে মুক্ত বিশ্বেরে গর্বধর্মসম্বন্ধের বসরাধূর্ষ আবাদন করছে। কেশবচন্দ্রের হাতে 'নববিধানের' প্রতীকও ও পতাকা, পাশেই জীৱামরুকের প্রতিকৃতি। পার্শ্বকোণ মধ্যে জীৱামরুকের চোখ এখানে উন্মীলিত কিন্তু আলোকটিতে অর্ধনির্মীলিত। এখানে ডান হাতখানি বুকের উপর ধরা, আঙ্গুলগুলি ভাববাহ্যের চিত্রের দিকে প্রসারিত। আর বাম হাতখানি যেন পটভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাছাড়াও চিত্রকরের মুদ্রানামাতে চিত্রপটে জীৱামরুকের যে ভাবদ্রাতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার স্পষ্ট অভাব আলোকচিত্রে। গভীর ভাবভোতক এই চিত্রটির ভাবসম্পাদনায় সাহায্য করেন ডাঃ রাম দত্ত ও মনোমোহন মিত্র। চিত্রটির অঙ্কনকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর হতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে। অঙ্কনকার্য শুরু হয় সম্ভবতঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। চিত্রটি প্রস্তুত হলে সুরেন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে জীৱামরুকে দেখান, চিত্রখানি কেশবচন্দ্রের নিকটও পাঠান। কেশবচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেন, "Blessed is who conceived this idea." আর তিন বছর পরে এই চিত্রটির একটি অঙ্কন নন্দবহর বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রটি দেখে জীৱামরুকে সম্ভাব্য করেন : "ও যে সুরেন্দ্রের পট।"

প্রশ্নের পিতা (সহাস্তে) : আপনিও ওর ভিতর আছেন !

জীৱামরুকে (সহাস্তে) : ওই একরকম, ওর ভিতর সবই আছে। ইদানীং ভাব।^৮

পঞ্চম প্রতিকৃতিখানি জীৱামরুকের সর্বাধিক প্রচারিত আলোকচিত্র। আলোকচিত্রে জীৱামরুকে একটি আসনের উপর উপবিষ্ট। তাঁর স্ত্রীম চেহারা, প্রফুল্ল মুখাবলি ও নয়নাভিরাম মূর্তি থেকে প্রতীতি হয় জীৱামরুকে যেন ভাবামৃতনাগরে ভাসমান সহস্রদল পদ্মের মত চারিদিকে আনন্দদ্রাতি বিকীরণ

৪ উদ্ভবকরী, বিতীয়ভাগ, চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা পৃঃ ৭৫।

৫। কথাযুত ৩।১৮।২

৬। সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : জীৱামরুকের কটোপ্রসঙ্গে (উদ্বোধন, ৬৪ তম বর্ষ, ২ম সংখ্যা)। তাঁর মতে কটো তোলা হয় সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ, কিন্তু (স্বামী নির্বাণানন্দজী সূত্রে প্রাপ্ত) স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মতে কটো তোলা হয় বিকালে। স্বামীকান্তজীর মস্তিষ্কে বিকালেই পশ্চিমের আলোতে কটো তোলা স্বাভাবিক মনে হয়।

করছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের এক রবিবারে আলোকচিত্র গৃহীত হয় ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। বরাহনগর ৩৬, কুটিঘাট রোডের অবিনাশ চন্দ্র দাঁ চিত্র গ্রহণ করেন। অবিনাশ তখন ফটোগ্রাফার বোর্ধ শেকার্ড কোম্পানীতে শিক্ষাবিদগ্নী করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে আলোকচিত্র নিতে মত দেন না। ভবনাথ ফটোগ্রাফার নিয়ে এসেছিলেন, তিনি হতাশ হয়ে পড়েন, তাঁদের সাহায্য করতে নগেন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরাধাকান্তদ্বীর মন্দিরের উত্তরদিকের রকে পাঁয়চারি করছিলেন সে সময়ে নগেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে ভগবৎ প্রদক্ষ করতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বসে ভাবে বিভোর হয়ে ভগবৎপ্রদক্ষ করতে করতে সমাধি হন। গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। দেখা গেল তাঁর দেহ জড়বৎ নিথর নিম্পন্দ। নয়নমুগ্ধ নিম্নোক্ত, সর্বাঙ্গে যেন আনন্দদ্ব্যতি। এই স্থযোগে অবিনাশের হাত থেকে নেগেটিভ কাঁচখানি ঝাটিতে পড়ে একটি কোণ ভেঙে যায়। এই দোষটি চাকরার জন্য অবিনাশচন্দ্র চিত্রের উপরাংশ অর্ধস্ফীকৃতি করে কেটে ফেলেন। এই কারণে আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির উপরাংশে অর্ধস্ফীকার এলুটা দাগ দেখা যায়। চিত্রগ্রহণের প্রায় তিনসপ্তাহ পরে ভবনাথ আলোকচিত্রখানি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখান। চিত্র দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন “এ মহাযোগের লক্ষণ। এ ছবি কালে ঘরে ঘরে পূজা হবে।” নহবতের নীচে শ্রীমায়ের ঘরে এই প্রতিকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ অন্নং ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করেছিলেন। কানীপুরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, “ওগো তোমরা কিছু ভেবো না। এর পর ঘরে ঘরে আমার (প্রতিকৃতির) পূজা হবে। মাইরি বলছি বাপান্ত্র দ্বিবি।” শ্রীরামকৃষ্ণের এই অনিন্দ্য সুন্দর প্রতিকৃতিখানি জগৎজুড়ে ভক্তগণ “ছায়া কারা সন্ধান” বোধে নিত্য পূজার্চনা করে থাকেন।

বর্ধ প্রতিকৃতিখানি শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিস্থলপর আলোকচিত্র। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট বিকাল চারটার পর কানীপুর বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাসভবনের সর্ব দরজার সিঁড়ির সামনে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। তাকার মহেন্দ্রলাল সরকারের উৎসাহে ও অর্থায়নকৃত্যে আলোকচিত্র গৃহীত হয়। সুন্দরিত পালকে শাসিত মহাসমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর মুখশ্রী দ্বিবিলাবণ্যে

১। শ্রীমতী অভয়ানন্দ : বন ও বাস, পৃ: ১৫২

৮। শ্রীমতী গভীরানন্দ : শ্রীমতী সারস্বতী পৃ: ১১৫

লম্বাঙ্গল, পরিধানে পাভবসন, লগাট চন্দন-চর্চিত, গলদেশে খেতমালা। পাগফের
পিছনে দাঁড়িয়ে প্রায় পয়তাল্লিশজন রামকৃষ্ণমুরাগী। এই সব ভক্তবৃন্দের
দাঁড়ানোর ক্রমবিন্যাস, নরেশ্বরের গলদেশে স্থিতির আঁচল ইত্যাদি লক্ষ্য করলে
বোঝা যায় অস্বতঃপক্ষে দুটি আলোকচিত্র নেওয়া হয়েছিল। ভক্ত বঙ্গবাস
বস্ত্র হাতে দেখা যায় সর্বধর্মসম্বন্ধের একটি প্রতীকদণ্ড। একটি অখণ্ডবৃত্তের
মধ্যে শৈবের ত্রিশূল, বৈষ্ণবের শক্তি, অশ্বত্থবাহীর ওঁকার, ইসলামের অর্ধচন্দ্র ও
খ্রীষ্টের ক্রুশের সমাবেশ। আলোকচিত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর অস্বর্ণিহিত
ভাবটি তুলে ধরেছে। চিত্রটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাহিত ক্রুশ বহন করতে প্রস্তুত তাঁর
অমুরাগিবৃন্দ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখপানে, জানবার জন্য
বুঝবার জন্য তাঁর আরও লোকহিতব্রতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

১ শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্তম প্রতিকৃতির রচনাকাল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ। শিল্পী জনৈক
মারাগী ভাস্কর। স্বামী সারদানন্দের উৎসাহে ও এটর্নী অটলবিহারী মৈত্র
মহাশয়ের অর্থায়নকৃত্যে তৈরী হয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মর্মর মূর্তি। কলকাতার
ঝাউতলার স্টুডিওতে প্রতিকৃতির জমি তৈরী হলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ,
স্বামী সারদানন্দ, যোগেন দা, গোলাপ দা প্রভৃতি দেখতে যান। আজাহুলমবিত-
বাহ, শ্রীরামকৃষ্ণের বঙ্গর ভক্তী, তাঁর কানের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের সংশোধনের
কয়েকটি পরামর্শ দেন বহুদর্শী স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সংশোধনের পর আরেকদিন
স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অমৃতোত্তরা স্টুডিওতে গিয়ে দেখে শুনে প্রতিকৃতিখানি
অমুমোদন করেন। শোনা যায় প্যারিস প্রাস্টারে ঢালাই করার সময় ছাঁচ কিছু
বিকৃত হয়। এভাবে পাথরের প্রতিকৃতিটি নিরিত হলে পরে কালীতে শ্রীরামকৃষ্ণের
অশ্বত্থাশ্রমের মন্দিরে স্থাপন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে যারা দীর্ঘকাল ধরে
দেখেছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের অমুমোদিত এই প্রতিকৃতির বিশেষ মূল্য,
সন্দেহ নাই।^১ পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র অবলম্বন করে অনেক
প্রস্তরমূর্তি, ব্রোঞ্জমূর্তি প্রভৃতি গড়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্রে বিধৃত প্রতিচ্ছবি, পটে চিত্রিত প্রতিকৃতি ও
প্রস্তরে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতি অগণ্যসংখ্যে পোতা পাচ্ছে। এদের সকলেরই উৎস
উপরে বর্ণিত এক বা একাধিক বিগ্রহের প্রতিকৃতি। আর বৃদ্ধ প্রতিরূপের
আড়ালে আবৃত যে মহাজীবন ও স্বীয় মহিমার প্রতিষ্ঠিত হাজার লক্ষ রাহুবেক
কর নিঃহাননে—তার হিরণ্ময় দীপ্তি বিশ্বমানবের বর্তমান ও ভবিষ্যতের
দিশারী।

২। স্বামী নিরঞ্জনস্বামীর নিকট প্রাপ্ত, এর কিয়দংশ উদ্বোধনে প্রকাশিত ৮

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা

গাছের মধ্যে কোন কোনটি 'অচিন গাছ', তেমনি দেখতে শুনে মাছুষের মত হলেও অবতারপুরুষ অচিন মাছুষ; অবতারপুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তিনি অনন্তপাধারণ, তিনি নিরুপম। অবতারপুরুষের অনন্তস্বাভাব্য বোধ করি সর্বাধিক প্রকটিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রে।

রমিক শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে নিজের সম্বন্ধ বলতেন : 'আমি মূর্খোত্তম,' 'আমি তো মূখ্য'। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কোনক্রমে নিজের নাম লিখিতে পারিতেন।' অল্পরূপভাবে স্বামী প্রেম্যানন্দ বলেছিলেন, '(তিনি) যো সো করে লিখতে পারতেন মাত্র।' এবং বাইরের জগতে তাঁর পরিচয়, তিনি একজন মূর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, মন্দিরের সামান্য একজন পুঙ্কমাত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমাত্রী দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের চৌধুর্যব্যক্তিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই মনোভাবের নমুনা প্রকাশ পেয়েছে প্রতাপচন্দ্র সঙ্কুম্ভাণের লেখনীতে। বিস্মিত প্রতাপচন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন : 'I, a Europeanised, civilised, self-centred, semi-sceptical so-called educated reasoner, and he, (Ramakrishna Paramahansa) a poor, illiterate, shrunken, unpolished, diseased, half-dressed, half-idolatrous, friendless Hindu devotee'। এই ধরনের সম্বোধ্য বহুল ও অনেকক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদীক্ষা বিস্তারিতা সম্বন্ধে একটি ধোঁয়াগার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী ও তথ্যমূলক আলোকসম্পাতের সাহায্যে ধোঁয়াগার আবরণ ভেদ করতে না পারলে শ্রীরামকৃষ্ণের অল্পম চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রায় অজ্ঞাত থেকে যাবে। এই রহস্য ভেদ করতে না পারলে আমরা বুঝতে পারব না, তিনি 'মূখ্য' হলেও পণ্ডিতেরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে এসে কেন 'কৈচো' হয়ে যেত।

১ The Theistic Quarterly Review, Oct-Dec, 1879.

তঁার নিজ উক্তি, 'কি আশ্চর্য্য, আমি যুঁষ। তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে আসেন, এ কি আশ্চর্য্য।' এর মর্মার্থ জন্মকর্ম করতে পারব না।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম গদাধর বা গদাই। শ্রীগদাধরের বাল্যকালের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ ও বিচিত্র কল্পনার জাল বোনা হয়েছে। কোন জীবনীকার লিখেছেন, 'বিজ্ঞাত্যাসে গদাধরের নাহি তত মন', 'গদাধরের পাঠশালাে যাওয়া-আসা সার। লেখাপড়া বড় বেশী নাহি হয় তার।' আবার কেউ অভিযোগ করেছেন যে, বিজ্ঞাত্যাসে অনন্যোযোগী শ্রীগদাধর পড়াশুনার নাম করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে হাটে মাঠে খেলাধুলা যাত্রাগান করে বেড়াতেন। আরেকজন লিখেছেন, 'শুষ্ক মহাশয় অন্তঃস্থ বালকহিগকে যেমন পীড়ন করিয়া পাঠে অন্যোযোগ করাইতেন, গদাইয়ের অসুপস্থিতি-সময়ে তাঁহার জন্তও সেইরূপ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন, মনে করিতেন; কিন্তু গদাই পাঠশালায় উপস্থিত এবং শুষ্ক মহাশয়ের সম্মুখীন হইলে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা বিশ্বস্ত হইতেন। তিনি গদাইকে অতীব ভালবাসিতেন।'² অপর একজন লিখেছেন যে, অনন্যোযোগী বালককে শাস্তি করার জন্ত শুষ্ক মহাশয় বালককে বেজাঘাত করেও তাঁর বিজ্ঞাচর্চার অনীহা দূর করতে পারেননি।³ কেউ বা বলেছেন, লেখাপড়ার জন্ত পীড়াপীড়ি করলে শ্রীগদাধর সেইকালেই বলেছিলেন, 'বিজ্ঞা শিখে ত জ্ঞান করতে হবে আর চাল কলা বেধে আনতে হবে। আমার এমন বিজ্ঞায় কাজ নেই। সেই অন্ন খেতে হবে।'⁴ এভাবে বিজ্ঞাচর্চার বীতশ্রুহ একপ্রকার বালক শ্রীগদাধরের যে চিত্র পরবর্তীকালে জীবনীকারগণ আঁকেছিলেন, তার প্রায় অসুন্দর ছবি তুলে ধরেছিলেন তাঁর সমকালীন পত্রপত্রিকা। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অগস্ট লিখেছিল, 'রামকৃষ্ণ লেখাপড়ার চর্চা প্রায় কিছুই করেন নাই। রীতিমত দুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।' ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর The Indian Mirror লিখেছিল, 'Born of a poor Brahmin family...Ramakrishna was not fortunate in receiving a good education, secular or spiritual, in his younger days.' প্রাকৃতিক সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণগুণগ্রাহী; তাঁরা বোধ করি অদ্বৈততত্ত্বের আতিশয্যে যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং অতিশয়োক্তি

২ শুকদাস বর্মণ : শ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃ: ১৩-৪ ৩ বৈষ্ণবনাথ লাহা : কামারপুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃ: ৬০-১

৪ শ্রী রামকৃষ্ণচরিত, পৃ: ১৪

করেছিলেন। কেউ আবার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে শ্রীগদাধরের নিরক্ষরতার
সাধারণ্যও দেখিয়েছিলেন।^৫

শ্রীস্বামীজী তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেছিলেন গ্রামবাংলার এক
ছদ্ম পল্লীতে আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে। কিন্তু তাঁর জন্মভূমি কামার-
পুকুরের অদূরেই ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বিষ্ণুপুর।
সে সময়ে বিষ্ণুপুরের কৃষ্টিসংস্কৃতির প্রভাব কামারপুকুর ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে
স্পষ্ট। শ্রামল গ্রামীণ বাংলার স্নেহমধুর পরিবেশে বালক শ্রীগদাধর বড় হয়ে
উঠছিলেন। পিতা কুড়িরামের কাছে হাতে খড়ি হবার পর শ্রীগদাধর নিকটস্থ
পাঠশালার যোগদান করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর। লাহোরের
শ্রীশ্রীদুর্গামন্দিরের সন্মুখে যে নাট্যমন্দির সেখানেই বসত পাঠশালা। শ্রীগদাধরের
শিক্ষাকালের প্রথমদিকে গুরুশাহী ছিলেন মুকুন্দপুর-নিবাসী যদুনাথ সরকার, পরে
ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সরকার।^৬ সকালে দু'তিন ঘণ্টা ও বিকালে দেড়-দুই ঘণ্টা
পাঠশালা বসত। সেকালের রীতি অনুসারে শ্রীগদাধর তালপাতার বাংলা
বর্ণমালা ও বানান লেখা শিখতে আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে সকল শিক্ষার্থীর
সঙ্গে এককণ্ঠে তারতম্যে মনসাঙ্ক, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, হশকের নামতা উচ্চারণ
করে মুখস্থ করতেন। সকল বিষয়েই মুখস্থ করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত।
তালপাতার অঙ্ক লেখা অভ্যাস হলে শিক্ষার্থীরা কলাপাতার তেরিঙ্গ (অকের
যোগ) জমাখরচ ও নামধার প্রভৃতি লেখা আরম্ভ করত। গণিতে উৎসাহী
ছাত্রদের অধিকতর শিখতে হত শুভকরী নিয়ম,^৭ মাসমাহিনা, সূর্যকথা
জমাবন্দী খংলেখা জমিদারীর খতিয়ান লেখা ইত্যাদি। তদানীন্তন

৫ বৈকুণ্ঠনাথ সায়্যাল লিখেছেন : 'তোতাপাখীর মত পুঁথি না পড়িয়া,
লাধনপ্রভাবে শিক্ষার প্রতিপাদ্য জীবনের লক্ষ্যংকার করিয়া ভবিষ্যতে সকল অক্ষর
অর্থাৎ শাস্ত্রকে উভাসিত করিবেন...হয়ত এই নিমিত্তই নিরক্ষর হইলেন।' (শ্রীশ্রীস্বামীজীলাবৃত্ত, পৃ: ৭)

৬ শুভকরী, সপ্তমবর্ষ, দশম সংখ্যা, পৃ: ২৩৪ অনুসারে শ্রীগদাধরের
পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন রামপ্রসাদ শুভ, তাঁর পুত্র আততোষ শুভ। সম্ভবতঃ
রামপ্রসাদ শুভ অল্পকালের জন্য ঐ পাঠশালাতে শিক্ষকতা করেছিলেন।

৭ বাংলার ও আসামে অকের ছড়া বা আর্বা অধিকাংশ শুভকরের নামে
চলে। শুভকর সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের পূর্বের লোক। পরবর্তীকালে একাধিক
কার্যে সম্মান শুভকর নাম বা উপাধি ধারণ করেছিলেন।

প্রাচীনসারে রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থের পাঠ ও আবৃত্তি পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত : শুধু তাই নয়, এই সকল গ্রন্থ বা তার অংশবিশেষ অঙ্কলিপি করাও ছিল পুণ্যকর্ম। প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে কিশোর শ্রীগদাধর করেকটি পুঁথি অঙ্কলিপি করেছিলেন। কালের করাল-গ্রাস থেকে যে কয়টি পুঁথিপত্র আজও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বিজ্ঞান সেন্তলি স্থানিচ্ছিতভাবে প্রমাণ করবে কিশোর শ্রীগদাধরের বিদ্যাচর্চার প্রীতি ও নিষ্ঠা। তাঁর হস্তাক্ষরে লেখা পুঁথিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : রামকৃষ্ণায়ণ, হরিশ্চন্দ্রের পালা, সুবাহুর পালা, মহিরাবণ বধের পালা, যোগাভ্যাস পালা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী। পাঠকের কোঁতুহল-নিবৃত্তির জন্য শ্রীগদাধরের বহুস্ত লিখিত পুঁথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

(ক) ‘হরিশ্চন্দ্রের পালা’ : ১০৩’ ৩৩’ তুলোট কাগজে ৩৯ পৃষ্ঠার পুঁথি। পুঁথির রীতি অল্পস্বামী সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠার লেখা, পর পর দুটি পৃষ্ঠা নিয়ে একটি পৃষ্ঠার নম্বর। এখানে পৃষ্ঠার ক্রমিক নম্বর হাকিরা ও পণকিরার উত্তর অঙ্কানুসারে লেখা। শ্রীগদাধর এই পুঁথিটির অঙ্কলেখ সমাপ্ত করেছিলেন বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২০শে বৈশাখ অর্থাৎ সোমবার রুক্ষা-একাদশী, শকাব্দ ১৭৭০, ইংরাজী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স প্রায় বার বছর দুই মাস। তিনি ‘শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। অথ হরিশ্চন্দ্রের পালা।’—লিখে পালাগানের মূলটি আরম্ভ করেছেন। পালাগানের শেষে লিখেছেন তাঁর নিজের নাম ও ঠিকানা। এখানে তাঁর নামের স্বাক্ষর ‘শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়’।

পালা-গানটির মূল-রচয়িতা লক্ষর, যিনি কবিচন্দ্র, বিজ কবিচন্দ্র, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদি উপাতিযুক্ত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। শঙ্কর কবিচন্দ্রের পিতা মুনিরায় চক্রবর্তী, নিবাস লেগোর নিকটবর্তী আধুনিক পেনো গ্রামে। কবিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে (১৭২-৪৮) সত্যাকবি ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ পাঠালী লিখেছিলেন গোপাল সিংহের পিতা রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে (১৭০২-১২)।^৮ কবিচন্দ্রের অধ্যাপকরামায়ণ হাকিনরাটে ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’ নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। তাঃ দীনেশচন্দ্র

৮ রামায়ণে রামলীলা কবিচন্দ্রে গায়...

বিজ কবিচন্দ্রে গায় পাছহার বসতি।

রঘুনাথসিংহের জয় কর রঘুপতি।

(হুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অশ্রবর্ষ, পৃঃ ৩৫৬)

সেন তাঁর বিখ্যাত *History of Bengali Language and Literature* (2nd Edn, p. 178-79) এ.ম. শব্দর কবিত্বের লেখা যে ৪৬টি কাব্য রচনার তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি 'হরিশ্চন্দ্রের পালা'। ডাঃ সেনের প্রাপ্ত পুঁথিখানির লিখন তথা অমূল্যবোধের কাল ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দ। এই পুঁথিখানির কোন একখানির নকল শ্রীগদাধরের আলোচ্য অমূল্যবোধের আকার।

(খ) 'হরিশ্চন্দ্রের পালা': এই একই মাপের তুলোটি কাগজে ২১ পৃষ্ঠার পুঁথি। মূলের পূর্বে প্রায় ৪ পৃষ্ঠার বন্দনাগান, 'শ্রীশ্রীহরঃ। বন্দনা লিখ্যতে।'— দিয়ে শুরু। তিনি পুঁথি সমাপ্ত করে স্বাক্ষর করেছেন 'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়ঃ'। সমাপ্ত করার তারিখ লিখেছেন ২রা ভাদ্র প্রতিপদ। পুরাতন পঞ্জিকা আলোচনা করে ও শ্রীগদাধরের লেখার বিস্তারিত, শব্দের বানান ইত্যাদি লক্ষ্য করে স্থির করা যায় যে, সমাপ্তির তারিখ বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২রা ভাদ্র, কৃষ্ণাষাঢ়ীয়া, বুধবার (ইংরাজী ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট) অথবা ১২৫৫ সালের ১লা ভাদ্র, প্রতিপদ, মঙ্গলবার। তখন অমূল্যবোধের বয়স প্রায় সাড়ে বার বছর।

পুঁথিখানির মূল-রচয়িতার অমূল্যবোধ কতগুণে গিয়ে কৃষ্ণবাস ও কবিত্ব এই দুটি ভণিতার সহাবস্থান বিজ্ঞপ্তির সৃষ্টি করে। এই ধরনের ভণিতা-বিজ্ঞাপ্তি সম্বন্ধে ডাঃ অমূল্যবোধ সেন লিখেছেন, '(মহাভারতের তুলনায়) রামায়ণের বেলায় ভণিতা-বিকৃতি অনেক বেশী হইয়াছে। কেননা রামায়ণ গাওরা হইত এবং গায়নদের নিজের নাম ভণিতারূপে চালাইয়া দিবার প্রবৃত্তি সর্বদা সজাগ থাকিত। এই কারণে সম্ভবতঃ পঠিত রামায়ণেও যথেষ্ট ভণিতা-বিজ্ঞাপ্তি ঘটিয়াছে।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ: ১২২) এখানে ভাষাতে কৃষ্ণবাসী স্বর যে নাই তা নয়। কিন্তু বন্দনাগানে কৃষ্ণবাসকে যেরূপ ভক্তি দেখানো হয়েছে, তাতে এই পালাগান কৃষ্ণবাসের হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই মনে হবে যে, কৃষ্ণবাসী রামায়ণের কোন প্রচলিত পাঠের সঙ্গে পালাগানের গায়ক কবিত্ব নিজেই কীর্তি সংযোজন করেছিলেন। এখানে কাহিনী মোটামুটি কৃষ্ণবাসী রামায়ণ অনুসারী।

(গ) 'স্ববাহুর পালা': তুলোটি কাগজে ২২ পৃষ্ঠার একটি পুঁথি। নামপত্র ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তিনটি ভিন্ন পৃষ্ঠা। 'শ্রীশ্রীসীতারামঃ। অথ স্ববাহুর পালা লিখ্যতে।'—ভূমিকা করে অমূল্যবোধ শ্রীগদাধর পালাগানটি লিখেছেন। পাতুলিপি সমাপ্তির তারিখ অমূল্যবোধের মৃত্যু ১২৫৬ সালের ১৩শে আশ্বিন, মঙ্গলবার। পুরাতন পঞ্জিকা অনুসারে এই দিনটি ছিল ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা

জুলাই : শুক্লা ষাটশী তিথি, বিহু সোমবার। শ্রীগদাধরের বহুতে লিখিত 'রঙ্গলবার' সঠিক ধরলে তারিখ হবে ২০শে আষাঢ়, ৩রা জুলাই। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স তেরো বছর চার মাস।

এখানে ভণিতাতে পাওয়া যায় একমাত্র কৃতিবাসের নাম। কিন্তু আলোচ্য পালাগানের কাহিনী প্রচলিত কৃতিবাসী রামায়ণের কোনও পাঠে আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাইনি। সুবিখ্যাত জীবনীকোষ গ্রন্থে^৯ যে চল্লিশ জন সুবাহুর পরিচয় পাওয়া যায় তা হতে এই পালাগানের সুবাহুর কাহিনী ভিন্ন। এখানে সুবাহু বীরবাহুর ভাই, রাবণের প্রিয় পুত্র। সুবাহু রামভক্ত। হৃদয়মুগ্ধে সদা-ভাব্যর শ্রীগায়ের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি স্মরণ করতে করতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মনের ভাব, 'করিয়্য সন্মুখ রণ যদি আমি মরি। চতুর্ভুজ হয়্য জাব বৈকুণ্ঠ নগরি।'

(ঘ) চতুর্থ পুঁথি 'যোগাঙ্গার পালার' উল্লেখ করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার ও 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের লেখক। যোগাঙ্গা শব্দের অর্থ মায়াময়ী, আত্মশক্তি, ভগবতী, কালী।^{১০} ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, 'উত্তররাঢ়্য পুরাতন দেবীপীঠ ক্ষীরগ্রামের যোগাঙ্গা দেবীর বন্দনা পাওয়া গিয়াছে কৃতিগায়ের, দ্বিজদয়ারামের, পরমানন্দ দাসের ও দ্বিজ বাহুরামের ভণিতায়।^{১১} ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেবদেবী ও গৌর মাছাঙ্গ্যাবিস্বক যেসব প্রচুর পুঁথি রচিত হয়েছিল তার মধ্যে যোগাঙ্গা দেবীর বন্দনা, তারেশ্বর বন্দনা প্রভৃতি 'ছুইচারি পাতঙ্কার' পুঁথিগুলি নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।^{১২} এই পুঁথিখানি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের লেখক শশিভূষণ ঘোষের মতে এই পুঁথির অমূল্য লিপি শ্রীগদাধর সমাপ্ত করেছিলেন বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২৩শে মাঘ, শনিবার অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স প্রায় তেরো বছর।

(ঙ) স্বামী সারদানন্দ, রামচন্দ্র দত্ত ও অক্ষয় কুমার সেন 'রামকৃষ্ণায়ণ' পুঁথির উল্লেখ করেছেন। এর অনুলেখনও শ্রীগদাধর। আম'দের এই পুঁথি-খানিও দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

৯ শশিভূষণ বিজ্ঞানদার : জীবনীকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২০৬৪-৬৭

১০ হরিশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃ: ১৮৭৩

১১ সুকুমার সেন : ঐ, পৃ: ৫১৭, তাছাড়াও পৃ: ৪৩০ ত্রুট্য।

১২ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিকৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১২১৫-৬

(চ) শিহড় গ্রামে হুদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রের বাড়ীতে শ্রীগদাধরের নকল করা শ্রীশ্রীচণ্ডীর কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়। তেরিঙ্গশাতাতে লেখা পুঁথিখানির অধিকাংশই বিলুপ্ত, বর্তমানে মাত্র বার তেরোখানি পৃষ্ঠা দেখা যায়। মনে হয় বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষার লেখা এই অল্পলেখ উপরোক্ত পুঁথিগুলি লেখার পরবর্তী কোন সময়ের।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি অল্পলেখ শ্রীগদাধরের হস্তাক্ষরের মূলিয়ানার উচ্ছল প্রমাণ। দৃঢ় বলিষ্ঠ গতিতে ছন্দায়িত তাঁর লিখন ভঙ্গিমা ও স্বাক্ষরের নমুনা পাঠককে এখানে উপহার দেওয়া যাচ্ছে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পুঁথিগুলির মধ্যে কিছু কিছু অংশ শ্রীগদাধরের মৌলিক রচনা। সামান্য কিছু অংশ গুপ্তে লেখা। 'স্ববাহুর পালা' পুঁথিখানির শেষ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'ওঁ রামঃ। শ্রীরামচন্দ্র-দাসের পুস্তক জ্ঞানিবেন।' মূল পাঠ লেখা শেষ করে তিনি 'হরিশ্চন্দ্রের পালা' পুঁথিতে লিখেছেন, 'ভিমস্বামী বণে ভক মনিনাক মতিভ্রমঃ।' ১৩ আবার লিখেছেন, 'অখাদিষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষক।' ১৪ এগুলি নিঃসন্দেহে মূল পুঁথি-বহির্ভূত তাঁর নিজস্ব রচনা।

এছাড়াও তদানীন্তনকালের পুঁথি-লিখনের রীতি অনুযায়ী স্বভাবকবি শ্রীগদাধর তাঁর কিছু মৌলিক রচনা পুঁথিগুলির মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন। বার তেরো বছরের কিশোর কবির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে কাব্যপ্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল তার কয়েকটি নমুনা এখানে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে। কিশোর কবি শ্রীগদাধর 'মহিরাবণ বধ' পালার শেষে লিখেছেন :

গদাধরকে বর দিবে যোহে ১৫ গুণনীধী ।
মহানন্দে রাখিবে তোমার জাবেদীঃ ।
গুণিবগ্রে ১৬ বর দিবে যোহে ১২ কমল আখি ।
অর্ঘ্যে ১৭ থাকে যেন হোএ বড় স্বধীঃ ।
তিনি 'স্ববাহুর পালা'র অল্পলিপি শেষ করে লিখেছেন,
কিস্তিবাসের চরণে মোর অসম্ম প্রণাম
আহার কৃপায় হই নগিত রামায়নঃ ।

১৩ ভিমস্বামী বণে ভকো মুনীনাক মতিভ্রমঃ ।

১৪ অখাদিষ্টং তথা লিখিতং লেখকস্ত নাস্তি দোষঃ । 'অখাদিষ্টং' হলে অখাদিষ্টং' পাঠও গ্রহণযোগ্য।

১৫ যোহে-যোহে-ওহে ১৬ গুণিবগ্রে-গোষ্ঠীবর্গ ১৭ অর্ঘ্যে-অর্ঘ্যে

শ্রীগদাধরকে বরদিয়ে ওহেজননিধি

কর্ণ্যানে ১৮ রাধিবে রাম ভোয়ার নিবেদি: ।

রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভক্তায় বেধসে

ঃঘুনাথায় নাথায় দিতায় পয়্যা নমঃ ১১৯

অল্পরূপভাবে 'হরিশ্চন্দ্র পান্য' গানের শেষাংশে নিম্নোক্ত দুটিপংক্তিও শ্রীগদাধরের নিজস্ব রচনা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

এতদূরে হরিশ্চন্দ্রের পান্য হইল গায়।

অভিমত বর পায় ক্ষেমন গাওয়ার।

আলোচ্য পুঁথিগুলির অধিকাংশ পয়ার ছন্দে লেখা, শুধু কিছু অংশে দেখা যায় পয়ার ত্রিপদী। শ্রীগদাধরের নিজস্ব রচনা সব কয়টি ১৪, ১৫, ১৬ অক্ষরী পয়ায়ে রচিত, তাছাড়াও তাঁর রচনার সর্ববিধে দেখা যায় পুঁথাতন ধারার অল্পযুক্তি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ধরনের পুঁথি লেখা শুধুমাত্র লেখার কাজ নয়, চাকশিল্পও বটে। আমাদের স্বভাবশিল্পী শ্রীগদাধর তাঁর পুঁথিপাঠকে সজ্জিত করেছিলেন স্বকৃতিসম্পন্ন ছোটখাট নক্সার সাহায্যে। একটি পৃষ্ঠার দুই প্রান্তে তাঁর হাতে আঁকা দুটি নক্সার আলোকচিত্র পাঠককে উপহার দেওয়া গেল (২নং চিত্র ভ্রম্য)। আরও লক্ষণীয় একটি বিষয় এই যে, তাঁর লেখা প্রত্যেকটি পুঁথি তিনি শুরু করেছেন শ্রীরাম বা শ্রীরামনীতাকে স্বরণ করে। 'স্ববাহর পান্য' পুঁথিখানির প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠার লেখা শুরু করেছেন 'ও' রাম', 'শ্রীরাম' ইত্যাদি দিয়ে। শুধুমাত্র রামকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বলেই রামনামের স্বরণ নয়, শ্রীগদাধর 'রামায়' মন্ত্র দীক্ষিত হয়েছিলেন^{২০} এবং ঐ কালে তদুপলব্ধি ইষ্টদেব বসুদেবের পূজা অণু ধ্যান করে মনের আনন্দে ভাসতে, সেকার্ষণ্যে তাঁর লেখাগুলিতে রামনামের পুনঃ পুনঃ স্বরণ।

প্রবীণ বয়সেও তাঁর হস্তাক্ষরের যে সামান্য কয়েকটি স্বত্বচিহ্ন কালের কল-কলিত অতিক্রম করে বর্তমান রয়েছে, তাদের কয়েকটি পাঠককে উপহার দেওয়া যাচ্ছে। তখন তিনি কান্দীপুরের বাগানবাড়ীতে বোগশম্যার শাসিত। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলা। তিনি একথণ্ড কাগজে বহুভে

১৮ কর্ণ্যানে = কল্যাণে

১৯ অর্থাৎ 'সীতারায় পহরে নমঃ।' শ্রীগদাধর এসময়ে সংস্কৃতভাষা সামান্যই শিখেছিলেন।

২০ "আমার বাবা রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামায়ন গ্রহণ করিরাছিলাম।" (শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৪৫)

নরেন্দ্রনাথকে লিখে দেন লোকশিক্ষার কতোর। তিনি লিখলেন, 'জয় রাধে
 পূর্বমোহি নরেন শিখে দিবে কখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে। জয় রাধে।' ২১
 অর্থাৎ 'জয় রাধে ! প্রেমময়ী ! নরেন শিখে দিবে, কখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে।
 জয় রাধে !' লেখার নীচে চাক'নিদ্রী শ্রীরাঘবকৃষ্ণ একে দেন গভীর অর্থাত্মিক
 একটি মনোহর রেখাচিত্র। বামদিকে আরতচক্ৰ একটি আবক্ষ মস্তক। মাথার
 গড়ন সাধারণের চাইতে বড়। তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে স্থির। পিছনে একটি দীর্ঘপুচ্ছ
 ময়ূর, ব্যগ্রভাবে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে। মনে হয়, নরেন্দ্রনাথের পিছনে শ্রীরাঘবকৃষ্ণ,
 নবনির্বাচিত লোকশিক্ষকের পশ্চাতে সাগ্রহে অঙ্গসমর্থকারী ভগৎপতি। আবার
 দেখি, ২২ এপ্রিল তারিখে তিনি একখণ্ড কাগজে লিখেছেন, 'নরেন্দ্রকে জান দাও,'
 আর তারই নীচে একেছেন একটি বাঘ ও একটি ঘোড়া। কাগজখণ্ডের
 উল্টোপাঠে একেছেন একজন রমণী, তার মাথায় একটি বড় খোঁপা। ২। এভাবে
 দেখা যায়, বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে আনন্দানন্দ শ্রীরাঘবকৃষ্ণ নিজের ভাবসম্পদ
 বিতরণ করেছিলেন কখনও রেখাচিত্রের সাহায্যে, কখনও শব্দবর্ণ লিখনের
 সাহায্যে, কিন্তু ততোধিক তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন গান কীর্তন নৃত্য ও
 অঙ্গপদ কথাশিল্পের মাধ্যমে !

রামচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন, 'লেখাপড়া সবকিছু একেবারে তাঁহার কিছুই আস্থা
 ছিল না। তাঁহার হস্তলিখিত রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি ও অন্ত দুই একখানি পুস্তক আছে,
 তাহাতেই তিনি যে লেখাপড়া করিয়া জানিতেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।' ২৩
 শ্রীগদ্যধর লিখিত পুঁথিগুলির গভীরে প্রবেশ না করে তালী তালী দেখলে একশ
 একটি ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। রামচন্দ্র দত্তের বক্তব্যটি সম্ভবতঃ পুঁথির ভাষা,
 ব্যাকরণ, শব্দঃ বানান ও পয়ার ছন্দে চৌদ্ধ অক্ষরের পরিবর্তে কখনও কখনও
 ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ অক্ষরের ব্যবহার ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ
 শতাব্দীর বাংলা পুঁথি-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠক জানেন যে, বাংলা ভাষার
 পৌরাণিক পুনর্জাগরণের সময়ে প্রাকৃতের যে প্রবল প্রচলন হয়েছিল, পরবর্তী-
 কালে বাংলাভাষা অনেকাংশে সংস্কৃতঘর্ষে হয়ে উঠেগেও সেই প্রভাব হতে মুক্ত
 হতে পারেনি। এই উভয় স্রোতের বিপুল পরিমাণে সংমিশ্রণ ঘটেছিল সেকালে।
 শ্রীগদ্যধর রচিত পুঁথিগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করি আমরা তারই অঙ্গসমর্থ। এই
 কারণে দেখে, লুট্টির, বল, ধুরে, বর্প, শৃগাল, বজ্রাঘাত, হাতে প্রভৃতি শব্দের

২১ মাস্টার মশায়ের ভায়েরী, পৃঃ ৬৬৫

২২ মাস্টার মশায়ের ভায়েরী, পৃঃ ৭০৪

২৩ শ্রীশ্রীরাঘবকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ৪

পরিবর্তে তদানীন্তন প্রচলিত দেখা, গোঁজা, বৈজ, ধা, দল, লিগাল, বরজাভাত, হাথে প্রকৃতির ব্যবহার দেখে নাসিকাকুঁকন করা ঠিক হবে না, তেরনি দ্বিবা, ক্ষমা, গর্তপাত, অযোধ্যা ইত্যাদির পরিবর্তে দীর্ক, থেমা, গর্তপাত, অজধ্যা অথবা বানানের ক্ষেত্রে সরোজ, পশ্চাতে, শরণ, বৃত্তান্ত, তপখী, হিম্যাচল, কৃপা ইত্যাদির পরিবর্তে স্বরজ, পশ্চাতে, বির্তান্ত, তপশ্বি, হিম্যাচল, কৃপা ইত্যাদির ব্যবহারে স্থানীয় প্রবল প্রভাবেরই ইঙ্গিত করে। অবশ্য কয়েকটি শব্দের বানান তিনি কালক্রমে সংশোধন করেছিলেন। তাছাড়াও কয়েকটি শব্দের বানান তিনি বোধ হয় বরাবরই ভুল করেছেন। এগুলির জন্ত দ্বারী তাঁর নিজের শেখার ভুল অথবা পাঠশালার গুরুশাশ্রয়ের ভুল, তা আজ কে হলফ করে বলবে? তাছাড়াও কিশোর জীগদাধর প্রত্যেকটি পুঁথি নির্মার সঙ্গে হবহ নকল করেছিলেন। পুঁথির শেষে তিনি লিখেছেন, ‘জখাদিষ্টং তথা লিখিতং লক্ষকো নাস্তি দোসক’^{২৪}— এদিক হতে বিচার করলেও অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দের ব্যবহার, আঞ্চলিক শব্দের প্রভাব, ছন্দের স্বাক্ষর খনন, বানান ভুল ইত্যাদি ক্রটিবিচ্যুতির জন্ত অহুলপি-কারের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে যে আকর পুঁথিগুলি তিনি অহুম্রণ করেছিলেন সেগুলিকেই দ্বারী করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ অনেকেরই একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে, জীগদাধর হিসাবপত্র কিছু জানতেন না, বুঝতেন না। বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। অনস্বীকার্য যে তিনি নিজস্ব বলেছিলেন, ‘পাঠশালে শুভঙ্করী আঁকে ধাঁধা লাগত।’ লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন : ‘গণিতশাস্ত্রে বালকের উদাসীনতার কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পাঠশালার যাইরা সে এই বিষয়েও উন্নতি সাধন করিয়াছিল। আমরা অনিয়াছি, ধারাপাতে কাঠাকিয়া পর্বত এবং পাটিগণিতে ভেরিল হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্ত গুণভাগ পর্বত তাঁহার শিক্ষা অগ্রসর হইয়াছিল।’ এখানে তাঁর নিজের হাতে লেখা দুটি হিসাবের আলোক-প্রতিলিপি উপস্থাপিত করা হচ্ছে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এ দুটি পাটিগণিতের নিছক মিজযোগ নয়, হিসাবের লেনদেনের সুন্দর প্রমাণ। যদিও পুঁথিবার লিখেছেন, জীগদাধর যোগ জানতেন, বিরোগ জানতেন না,^{২৫} এই অভিযোগ

২৪ তিনি একটি পুঁথিতে লিখেছেন : ‘জখাদিষ্টং তথা লিখিতং লক্ষকো নাস্তি দোসক।’

২৫ স্বভাবতঃ যোগে মন তাই যোগ হ’ল। অধম বিরোগ তাহে বুদ্ধি বৈক সেল।

পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণ থাকে ধার। কেমনে বিরোগে বুদ্ধি আগিবে তাঁহার। পুঁথি, পৃঃ ১৯

আর্থিক অর্থে গ্রহণ করলে তুল হবে। অবশ্য শ্রীমন্তকবীরীর পাঠকবাহেই জানেন যে, তিনি যখন বৈতনিকতাবিবিধিত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন, মেকালে তাঁর হিসাব পড়ে গিয়েছিল। তিনি নিজমুখে বলেছেন 'এ অবস্থায় পরগণনা হয় না। গণ্যে গেলে ১১৭:৮ এই রকম গণনা হয়।' ২৬

শ্রীগদাধরের লেখাপড়া বেশীকৈ অগ্রসর হতে পারেনি কয়েকটি কারণে। বালক সাত সাত বছর বয়সে পিতৃদেবকে হারান। পিতৃবিয়োগ বালকের মনে গভীর রেখাপাত করে। 'বালক কিন্তু এখন হইতে চিত্তাশীল ও নির্জনজিয় হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তাঁহার চিত্তার বিষয় করিয়া তাহাদিগের আচরণ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।' ২৭ দ্বিতীয়তঃ নয় বছর বয়সে উপনয়ন লাভের পর শ্রীগদাধর আনন্দমনে সঙ্ঘাবন্দনাহি এবং কুলবিগ্রহ ৮রযুবীর ও ৮শতলা মায়ের পূজা করতে থাকেন। সত্তবতঃ এই সময়েই তাঁর পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হয়। তাঁর অন্ততম জীবনীকার লিখেছেন, 'কেবল অন্ত্যজ জাতি ব্যতীত গ্রামের ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল বর্ণের বালককেই পাঠশালার একস্থানে বসিয়া মিলিতভাবে শিক্ষালাভ করিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন হইবার পর অপর বর্ণের সংসর্গ হইতে তাহাকে পৃথক থাকিতে হয় বলিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলেও সে বাধ্য হইয়া পাঠশালা পরিত্যাগ করিত। সুতরাং গদাধরের নয় বৎসর বয়সে উপনয়ন হইবার পরও যে তিনি পাঠশালার যাইতেন ইহা বলিয়া বোধ হয় না।' ২৮ তৃতীয়তঃ ইতোমধ্যে শ্রীগদাধরের মানসদরোবরে অধ্যাত্মপন্থের কোরকগুলি একে একে প্রস্ফুটিত হতে থাকে; তাঁর মধ্যে আসে পরিবর্তন, ২৯ মামুলি লেখাপড়ার তাঁর আকর্ষণ করে যায়। উপরন্তু 'অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও মানসিক সংস্কারসম্পন্ন' কিশোরের স্মৃষ্টিতে তাঁর দেবতুল্য পিতার বৈরাগ্য ঈশ্বরপ্রীতি সত্যবাহিতা সন্যাসারের তুলনায় গ্রামের পণ্ডিত ও ভট্টাচার্য্যদি ব্যক্তিদেহের ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপর আচরণ ধরা পড়েছিল, তাঁর কোমল মনকে ব্যথিত করেছিল। অপরপক্ষে তিনি তাঁর ভাবানুসোদনকারী রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করতে ও সমকালীন

২৬ কথামৃত ১.১৩।৩

২৭ শ্রীমন্তকবীর, পৃঃ ৩৮

২৮ শ্রীমন্তকবীর বলেছিলেন : 'ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল।... সেই দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলাম।' (কথামৃত ১।১৭।৩) সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স লীলাপ্রসঙ্গরতে আট বছর, কথামৃতরতে এগার বছর।

রীতি অল্পখারী ধর্মবিধরক পুঁথিলকন অল্পলিপি করতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। জীগদাধরের অঙ্গলিত কঠে পুরাণাদির পাঠ জনতে ভিড় লেগে যেত, 'চারিধারে ঘেরে তারে জনে ব'সে ব'সে। গদ্যের পুঁথিপাঠ পরম উদ্যাসে।'^{২২}

বিজ্ঞানতনের চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর বিভাচর্চা বেশীদূর অগ্রসর না হলেও বিজ্ঞানতনের বাইরে যে বিভার অক্ষরক ভাণ্ডার, সেখান হতে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অমূল্য সম্পদ। কষ্টিসম্পন্ন চাটুজ্যে পরিবার ছিল জীগদাধরের শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তিভূমি। ধর্মপ্রাণ পিতা ক্ষুরিরাম ও সরলমনা ভক্তিযতী মাতা চন্দ্রমণি ছিলেন তাঁর চরিত্রশিক্ষার আদর্শ দীপ। সেইসঙ্গে গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, সামাজিক সম্পদ শিক্ষার্থী জীগদাধরকে জুগিয়েছিল অক্ষরক উপকরণ। তাঁর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, অগতীর বোধশক্তি, সহজাত ঈশ্বরপ্রীতি—রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, রামরসায়ন, চণ্ডীর গান, হরিসংকীর্তন, রামায়ণ, ভারত, ভাগবত ও পুরাণাদির পাঠ এবং সর্বোপরি বারমাসে তেরো পালাপার্বণের মধ্য হতে প্রয়োজনমত ভাবরস সংগ্রহ করেছিল।

জীগদাধর আজন্ম ভাবুক। বিস্তৃত তাঁর মন। শুকনো দেশলাইয়ের কাঠির মত সামান্য উদ্দীপনেই তাঁর মন স্তম্ভ ও গভীরভাবে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, তাঁর মনশাখী দেহভাল ছেড়ে উড়ে যেতে চায় চিদাকাশের অসীম লোকে। সেইসঙ্গে তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত মন, স্তম্ভ ও বিচিত্র রসবোধ সহজাত প্রবর্তনার মেতে ওঠে বিবিধ চাকশিল্পে। চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষুরিত হয় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, কল্পনার গভীরতা ও সহজে ভাবপ্রকাশের দক্ষতা প্রকাশ পায় তাঁর বিভিন্ন শিল্পকর্মের মধ্যে।^{২৩} তাঁর বিচিত্র বিভাচর্চার মধ্যে স্তম্ভরসভাবে মিলিত হয়েছে তাঁর অসাধারণ শিল্পপ্রতিভা ও তত্তোষিক অসাধারণ তাঁর ঈশ্বরপ্রীতির জন্ত প্রাণের আকৃতি। ক্রমে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন 'বিজ্ঞানী'-রূপে এবং বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে বলেন যে, 'এই সংসার মজার কুঠি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি'।

আটশষ তাঁর অভুলনীর ধারণার ও ধারণের সামর্থ্য সকলকে বিস্মিত করেছিল। জীৱামরকক নিজস্বখে বলতেন, 'কিন্তু ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে (কাহারপুকুরে) সাধুরা পড়ত বুঝতে পারতুম। তবে একটু আধটু ফাঁক যায়, কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে

২২ পুঁথি, পৃঃ ২

৩০ 'বিষবাসী', আশ্বিন ১৩৮১ : 'শিল্পী জীৱামরকক' প্রবন্ধ।

সংকৃত কথা কইতে পারি না।^{৩১} সেই কারণে তিনি সহজেই দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতদের সঙ্গে তাবের আদান করতে পারতেন, তেমনি ইংলিশম্যানদের যুক্তিবিচারের আলোচনা অনায়াসে বুঝতে পারতেন ও মাঝে মাঝে গভীর ভাবগোতক সম্ব্য করতেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করতে পারি, শ্রীগদাধরের বয়স তখন নয় কি দশ বছর। গ্রামের অমিদার লাহাবাবুদের এক শ্রাদ্ধবাসরে একটি বিরাট পণ্ডিতসভা বসেছিল। একটি ভাটিল প্রস্ন নিয়ে বাগ্‌হুবাধ করতে করতে পণ্ডিতেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সমাধান খুঁজে পান্নিলেন না। সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীগদাধর একটি সহজ সরল সমাধান দিয়ে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন। দ্বিতীয় একটি ঘটনা। কান্দিপুরে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে তন্ত্রের কয়েকটি শ্লোকের তাৎপর্য নিয়ে মহিমাচরণ, জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও অধরলাল সেনের মধ্যে তুমুল বচসা হয়। বাগ্‌হুবাধে সমাধান না হওয়াতে তাঁরা উপস্থিত ছন শ্রীগায়ত্রীকণ্ঠের নিকট। ঠাকুর শ্রীগায়ত্রীকণ্ঠের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে অধর সেন বিস্মিত বোধ করেন।^{৩২} শ্রীগায়ত্রীকণ্ঠ নিজেই বর্ণনা করেছেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিনি বলেছেন : 'সেজবাবুর সঙ্গে আরেক জায়গায় গিয়েছিলাম। অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখা! তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বলে, "মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা করে সে সব পড়া, বিজ্ঞা, সব থু হয়ে গেল। এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জানের অভাব থাকে না, মুখ বিধান হয়, বোবার কথা ফুটে।" তাই বলছি বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না।'^{৩৩} দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ শাস্ত্রী, গোঁরা পণ্ডিত, পদ্মলোচন প্রভৃতি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা শ্রীগায়ত্রীকণ্ঠের যথার্থ পাণ্ডিত্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী তো বলেছিলেন, 'এঁকে দেখে প্রমাণ হ'লো যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মনন করে ষোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।'^{৩৪} তেমনি আবার ইংরাজীপড়া কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীগায়ত্রীকণ্ঠের যথার্থ বিজ্ঞাবত্তা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আবার এইসব

৩১ কথাস্মৃত ৪।১২।১

৩২ শ্রীশ্রীগায়ত্রীকণ্ঠপরমহংস দেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃ: ১২১ ও শ্রীশ্রীগায়ত্রীকণ্ঠ পুঁখি, পৃ: ৩৪৭। বর্ণনার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকলেও মূল ঘটনা এক।

৩৩ কথাস্মৃত ১।১৭।৩

৩৪ কথাস্মৃত ১।১৩.৫

ইংলিশম্যানদের সঙ্গে কথা বলার সময় Refine, like, honorary, society, under, tax, cheque, thank you ইত্যাদি চুটকি শব্দ ব্যবহার করে বিয়ল আনন্দ বিতরণ করতেন। ইংলিশম্যান মহেজনাথকে শিখিয়েছিলেন যে, বই পড়লেই জ্ঞান হয় না, ঈশ্বরকে জানার নাম প্রকৃত জ্ঞান। বিজ্ঞান সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন : 'আপনি সব জানেন—তবে খণ্ডন নাই।'

নিঃসন্দেহে শ্রীগদাধর তথা শ্রীরামকৃষ্ণের অল্পমত বিজ্ঞানচর্চা ও চর্চার ধারা সম্পূর্ণ তাঁর স্বকীয় ও অভিনব। বিজ্ঞানীর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান ছিল, 'যাবৎ বাচি তাবৎ শিখি।' শ্রীগদাধর হতে শ্রীরামকৃষ্ণে উত্তরণের বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে স্থপরিমুখ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে মৌলিক ভাবনা। তিনি 'অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন যে, প্রচলিত বিজ্ঞানশিক্ষার গভী মর্দোণ। যৌবনের প্রারম্ভে চৌলের পণ্ডিত জ্যোষ্ঠ রামকুমারকে তিনি স্বার্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'চাল কলাবাধা বিজ্ঞা আমি শিখতে চাই না, আমি এমন বিজ্ঞা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়, মাহুয বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।' তিনি শুধুমাত্র বলেছিলেন না, তিনি নিজেকে সেই বিজ্ঞা আয়ত্ত্বও করেছিলেন। তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই বিজ্ঞা যে 'বিজ্ঞার বুদ্ধি শুদ্ধ করে' ৩৫ সেই 'বিজ্ঞা', যা থেকে ভক্তি, ধর্ম, জ্ঞান প্রেম ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। ৩৬ তিনি এই বিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন অস্বাভাবিক একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। মাহুযজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বলাভ। তাঁর মতে 'যার ঈশ্বর মন সেই ত মাহুয। মাহুয আর মানহুঁস যার হুঁস আছে, চৈতন্ত আছে ; যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য সেই মানহুঁস। ৩৭ বিজ্ঞা মাহুযকে মানহুঁস করে; তাঁর অস্বাভাবিক পরিপূর্ণতা মাহুযকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই বিজ্ঞার বিজ্ঞান ব্যক্তি সম্বন্ধে উপনিষদ বলেছেন '(বিজ্ঞান) অমৃতঃ সমস্তবৎ'। ৩৮ এই বিজ্ঞালাভ করে মর মাহুয জ্বর হয়ে যায়, 'বিজ্ঞা বিলতেহমৃতম্'। ৩৯ বিজ্ঞালাভ করে মাহুয

৩৫ স্বরেশচন্দ্র লঙ্কলিত শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, ৩৫৫নং

৩৬ কথামৃত ৩।২।২

৩৭ কথামৃত ৩।২।৩

৩৮ ঐতরেয় ৩।১।৪

৩৯ কেন ২।৪।

চাওয়া-পাওয়ার উৎসে' চলে যায়, তার জাতব্য কিছু বাকী থাকেনা। 'যজ্ঞজ্ঞান
নেহ ভূয়োহস্তজ্জাতব্যমবশিষ্টতে।' ৪০

বিজ্ঞার্থী পুঁথি-পাটার সীমিত শক্তি সত্ত্বে অনেক সময়েই সচেতন থাকে না,
ফলে বিজ্ঞার লক্ষ্য হতে চ্যুত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞার্থী ও বিজ্ঞাধারী উভয়কেই
ছঁপিরার করে বলেছেন, 'শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া
বড় কঠিন।' ৪১ 'শাস্ত্র পড়ে হৃদ অস্তিমাত্র বোধ হয়।' ৪২ শাস্ত্র ঈশ্বরতত্ত্বের
সন্ধান দেয় মাত্র। তিনি শাস্ত্রাহুরাগীদের ইতিকর্তব্য সত্ত্বে নির্দেশ দিয়েছেন
নিজেকে নজির দেখিয়ে। তিনি বলেছেন, 'শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও
স্বার্থ। স্বার্থটুকু লতে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা,
আর যে ব্যক্তি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির
কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি যার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে
কিছুই লই না।' ৪৩ অজ্ঞাতজ্ঞাপক শাস্ত্র বিদ্বান শ্রীরামকৃষ্ণের 'চূড়ান্ত
মাণকাটি ছিল না, অপরোক্ষজ্ঞানই ছিল তাঁর তুলাধণ্ড।

বিজ্ঞার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞার যে সফল সে বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তিমত
সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি বলতেন : 'এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর,
ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যত্ন মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ
কর্তে হয় তাহলে তার কথানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ এসব
আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো সো করে—সব করেই হোক,
চারবানদের ধাকা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর জিতরে ঢুকে যত্ন মল্লিকের
সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্ষের খবর জানতে ইচ্ছা হয়,
তখন যত্ন মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে
রাব—তারপর রামের ঐশ্বর্ষ—জগৎ।' ৪৪ তিনি নিজে ব্যাকুলতা ও অহুরাগের
সাহায্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দর্শন লাভ করেছিলেন, ক্রমে শাস্ত্রাহুরাগে সাধন তত্ব
করে ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় সঙ্গরণ ও নিগূণবস্তু বোধে বোধ করেছিলেন।
ঈশ্বরের রূপার তিনি হয়েছিলেন সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা
বর্ণনা করে বলেছেন : 'তিন দিন করে কেঁষেছি, আর পুরাণ তত্ত্ব—এসব শাস্ত্রে
কি আছে—(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন।' ৪৫ আবার লোকশিক্ষকের
ভূমিকার তাঁর অভিজ্ঞতা সত্ত্বে বলেছিলেন : 'তাঁর রূপা হলে জানের কি আর
অভাব থাকে? দেখনা, আমি তো মুখ্য কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা

৪০ গীতা ৭।২ ৪১ কথামৃত ৪।২০।৫ ৪২ কথামৃত ১।১২।৩
৪৩ কথামৃত ৩।১৫।২ ৪৪ কথামৃত ২।২২।১ ৪৫ কথামৃত ৪।২৪।৩

বলে কে? আবার এ জ্ঞানের তাণ্ডার অক্ষর!... আমিও যা কথা করে বাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, যা আবার অবনি অক্ষর জ্ঞানতাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।^{৪৬} তাছাড়াও লৌকিক উপায়ে স্বেচ্ছায় তিনি অনেক বর্ষশাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছিলেন^{৪৭} এবং সেই সকল শাস্ত্রবানীর তাৎপর্য অপরোক্ষ জ্ঞানের আলোকে যাচাই করে নিয়েছিলেন।

বিভার্জনের জন্ত তিনি যে বুদ্ধিপূর্ণ অনন্তসাধারণ একটি পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলতেন: 'অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুদ্ধি জ্ঞান হয় না, বিজ্ঞা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল, কান্নীর বিষয় পড়া, কান্নীর বিষয় শোনা আর কান্নী-দর্শন অনেক তফাৎ।'^{৪৮} তিনি বিজ্ঞার উপকরণ সংগ্রহের জন্ত শ্রুতি-সাধ্যম বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সংগৃহীত উপকরণ স্বায়ত্তকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশী। তিনি বলতেন: 'দেখ, শুধু পড়ানোতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।'^{৪৯} দুধের কথা শুনে বা দুধ দেখলে হবে না, দুধ জোগাড় করে খেলেও হবে না, সেই দুধ খেয়ে হজম করে শরীরকে পুষ্ট বলিষ্ঠ করতে হবে—একপ বাস্তবধর্মী ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিধান শ্রীমাক্ককের। শ্রীমাক্ককের এই শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে আমরা জনতে পাই বৃদ্ধ মহম্মদহাজের উক্তির প্রতিধ্বনি। তিনি বলেছেন: 'অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিশো বরাঃ। ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসারিনঃ।'^{৫০} অর্থাৎ অজ্ঞ অপেক্ষা গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ঠ; শুধুমাত্র শব্দার্থ পাঠকের চাইতে শ্রেষ্ঠ তিনি যিনি পঠিত বিষয় ধারণা করেছেন। তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ তিনি যার জ্ঞান হয়েছে। এবং এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি জ্ঞানানুসারী কর্মসূচীকরণ করেছেন। সমগ্র একটি গ্রন্থাগার

৪৬ কথাসূত্র ১১৭।৩

৪৭ তাক্কার মহেঞ্জ লাল সরকার সম্ভব্য করেছিলেন: কেন ইনি (শ্রীমাক্কক) কি শাস্ত্র দেখে বিধান হয়েছেন? আর ইনিও ত এই কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না? উপস্থিত শ্রীমাক্কক তাঁর ভুল ধারণা সংশোধন করে দিয়ে বলেন: 'ওগো, আমি জনেছি কত। (কথাসূত্র ২২৫।২)

৪৮ কথাসূত্র ১১৫।২

৪৯ কথাসূত্র ২১১।৩

৫০ মুহম্মদহিজা ১২।১০৩

(৩৩)

স্বায়ত্তক—৩

স্বভিকোষে লক্ষ্যের চাইতে পাঁচটিমাত্র লভ্য জীবনে আয়ত্ত করার মূল্য অনেক বেশী। অধীত বিচার সার্থকতা তখনই যখন তদন্তকারী জীবন বিকশিত হয়। ঐশ্বর্যকর নিজে পরা ও অপরা বিজ্ঞা আয়ত্ত করেছিলেন। লৌকিক ও অলৌকিক উপায়ে বিজ্ঞা সংগ্রহ ও স্বকীয় করেছিলেন। বহুজনহিতের সেই বিজ্ঞা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাই তিনি সর্বলোকপূজ্য জগদগুরু।

ঐশ্বর্যকর বিজ্ঞার চর্চা ও চর্চাকে মানবজীবনভূমিতে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ভারতগৌরব পরাবিজ্ঞাকে স্বহস্তে পুনঃস্থাপন করেছিলেন। অপরাবিজ্ঞাকে দিয়েছিলেন যথাযোগ্য মৰ্যাদা। ‘ঐশ্বর্যকর অজিত বিপুল বিজ্ঞারূপি তাঁর জীবনে বোকা না হয়ে হয়েছিল বিভূষণ, তাঁর সার্বভৌমত্ব চরিত্রের স্ফোৰ্তন ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যকর বিজ্ঞাবস্তার ছিল না প্রথমে উদ্ভাপ, সেখানে ছিল স্নিগ্ধ প্রশান্তি। সেই বিজ্ঞার বিমল কিরণের সংস্পর্শে শত শত জীবনকুম্ভ প্রস্ফুটিত হয়েছিল, বর্তমানেও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় ছিল তিনি কৈবর্তের ঠাকুরবাড়ির পুন্ড, একজন পাগলাটে বামুন। রামধানী কলকাতার ইংরেজী শিক্ষিতদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন মূর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তৎসঙ্গেও কিছু লোকের মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি উপলব্ধিবান পুরুষ, ঈশ্বরবেত্তা মহাজন, পরমহংস; আবার দু'চারজন লোক জানতে পেরেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার। তবুও তিনি নিরক্ষর বৈ তো নয়। কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণী বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মহাজানী। তদানীন্তনকালের শিক্ষিত-সুব-মানস তাঁর জ্ঞানরশ্মির আলোকে চঞ্চল হয়েছিল, প্রাজ্ঞচিন্তেরা হয়েছিলেন বিমোহিত। বেধে বিম্বিত হতে হয় যে তাঁর জীবনের শেখপাথে দেশের সেবা সেবা মাহুবেয়া তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন তাঁর কাছে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা শিক্ষালভের জন্ত।

‘মূখ’, ‘নিরক্ষর’, ‘গ্রাম্য’ ইত্যাদি অপবাদে অনেক সময় ভূষিত হলেও তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষক, লোকশিক্ষক, সুগ-প্রবর্তক খসি। সুপণ্ডিত বামুনী প্রভাপট্টে মজুমদার লিখেছেন : ‘আমি একজন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, সভ্যতাভিমাত্রী, আর্থ্যাথেমী, অর্থসংশয়বাহী, শিক্ষিত তাত্ত্বিক, আর তিনি দরিদ্র মূখ’ অসত্য অর্থ-পৌত্তলিক বান্ধবহীন হিন্দু। যে আমি ভিসরেণী, কসেট, ট্যানলী, ম্যাকমুলার প্রভৃতি বহু যুরোপীয় পণ্ডিত ও ধর্মযাজকদের বক্তৃতা শুনিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিবার জন্ত বহুক্ষণ বসিয়া থাকি কেন?...কেন আমি বাকশূন্য হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে থাকি? শুধু আমি বলিয়া নয়, আমার ন্যায় অনেকেরই এইরূপ অবস্থা। অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়াছে ও পরীক্ষা করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত কথা কহিতে লোকের ভিত্ত হইয়া থাকে।’ বিশিষ্ট সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ ওদ্র তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন : ‘বিদ্বাভিকর বিদ্বান্নিয়ে তাঁর কথা শুনত খ্যাতিমানা বক্তা, বেথক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মমত প্রভৃতি; এক বড়ই তারা তনত তনতই বেতে বেত তাদের জ্ঞান ও তক্তি। তার কারণ, তাঁর কথাই সত্য কথা-মণ্ডল প্রভৃতি বক্তব্য তারা কখনও পেরেন নি।- তারা প্রায় প্রায়

অল্পতব করত তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে শক্তি, রয়েছে লাগিত্য, উত্তাপ অথচ প্রশান্তি।’

তাঁর পরিচিতদের মধ্যে দেখতে পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়রূপ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ রত্নসিংহ প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাদের ; ইরানন্দ সরস্বতী, পণ্ডিত বৈকুণ্ঠচরণ, পদ্মলোচন, গৌরীপতি, লক্ষ্মণ তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি শাস্ত্রবিদদের ; ধর্মবিজ্ঞানে অগ্রণীয়েদের মধ্যে ভোতাপুরীজী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, জৈলক্ষ্মণাচার্য প্রভৃতি দ্বিকপালদের ; সাহিত্যসেবীদের মধ্যে হাইকেল, বিদ্যালোগর, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অধরলাল প্রভৃতি । চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখতে পাই মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি । যিনিই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনিই তাঁর সঙ্কল্প পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, নবীন আলোকে নিজ নিজ জীবনপথকে উদ্ভাসিত করেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘরচনা বিদ্যালোগর বিশ্রিত হয়ে শুনেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত । শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন : ‘আপনি সব জানেন—তবে খপ্পর নাই ।’ আর্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ইরানন্দ সরস্বতী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বলেছিলেন : ‘এঁকে দেখে প্রমাণ হ’লো যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মনন করে ঘোলটা খান, একপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান ।’ বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের এই ধরনের স্বীকৃতির আলোকে রসিক শ্রীরামকৃষ্ণের ‘আমি মুখোত্তম’ ‘আমি তো মুখ্য’ ইত্যাদি মন্তব্য তাঁর বিদ্বজ্জনোচিত বিনয়কে নির্দেশ করে মাত্র ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠকমাত্রই জানেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিরঙ্কর অপবাদ অতিকল্পনাঘোষে ছুটে । তিনি সাক্ষর ছিলেন এইমাত্র বললেও তুল হব, শিক্ষার চূড়ান্ত আদর্শের মাগকাঠিতে বিচার করলে তাঁকে বলতে হবে শিক্ষিতোত্তম । তিনি যে বিভ্রাটিকা হুতভাবে করেছিলেন তাই নয়, অপরের মধ্যে সেই বিভ্রাট সফারের অত্যন্তর্ঘ বক্ষতা অর্জন করেছিলেন । এ বিষয়ে তাঁর মৌলিকতা শিক্ষাজগতে একটি পরম বিষয় । দোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততম শিক্ষার্থী নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যথার্থই বলেছিলেন : ‘When I think of that man, I feel like a fool, because I want to read books and he never did...he was his own book.’

শিক্ষালভের প্রধান অবলম্বন মন । শিক্ষার্থীর মনের উপর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের । স্বামী বিবেকানন্দ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলেছিলেন : ‘মনের বাহিরে জড় শক্তিসকলকে কোন উপায়ে আরত করে কোন একটা অদ্বুত ব্যাপার যেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে শাপলাবান্ধব

লোকের মনগুলোকে কাঁদায় তালের মত হাত দিয়ে ভাঙত, মিটত, গড়ত, স্পর্শমাজেই নৃতন ছাঁচে বেলে নৃতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়ি আদর্শ ব্যাশার আশি আর কিছুই দেখি না।' সেই কারণে শিক্ষা বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ অধিকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল সমগ্র জীবনকে নিয়ে। শিক্ষিতব্য বিষয় নির্ধারিত হ'ত বিভিন্ন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী। দর্শনের ছাত্র তাঁর কাছে দর্শনতত্ত্ব শিখতেন, ধর্মসাধক তাঁর কাছে নিতেন সাধনতত্ত্বের উপদেশ-নির্দেশ, সংসারী জেনে নিতেন সহজ জীবনযাত্রার উপায়। শুধু কি তাই? আমরা দেখতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে নাট্যকার অভিনয় শব্দে, সঙ্গীতজ্ঞ সুরের তাৎপর্য শব্দে, চিত্রশিল্পী চিত্র শব্দে নিত্যনূতন জ্ঞান ও ভাবালোক লাভ করেছেন। কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের সকল প্রকার শিক্ষাদানই ছিল জীবনকেন্দ্রিক—মানব জীবনের মূল লক্ষ্যাভিমুখী।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে বহুযাজীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। তিনি বলতেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না-জানার নাম অজ্ঞান। ঈশ্বর মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি বা শুদ্ধমনের গোচর। ঈশ্বরই সত্য। ব্রহ্মবস্তুই ত্রিকালারাধিত নিত্যসত্য। ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকে না, তাই ব্রহ্মজ্ঞানে বন্ধন সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অপর সবকিছু বিষয়ের জ্ঞানে বন্ধন আনে। তাই পার্থিব জ্ঞান অজ্ঞানের নামান্তর। পরমর্শেচৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা বা বোধে বোধ করার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানে অনাধি অজ্ঞানের নাশ হয়, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়; মাহুয়ের সংসারবন্ধন খসে পড়ে, মাহুয় চিরমুক্তি লাভ করে। তখন ঈশ্বর ভিন্ন পার্থিব জ্ঞানে প্রীতি জন্মালেও মাহার সংসারবন্ধনে সে আর বাঁধা পড়ে না।

লেখাপড়া জানলাভের আগে না পরে, এই প্রথম, শ্রীরামকৃষ্ণের সবীপাগত শিক্ষার্থীদের মনে উকিঝুকি মারত। কারণ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই তাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়ে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই সব শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : 'এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর, ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যত্ন মজিকের সঙ্গে বহি আলাপ করতে হয় তাহলে তার কথানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ এসব আগে আমার মত খবরে কাজ কি? যো সো করে—সব করেই হোক, দারবানের খাড়া খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যত্ন মজিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর বহি টাকাকড়ি ঈশ্বরের

খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন বহু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে যাব—তারপর যাবের ঐশ্বর্য—অগ্ন্য।' লোক-শিক্ষকের ভূমিকার তিনি তাঁর অনন্তসাধারণ অভিজ্ঞতা সহজে হাসতে হাসতে বলেছিলেন : '...অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্য! তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বললে, "ব্রহ্মাণ্ড! আগে যা পড়েছি, জোয়ার সঙ্গে কথা করে সে সব পড়া বিভা সব খুঁ হয়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর রূপা হলে জানের অভাব থাকে না, মুখ' বিধান হয়, বোবার কথা ফুটে!"...দেখ না, আমি তো মুখ্য, কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আমার এ জানের ভাণ্ডার অক্ষয় :...আমিও যা কথা, করে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, যা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জানভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।'

'ঐরাবতকৃষ্ণের দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে যাবতীয় শিক্ষার ভিত্তিকার সার। এই ধর্ম মতমতান্তরে নাই, শাস্ত্রশরিরেতে সীমাবদ্ধ নাই। ধর্ম হচ্ছে আত্মবিভা। প্রত্যক্ষানুভূতির উপর তার প্রতিষ্ঠা। এই ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা জীবনের সকল কাজকর্মের মূল ভিত্তি। ঐরাবতকৃষ্ণের ভাবে বলতে হয়, ঈশ্বরকে খোঁটারূপে ধরে যত ইচ্ছা বন্ বন্ করে ঘুর' বুড়ী ছুঁয়ে যত ইচ্ছা কানামাছি খেল, তারপর যত ইচ্ছা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান ব্যবসা কর; লক্ষ্য স্থির থাকলে পতনের সম্ভাবনা নাই।

ঐরাবতকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে বিদ্যুতের বলক নাই, আছে চন্দ্রিমার কোমলতা, স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য। এর প্রভাবে আবিষ্কৃত বাহুবের মনে আকীর্ণ হয়েছে এক নবীন বিশ্বাসের ভাবলিমা।

ঐরাবতকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি মৌলভবের সম্মান পাওয়া যায়। ১. ঐরাবতকৃষ্ণ ছিলেন পাকা বৈদান্তিক। তাঁর মতে বাহুবের অন্তরেই লুকানো রয়েছে অনন্ত জানের ভাণ্ডার। যাঁটি চাপা সোনার মত জানের রত্নমাণিক্য লুকিয়ে আছে বাহুবের মনের গহনে। মনের খনি খনন করে রত্নমাণিক্য তুলতে হবে। লোকশিক্ষক ঐরাবতকৃষ্ণের আদর্শ-বাণী, বাহুবকে মানস'স হতে হবে। বাহুব অন্তরের পুত্র, সে অন্তরের পুত্র নয়। প্রকৃতই সে সর্ববস্তুর সর্বজ্ঞ, সে অসহায় অজ্ঞান নয়। বাহুবের মধ্যে রয়েছে অজ্ঞাত স্বপ্ন মহান চৈতন্যশক্তি। বাস্তবিকই সে সৎ-চিন্তা-আনন্দ-স্বরূপ। সে নিত্য-সুখ-সুস্থ-সুখ। কুল করে সে নিজেকে দুঃখী তাপী ক্ষুদ্র সীমিত মনে করে কষ্ট পাচ্ছিল। শিক্ষার উৎকর্ষ বাহুবের দীর্ঘকালের এই কুলটি ক্ষেদ্রে ফেঁদে ফেঁদে

মাহুকে তার প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বৈদ্যভিত্তিক এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাতত্ত্বটি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সার্থক বলতেন একটি গল্প। একদিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ একটি ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। বাঘ অবাক হয়ে দেখলে, ছাগলের পালের মধ্যে একটি বাঘ; সে হাস খাচ্ছিল, তারে অস্ত্র ছাগলের সঙ্গে ঘোঁড়ো পালাল। আততায়ী বাঘটা অস্ত্রের ছেড়ে দিয়ে হাসখেলো বাঘটাকে ধরলে। সেটি তো ত্যা ত্যা করতে লাগল। বাঘ তাকে জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল আর বলল : 'এই জলের তিউর তোর মুখ দেখ। দেখ, আমারও যেমন হাড়ির মত মুখ, তোরও তেরনি।' তারপর তার মুখে এক টুকরো মাংস ওঁজো দিলে। সে প্রথমে খেতে চায় না, পরে রক্তের একটু একটু আশ্বাস পেয়ে খেতে লাগল। বাঘটা তখন তাকে বলল : 'ব্যাটা তুই ছাগলের সঙ্গে ছিলি, ওদের মত হাস খাচ্ছিলি, ওদের মত ত্যা ত্যা করছিলি, ঠিক তোকে।' হাসখেলোর সব্বি করে, তার বোধ হয় সেও প্রকৃতপক্ষে বাঘ, ছাগল নয়। সে বাঘের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গর্জন করে ওঠে, শেষে বনে চলে যায়। হাসখেলো বাঘ মানে আত্মবিস্মৃত অস্বভাবের সম্ভান। আততায়ী বাঘ এখানে শিক্ষক, তিনি জ্ঞানদাতা চৈতন্যদাতা গুরু।

তু কি তাই? মাহুয় নিজের সংস্করণ ভুলে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে থাকে, এতই ডুবে থাকে যে সে নিজের দুরবস্থা হতে মুক্ত হবার চেষ্টা পর্ব্বত করে না, বরঞ্চ তার নিজের দুরবস্থার মধ্যেই সাধনা পাবার চেষ্টা করে; আবার দুঃখকষ্টের রাজ্য অত্যধিক বেড়ে গেলে এবং সেটা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলে সে জ্ঞানালোকের সম্ভানে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। সে বিশ্বাসই করতে চায় না যে তারই অন্ধকরণে অজ্ঞানের মেঘে ঢাকা পড়ে রয়েছে চিরভাস্বর জ্ঞানস্বরূপ। আচ্ছন্নদৃষ্টি মুঢ় ব্যক্তির মত সে স্বর্ষকে দেখে মেঘাচ্ছন্ন নিশ্চিন্ত। সে ভুলে যায় যে সর্ব্বাত্মন্যত আত্মচৈতন্যই তার স্বরূপ। সে বিশ্বাস করে না যে জীবব্রাহ্মই শিব। এই মূল্যবান তত্ত্বটি শিক্ষার্থীর দ্বারা দৃঢ়ভাবে এঁকে দেবার জন্য ঐশ্বর্য্যবল্লভ বলতেন আরেকটি গল্প : 'একজন তামাক খাবে, তো প্রতিবেশীর বাড়ী দিকে ধরাতে গেছে। তখন অনেক রাত। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ঘোর টেগাঠেগি করবার পর, একজন ঘোর খুলতে নেমে এসে। লোকটির সঙ্গে দেখা হতে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কিগো, কি মনে করে?" সে বললে, "আর কি মনে করে, তামাকের বেশা আছে, জ্ঞান ও ; দিকে ধরাতে এসেছি।" তখন প্রতিবেশী বললে, "বাঃ তুনি তো বেশ লোক! এত কষ্ট করে আগা, আর ঘোর

ঠেলাঠেলি। তোমার হাতেই যে লঠন রয়েছে।” গল্প শুনে হেসে ওঠে শ্রোতারা, কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা শোনে ত্রিরাশিক-কণ্ঠে গল্পের নীতি-সার : ‘যা চায়, তাই তার কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে।’ আবার তাঁর গান : ‘যা চাষি তা খুঁজে পাবি, দেখ নিজ অন্তঃপুরে’, শিক্ষার্থীর অন্তরে হারীভাবে গেঁথে দেয় সহজ ও অদ্বন্দ্ব সত্যটুকু।

স্বাভাবিক অনর্থের কারণ ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান এবং ঐ-ভ্রম, অজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান হতে মুক্তির লক্ষ প্রয়োজন আত্মস্বরূপের উপলব্ধি—আত্মচৈতন্যই যে বিশ্বচরাচরের প্রাণ, প্রতিষ্ঠা ও কারণ, এই সত্যজ্ঞানের অমূলভূতি। লোকশিক্ষক ত্রিরাশিক এই গভীর-তথ্যটি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলেছেন : ‘মনেভেই বন্ধ, মনেভেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ ; সংসারেই থাকি বা অসংসারেই থাকি, আমার বন্ধন কি ? আমি ঈশ্বরের সম্মান ; রাজাধিরাজের ছেলে ; আমার আবার বাঁধে কে ? যদি সাপে কামড়ায়, “বিষ নাই” জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায় ! তেমনি “আমি বন্ধ নই, আমি মুক্ত,” এই কথাটি যোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।’

কিন্তু কি প্রক্রিয়াতে অজ্ঞানের কারাগার ভেঙ্গে আলোক প্রবেশ করে, এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে রাসিকতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য চিনতে হবে। তিনি পাতঞ্জল যোগসূত্রের ‘ততঃ কেক্সিকবৎ’ ব্যাখ্যাশ্রমক্ষে বলেছেন : ‘যখন কোন কুবক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না। ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাগরে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, তখু মধ্যে কপাটের দ্বারা ঐ জল কুছ আছে। কুবক সেই কপাট খুলিয়া দেয় এবং জল স্বতঃই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব হইতেই প্রত্যেকের ভিতর রহিয়াছে। পূর্ণতা বহুত্বের অন্তর্নিহিত ভাব, কেবল উহার দ্বার কুছ আছে, প্রবাহিত হইবার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ বাধা সরাইয়া দিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শক্তি সবেগে প্রবাহিত হইবে ; তখন বহুব তাহার নিজস্ব শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে।’ প্রত্যেক মানুষের পিছনে রয়েছে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীৰ্য, অনন্ত পরিজ্ঞতা, অনন্ত সম্মান, অনন্ত আনন্দের তাগার ; কিন্তু মানুষ দুর্বল আধার। তার অণ্টু বেহ ও অশিক্ষিত মন সেই অনন্ত শক্তির বিকাশে বাধা দিচ্ছে। অভ্যাস ও অস্বাসের সাহায্যে মানুষের মন স্বতঃই সংকৃত ও একাগ্র হতে থাকে, ততই সত্ত্বগুণের আধিক্য হতে থাকে, ততই মনের অসীম শক্তি ও চক্ৰ প্রকাশিত হতে থাকে।

‘শিক্ষার উপাধান সংগ্রহের চাইতে উপাধানের সংগ্রহ, গ্রহণ, ধারণ ও ব্যয়ভীকরণের মূল যন্ত্র যে মন তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ সমধিক গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষালভের প্রধান হাতিয়ার মন। মনের স্বভাব হচ্ছে ছোপার স্বরের কাপড়ের মত। সেই কাপড়কে লালে ছোপালে লাল, নীলে ছোপালে নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে। মনের এই স্বভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : ‘মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো তো সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি শুভ-সঙ্গে রাখো, তা হলে ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা—এইসব হবে।’

শিক্ষার্থীর সমস্তা, মন তার বশে নাই। সে খুবির মত ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রঙে মন-কাপড়কে রাতাতে শেখে নি। সংস্কারবশে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তার মনে যে রঙ ধরে সে সেই রঙের মন-চাকরকে গায়ে ছড়িয়ে খুবে বেড়ায়। তার আকাঙ্ক্ষা সে মনের কাঁখে চেপে চলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় মন-ই তার কাঁখে চেপে বসেছে। সে অসহায় ভাবে লক্ষ্য করে, তার মন যেন সরষের পুঁটলি ; পুঁটলি ছিঁড়ে গেলে বা তার বাঁধন খুলে গেলেই সরষেগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলি কুড়ান ভার। তেমনি তার মনও যেন ছড়িয়ে পড়েছে, সেই মনকে কোন বিষয়ে স্থির করা এক কঠিন সমস্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : ‘মনটি পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়তে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি যোল আনা কাপড় চাও, তাহলে কাপড়ওয়ালাকে যোল আনা তো দিতে হবে।’ ছড়ান মনকে শুটান ও লক্ষ্যে স্থির করাই সাধনা—শিক্ষানবিসের প্রথম ও প্রধান সাধনা। উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার উপদেশ দিয়েছেন : ‘অভ্যাস যোগ ! অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে।’ নির্ভর সঙ্গে অভ্যাস করতে হবে। সেই অভ্যাসের সঙ্গে চাই অঙ্গুরাগ। অভ্যাস ও অঙ্গুরাগ এই দ্বিমুখী আক্রমণে মনকে বশে আনতে হবে, বশীভূত মনকে একমুখী করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : ‘কথাটা এই : মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ ! যোগী মনের বশ নয়।’ অভ্যাস ও অঙ্গুরাগের সাহায্যে মনকে একাগ্রে করতে হবে ; সেই একাগ্রে মনের লক্ষণ কি ? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : ‘একাগ্রে হলেই বায়ু স্থির হয়ে যায়, আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্রে হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। বায়ু হয় সে নিজে টের পায় না।’ ‘যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময় যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ছে, সে বাবুশুভ্র হয় ও তার বাবু স্থির হয়ে যায়।’ শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবনাকে আরও শষ্ট করে তুলে ধরেছেন আমরা বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন : ‘আমরা

বলি, মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। বহির্বিজ্ঞানে বাহ্যবিশয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়—আর অভ্যর্থিতভাবে মনের গতিমুখকে আত্মাভিমুখী করিতে হয়। আমরা মনের এই একাগ্রতাকে “যোগ” আখ্যা দিয়া থাকি।...উহার (যোগীরা) বলেন, মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের সমুদয় সত্য—বাহ্য ও আন্তর, উত্তর জগতের সত্যই করায়মলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মন একাগ্রতঃসম্পন্ন হইলে এবং ঘুরাইয়া উহার উপর প্রয়োগ করিলে আমাদের ভিতরের সমস্তই আমাদের প্রভু না হইয়া আমাদের দাস হইবে।’ তিনি রাজযোগ গ্রন্থে আরও বলেছেন : ‘একাগ্রতার অর্থই এই—শক্তিসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সমস্ত সংক্ষিপ্ত করা। আর এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন যে কোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়’। শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন কি ভাবে মনকে মগ্ন-মুক্ত করতে হবে, কি ভাবে সেই মনকে একাগ্র ও শক্তিসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে।

‘শিক্ষার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গভী খুবই সঙ্গর্ভ। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি চৌসের পণ্ডিত জ্যোতি রায়কুমারকে মনের ভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন : ‘এই চালকলা বাঁধা বিজ্ঞা আমি শিখতে চাই না, আমি এমন বিজ্ঞা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়, মাহুত বাস্তবিক রূপার্থ হয়।’ তিনি নিজের জীবনে দেখিয়েছেন সেই বিজ্ঞা যে ‘বিজ্ঞায় বুদ্ধি শুদ্ধ করে’, ‘সেই বিজ্ঞা, যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।’ তিনি বলতেন যে সেই চাতুরীই চাতুরী, যে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া যায়। তারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিও আদ্যন্ত করেছিলেন এই পরমবিজ্ঞা। এই বিজ্ঞা সম্বন্ধেই বৈদিক ঋষি বলেছিলেন, ‘বিজ্ঞয়া বিন্দতেহমৃতম্’, ‘বিজ্ঞয়াহমৃতমমৃতম্’।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুঁথিপাটার উপর জোর। কিন্তু পুঁথিপাটার শক্তি সীমিত। এই সীমিত ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন না হলে শিক্ষার্থীর পুঁথিপাটার মোহজালে আটক পড়ার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, বলেছেন : ‘শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে বিশেষ আছে—চিনিটুকু লজ্জা বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুসুখে শুদ্ধসুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?’ তিনি আবার নিজেই একটি অনবদ্য গল্পাংশ বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর বাণীর মর্মার্থ। তিনি বলেছেন : ‘চিঠিতে খবর এসেছে—‘পাঁচ মের সন্দেশ পাঠাইবা, আর একখানা রেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবা।’ তখন চিঠিখানা আবার কেলে ঘের। আর কি দরকার? এখন

সম্প্রদায় আর কাগজের যোগাড় করলেই হল।' গ্রন্থের শকার্খ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে মর্মান্বের উপর ছোট দ্বিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি চাইতেন, শিক্ষার্থী হবে গ্রন্থবেত্তা, গ্রন্থকীট নয়।

গ্রন্থের শকার্খ তেজ করে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ শুধু পরিভ্রমণাধ্য নয়, সময়ে সময়ে দুঃসাধ্য। তাছাড়া গ্রন্থের শকার্খের চাইতে মর্মান্ব-ই বহিঃলক্ষ্য হয়, সেইক্ষেত্রে গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা আরও সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন : 'অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুদ্ধি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল ; কান্নার বিষয় পড়া, কান্নার বিষয় শোনা আর কান্নাদর্শন অনেক তফাত।' শাস্ত্র অজ্ঞাতজ্ঞাপক হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাঁর অপরোক্ষজ্ঞানসম্প্রদায় অভিজ্ঞতাই ছিল জ্ঞান। যাচাইয়ের চূড়ান্ত তুলানো।

শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবধর্মী। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে পুঁথিপাঠা থেকে বা শুকনুখ থেকে বিজ্ঞার উপাদান সংগ্রহ করা কিছু কঠিন কাজ নয়। আসল সমস্যা অসীম বিজ্ঞার সারসংক্ষেপ, শিক্ষার্থীর জীবনে বিজ্ঞার প্রতিফলন। 'সে কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ পুনঃ-পুনঃ বলতেন : 'দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল গোকো মুখস্থ বেশ বলতে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।' দুধের কথা শুনেলে হবে না, দুধ দেখলে হবে না, এমন কি দুধ কোগাড় করে খেলেও হবে না, সেই দুধ হজম করে শরীরকে হুটপুট করতে হবে। একদম বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করতেন বলেই তাঁর শিক্ষাদান ছিল মর্মস্পর্শী ও আন্তরিক। বাস্তবধর্মী শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আমরা শুনে পাই মধুর বাণীর প্রতিধ্বনি। মধুসংহিতা বলেছে, 'অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা, গ্রন্থিত্যো ধারিণো বরাঃ। ধারিত্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা, জ্ঞানিত্যো ব্যবসারিনঃ।' অজ্ঞানীর চাইতে গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ঠ। শুধুমাত্র অর্থবোধকারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি পঠিত বিষয় ধারণা করেছেন। তাঁর চাইতেও শ্রেষ্ঠ তিনি ধীর জ্ঞান হয়েছে। আর এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি লব্ধ জ্ঞান অল্পসারে কর্মীহুটান করেছেন। শিক্ষার সার্থকতা তখনই যখন শিক্ষার আদর্শ শিক্ষার্থীর জীবনে পরিফুট হয়ে ওঠে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায়োগিক (Pragmatic) শিক্ষাচিন্তার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার উপর বোল-আনা শুকনু। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ এই যে শিক্ষার্থীর মূল মূল হুমকীমূলকভাবে

চলে না। মন ও মুখের বৈত প্রবণতা শিক্ষার্থীর মনে সৃষ্টি করে বিধা ও সংশয়। শ্রীশ্রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত। তিনি শিক্ষার্থীর মনটি গড়ে তোলার সময় লক্ষ্য রাখতেন, যাতে শিক্ষার্থীর মনের তাব ও বাইরের আচরণে মিল থাকে। শিক্ষার্থীর শক্তির, মন ও হাত যেন একই ছন্দে সঞ্চালিত হয়; অর্থাৎ উদ্বেগ—শিক্ষার্থীর জীবনের হ্রস্ব বিকাশ। এটি আয়ত্ত করা কঠিন সাধনা। কিন্তু এটি আয়ত্ত না হলে বুদ্ধি পরিত্যক্ত ও হুম্ব হওয়া সম্ভব ও ‘মানহীন হওয়ার’ শিক্ষার অগ্রসর হওয়া কঠিন। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রামকৃষ্ণ বলেছেন : ‘মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা। নতুবা মুখে বলছে, “তুমি আমার সর্বস্ব” এবং মন বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বলে রয়েছে, একপ লোকের সকল সাধনাই বিফল।’

আত্মবিকাশের পথে একান্ত প্রয়োজন শিক্ষার্থীর স্বকীয় প্রবণতা অহুযারী ক্ষুণ্ণের সুযোগ। শিক্ষকের অসঙ্গত শাসনে শিক্ষার্থীর শক্তির ক্ষুণ্ণ অনেক সময়েই বাধাপ্রাপ্ত হয়, তার বিকাশোন্মুখ সজাবনা সঙ্কচিত হয়। বীজকে জল, মাটি, বায়ু প্রভৃতি তার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জুগিয়ে দিলে বীজ নিজ প্রকৃতির নিয়মাহুযারী যা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে এবং নিজের স্বভাব অহুযারী বাড়তে থাকে; শিক্ষকও তেমনি শিক্ষার যাবতীয় উপাধান সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা ও উদ্যমকে উদ্দীপ্ত করে দিবেন এবং তার বিকাশের পথে বাধাগুলি দূর করে দিয়ে তার অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখবেন মাত্র। তিনি প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীকে তুল করবার স্বাধীনতা পৰ্ব্বন্ত দেবেন, নইলে সে যে সহজগতিতে গড়ে উঠতে পারবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক শ্রীশ্রামকৃষ্ণের আচরণ আদর্শস্থানীয়।

শ্রীশ্রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার মূলমন্ত্র, শিক্ষার্থীর আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধন। আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করছে শিক্ষার্থীর অত্যাধর। শ্রীশ্রামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যই এই ছিল যে তিনি কারুরই বিশ্বাস নষ্ট না করে প্রত্যেকেই কিছু মহৎ তাব জুগিয়ে দিতেন। শিক্ষার্থী যে যেখানে আছে তাকে সেখান হতে অগ্রসর করিয়ে দিতেন। তিনি আবালবৃদ্ধবনিতা, সচ্চরিত্র-অসচ্চরিত্র সকলকেই নিজ নিজ তাবাহুযারী গড়ে উঠবার লক্ষ্য এগিয়ে যাবার আদর্শ বা positive ideas দিতেন। মাহুয নিজেই দীনদীন ভেবে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে, নির্জীব হয়ে পড়ে, কলে তার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি ক্ষুণ্ণিত না হয়ে সঙ্কচিত হয়ে পড়ে। শ্রীশ্রামকৃষ্ণের একপ উদার ও হরহী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করে তাঁর অন্ততম শিক্ষার্থী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন : ‘ঠাকুরকে দেখেছি—স্বামীর আশ্রয় ছেদ মনে

করতুম, তাহেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি কিরিরে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, মক্ষ লোককেও 'ভাল' 'ভাল' বললে সে ভাল হয়ে যায়। তাঁর লক্ষ্যই ছিল মানুষকে এগিয়ে দেওয়া। তিনি বিভিন্ন পটভূমিকার বলতেন অভ্যাসকারী কার্তুরের গল্প। গরীব কার্তুরকে এক ব্রহ্মচারী উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়ো।' তাঁর উপদেশ অঙ্গসরণ করে কার্তুরে এগিয়ে যেতে থাকে; ক্রমে সে আবিষ্কার করে চন্দনের বন, তারপর খুঁজে পায় তাহার খনি; আরও এগিয়ে গিয়ে পায় রূপোর খনি ও শেষ পর্যন্ত রাস্মিকৃত হীরে মাণিক। কার্তুরের দারিত্র্য ঘুচে যায়, তার কুবেরের মত ঐশ্বর্য হয়।

জ্ঞানের পরিধি অনন্তপ্রায়, মানুষের শেখারও শেষ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিক্ষার্থীদের অল্পপ্রাণিত করতেন এগিয়ে যাবার জন্ত। নানানভাবে তাদের প্রবোধিত করতেন জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে জানাতীতকে লাভ করার জন্ত। তিনি যেমন উপদেশ দিতেন তেমনি নিজের জীবনে আচরণ করতেন। তিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের এলাকা অতিক্রম করে বিজ্ঞানীর স্বরে উন্নীত হয়েও নিজে চিরশিক্ষার্থীর আদর্শ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর মূখে প্রায়ই শোনা যেত, 'সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' তাই শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ অল্পময়; শিক্ষাজগতের একজন প্রধান দিশারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : 'গীতার মত—যাকে অনেকে গণে মানে, তার ভিতরে ঈশ্বরের শক্তি আছে।'^১ মহৎ চরিত্র, বিদ্বান পণ্ডিত, বৈরাগ্যবান সাধু, পরহিতকারী সনাতন-সেবক, এই সকলের মধ্যে বিহু ঈশ্বরের বিহুতির বিশেষ প্রকাশ ; সেই কারণেই বোধ করি বিশিষ্ট গুণবান ব্যক্তিব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর আগ্রহ ও অমর্য কোতূহল দেখা যেত।^২

সেই সময় ব্রাহ্ম আন্দোলনে বঙ্গসমাজ বিশেষতঃ নব্যশিক্ষিত যুব-সম্প্রদায় বিশেষভাবে আলোড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মদের উপাসনা দেখবার জন্য ও ব্রাহ্ম ভজনসঙ্গীত শোনবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে (১২৭১ বঙ্গাব্দ) একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর তত্ত্ব মথুরানাথকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সে সময় বেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্যরূপে বেদী অলঙ্কৃত করছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মগণের মূখে শোনা যায়, সে সময়ে এক অপূর্ব ভাবের বিকাশ হয়েছিল। উপাসনাবেদীতে উপবিষ্ট ব্রাহ্ম উপাসকগণের মধ্যে একজন যুবকের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পারেন যে, যুবকের মন খোয় বস্তুতে নিবদ্ধ। পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মভক্তদের বলেছিলেন, 'বহুকাল পূর্বে আমি একদিন বুধবারে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ ঘেঁষিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, নব যুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করিতেছে, দুই পার্শ্বে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে

১ শ্রীরামকৃষ্ণকথাস্মৃতি, ৪১১৫১৩

২ 'The Paramhansa has a passion for great minds. His curiosity to see distinguished men is most ardent. He is ever asking his friends to show him great things, and in this he is at times most importunate.'

[The New Dispensation, 3rd Sept. 1882]

তাকারে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা ভেঙেতে মজে গেছে, তাঁর কাতনা ভুবেছে, সেদিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল। আর যে সকল লোক উপাসনা করিতে বলেছিল, দেখলাম যেন তারা চাল ভলগার বর্ণা লইয়া বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপূসকল ভিতরে কিলবিল করছে।^৩ তখন কেশবচন্দ্রের বয়স ছাব্বিশ বছর।

আদর্শগত বিরোধের ক্ষত কেশবচন্দ্র আমি ব্রাহ্মসমাজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে যান,^৪ তাঁর সৌম্যমূর্তি ও ভগবৎ-বিশ্বাস-প্রদীপ্ত উজ্জল চক্ষু, এবং বিতর্ক ইংরাজীতে প্রাণম্পর্শী বক্তৃতা ইংলণ্ডবাসীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং কেশবচন্দ্রকে আপ্যায়ন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের অপ্রতিক্ষী নেতা কেশবচন্দ্রের খ্যাতি দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।^৫

সে সময়ে কলিকাতার কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। সেই কালে ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁর মত মেধাবী, প্রতিভাবান, প্রতিষ্ঠাশালী, নামজাদা ব্যক্তি

৩ ‘ধর্মতত্ত্ব’ ১লা আখিন ১৮০৮ শকাব্দ, তাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত ‘শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী’

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাবৃত্তের কয়েকটি স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে তাঁর অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : “জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, কেশব সেন বেদীতে বসে ধ্যান করছে, তখন ছোকরা বয়স। আমি সেজোবাবুকে বললাম, যতগুলি ধ্যান করছে, এই ছোকরার কতা (কাতনা), ভুবেছে,—বড়শীর কাছে মাছ এলে ঘুরছে।” কথামুত, ৩।১৪।৩

Shibnath Sastri : History of the Brahmo Samaj : p. 193—
কেশবচন্দ্র ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) আচার্যপদে বৃত্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ‘ব্রাহ্মানন্দ’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

৪ কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড রাজ্য করেন ১৮৭০ খ্রীঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী। ইংলণ্ড থেকে ভারতের পথে যাত্রা করেন ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

৫ কলিকাতার একটি পত্রিকা লিখেছিল : “When Keshab speaks, the world listens”. আবার কেশবের বক্তৃতা উল্লেখ করে পণ্ডিতবর ম্যাকমুলার লিখেন : ‘India has lost her greatest son, Keshabchandra Sen.’ Life and Letters of F. Maxmüller, Vol II. Quoted in ‘Lectures in India by Keshabchandra Sen’, Introduction, p. III

খুব কমই ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তের বাসনা হয় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
 'যোগাক্ষত ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইচ্ছিত দেখিয়াছিলেন।' ৬ 'এই লোক
 (কেশব) দ্বারা আমার কাজ হইবে ইহা তিনি আমার মুখেও শুনিয়াছিলেন।' ৭
 কেশবচন্দ্রকে দেখতে যাবার পূর্বে এক দিব্যদর্শনের মধ্যেও তিনি শ্রীকৃষ্ণমাতার
 নির্দেশ পান। তিনি নিজমুখে বলেছিলেন : 'কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার
 আগে, তাকে দেখলাম। সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল।
 একঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে যেন একটি মন্থর
 তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে। পাখা অর্ধাং দলবল। কেশবের মাথায়
 দেখলাম লালমণি। ওটি রক্তোক্তের চিহ্ন। কেশব শিশুদের বলছে—“ইনি
 কি বলছেন, তোমরা সব শোনো।” তাকে বললাম, মা, এদের ইংরেজী মত,—
 এদের বলা কেন। তারপর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এরকম হবে। তখন
 এখান থেকে হরিনাম আর আমার নাম গুণা নিয়ে গেল।’ ৮

৬ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তলীলাপ্রসঙ্গ, সাধক ভাব, পরিশিষ্ট, পৃ: ৩২৮ (তৃতীয় সংস্করণ)

৭ চিরঞ্জীব শর্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত ‘কেশবচরিত’ (তৃতীয়
 সংস্করণ), পৃ: ২৪৩

৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তকথাসুত, ৪।২৪।৩

চিরঞ্জীব শর্মা, ঐ, পৃ: ২৪৭। ‘ব্রাহ্মদামো এক্ষণে যে ভক্তিলীলাবিলাস ও
 মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার এক প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ।
 তিনি শিশু বাগকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহিতেন, এবং
 হরিলীলার তরঙ্গে তাগিয়া যেমন নৃত্য করিতেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল
 তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।’

ধর্মভক্ত, ১লা আশ্বিন, ১৮৭৮ শক। ‘পরমহংসদেবের জীবন হইতেই ঈশ্বরের
 মাতৃভাব ব্রাহ্মদামো সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর দ্বারা ঈশ্বরকে স্নেহমুগ্ধ বা নামে
 সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আবদার করা এই অবস্থাটি
 পরমহংস হইতেই আচার্যদেব বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক তর্ক ও
 জ্ঞানের বর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের দ্বারা পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে সরল করিয়া
 তোলে।’

বেদব্যাচ, দ্বাঃ, ১২৩৪ : ‘.....শ্রীকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও
 ভক্তীগঙ্গাগর্ভে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। পরমহংসদেবের
 আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর দ্বারা কৃষ্ণভক্ত উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে
 “নববিধান” প্রসব হয়।’

তিনি নিজে বাঙালি পূর্বে তত্ত্ব নারায়ণ শাস্ত্রীকে কেশবচন্দ্রের নিকট সমগ্রত্ব পাঠান। নারায়ণ শাস্ত্রী দেখে এসে তাঁর অভিমত নিবেদন করেন। শ্রীস্বামীকৃষ্ণ নিজস্ব দেখেছেন, ‘কেশবসেনকে দেখবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে বললুম, ‘তুমি একবার বাঙ, দেখে এস কেমন লোক।’ সে দেখে এসে বললে, লোকটা অপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ জানতো—বললে, ‘কেশবসেনের ভাগ্য ভাল। আমি লক্ষ্যেতে কথা কইলাম, সে ভাবার (বাঙালি) কথা কইল।’”

১২৮১ বঙ্গাব্দের কাছন্ন বা চৈত্রমাসে একদিন শ্রীস্বামীকৃষ্ণ তাঁর ভাগিনের স্বরায়কে সঙ্গে নিয়ে কেশবচন্দ্র সেনের কলুটোলার বাসভবনে উপস্থিত হন। সেদিন ১৪ই মার্চ, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। ১০ সেখানে জানতে পারলেন যে, কেশবচন্দ্র অল্পপস্থিত। তিনি সহধর্মী বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেলঘরিয়ার এক ভপোবনে সাধনভজন করছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের অদূরবর্তী বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটী। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত “ভারত আশ্রম” সে সময় ঐ উদ্যানবাটীতে অবস্থিত ছিল। “ভারত আশ্রম একটি স্ববৃহৎ সাধু-অচ্ছান।...বেলঘরিয়ার উদ্যানে ইহার কার্য প্রথম আরম্ভ হয়। একান্তরূপ পরিবারের জার পানভোজনের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। যথানির্দিষ্ট সময়ে একত্রে সকলে উপাসনা করিতেন। নিরম অল্পসারে লম্বার কার্য নির্বাহিত হইত।”^{১১}

২ শ্রীস্বামীকৃষ্ণকথায়, ৪।১৫।৩, কেশবচন্দ্র সেনও শ্রীস্বামীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করার অস্ত্র ‘প্রসন্ন’ ও অপন্ন দুই ব্রাহ্মতত্ত্বকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠান। তাতদিন শ্রীস্বামীকৃষ্ণকে দেখে তারা কেশবচন্দ্রকে লবাহ হেন। এই ঘটনা অবস্ত প্রথম সাক্ষাতের পরে।

১০ উপাখ্যায় পৌরগোবিন্দ রায় বিরচিত “আচার্য কেশবচন্দ্র”—পৃষ্ঠা ১০৪১ হতে গৃহীত। সেবক রায়চন্দ্র প্রণীত ‘শ্রীস্বামীকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত’ পৃ: ৬০, উল্লিখিত সময় ইংরাজী ১৮৭২ খ্র: অথবা ১লা আশ্বিন, ১৮০৮ শকে প্রকাশিত। ‘দ্ব্যতবে’ উল্লিখিত ১৮৭২ সাল প্রাপ্যযোগ্য নয়।

১১ চিরঞ্জীব শর্মা (জৈলোক্যনাথ সান্যাল) রচিত “কেশবচরিত”।

যোগেন্দ্রনাথ ঙ্গ: মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ (পৃ: ১৬৫): “ভারতপ্রথম কলিকাতার জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়া উদ্যানে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় (১২৭৭ সন, কাছন্ন মাসে)...পরে সেখান হইতে আশ্রম কাছন্নগাছি উদ্যানে উঠিয়া যায়।”

P. C. Mazoomdar: The Life and Teachings of Keshab-

পরদিন অর্থাৎ ১৫ই মার্চ ১৯৭২ সন্ধ্যায় একথানা ছায়াছবি গাড়ীতে ১৩ শ্রীমাদ্ভক্ত ভাগিনের সহস্রসংখ্যক সঙ্গ নিয়ে কেশবদর্শনে যাত্রা করেন। গাড়ীতে উঠবার পূর্বে শ্রীমাদ্ভক্ত ভাবাবিষ্ট হয়ে অগম্যতাকে বলেন, ‘হা, হাবি? কেশবকে দেখতে হাবি?’ এরূপ ব্যঙ্গবাক্যে অভিহিত হয়ে পরে নিজের উত্তর দেন, ‘হাবি’। গাড়ীতে বসেও ভাবাবেগে অগম্যতার সঙ্গে কতই কথাবার্তা বলতে থাকেন। বেলঘরিয়ার উদ্ভানবাগীতে উপস্থিত হন সন্ধ্যা আটটা কি নয়টার ১৪ সময়।

chandra Sen, pp. 254-56 “...Keshab established in February 1972 the institution known as Bharat Ashram. It was a kind of religious boarding house....He meant it to be a modern apostolic organisation, where the inmates should have a community of all things, and where every worldly relation should be merged in spiritual fellowship. Carefully framed rules and enlightened disciplines were laid down for the daily guidance of the men and women.....The common meals, common studies, common devotions, common work—the whole system of Bharat Ashram life was intended to make the brethren and sisters entirely one in mind and spirit.” একটি পত্রিকার ভারতভ্রমণের বিবরণে কুংসা-রটনা শুরু হয়। প্রতিবাদে মাঝে মাঝে কলঙ্ক করা হয়। Bharat Ashram Libel Suit কলিকাতা হাইকোর্টে শেষ হয় ৩০শে এপ্রিল, ১৮৭৫ খৃঃ। কেশবচন্দ্র এই বাগানবাড়ীতে তখন পর্যন্ত ছিলেন।

১২ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বিবরণিত “কেশবচরিত” পৃঃ ১০৪১। এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যের বিবরণ প্রথম প্রকাশ করে ১৮৭৫ খৃঃ ২৮শে মার্চ, তারিখের The Indian Mirror পত্রিকা: “A Hindu Saint—We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful,.....”

১৩ গুরুদাস বর্মণ : শ্রীশ্রীমাদ্ভক্তচরিত (১৪৮-৪৯)

১৪ শ্রীলালপ্রসাদ (লালক ভাব), পৃঃ ৩২৮, দ্বিতীয় সারসংক্ষেপ, লিখেছেন,

উত্তানবাটীর কটকে গাড়ী উপস্থিত হলে জ্বররাম উত্তানের ভিতরে প্রবেশ করে কেশবচন্দ্রকে সংবাদ দেন যে, তাঁর বাতুল হরিকথা শুনে বড় ভালবাসেন, হরিনাম শুনে আত্মহারা হয়ে পড়েন। তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনেতে এসেছেন। কোতুহলাক্রান্ত কেশবচন্দ্র বাতুলকে নিয়ে আগার দল জ্বররামকে অস্বরোধ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও জ্বররাম উত্তানের কটক ঘিরে প্রবেশ করে প্রথমে উত্তানের মধ্যে বড় পুত্রবিশীর্ষ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘাটে নেমে হাত পা ধুয়ে নেন। সে সময় প্রান্তঃকালীন উপাসনা-শেষে কেশবচন্দ্র বহুগুণ সহ পুত্রবিশীর্ষ পূর্বদিকের বড় বাধান ঘাটে বসেছিলেন। তাঁরা স্নানের উত্তোগ করছিলেন। তাঁরা দেখতে পান প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের ক্ষীণকায় এক ব্যক্তিকে নিয়ে দেখতে মোটামোটা জ্বররাম তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন। “তাঁহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ভায় বোধ হইল।”^{১৫} তাঁহার পরনে একটি সাধারণ লালপেড়ে ধুতি। গায়ে কোন জামা ছিল না, ধুতির ঝুটখানি বাস

“জ্বররামের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা কাম্পেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাক্ত আল্লাজ দুই ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন।” জ্বররামের পুত্র ধবে গুরুদাস বর্মন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিতে (পৃঃ ১০৮) লেখেন, “শ্রীরামকৃষ্ণ বিকাল তিনটার সময় বেলঘরিয়ার ঘান।” অক্ষর সেনের মত : “স্নানের সময় বেলা প্রহরেক প্রায়। জ্বররামে প্রভুবেব গেলা বাগিচার।” পৃঃ ২২৫

বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কেশববিরোধী ছিলেন এবং ইংরাজী-লিখিত বিশ্বনাথ কেশবচন্দ্রের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের বাওয়া পছন্দ করতেন না। সে ক্ষেত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে কেশবের কাছে গিয়েছিলেন মনে করা সম্ভব হবে কি? অপরদিকে ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ‘ধর্মতত্ত্ব’ পত্রিকার রিপোর্টার তাই গিরিশচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র বসুসহায়, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, কামাখ্যানাথ বক্ষ্যোপাধ্যায় (ইনি নিজে উপস্থিত ছিলেন না) লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকড়া করা ছ্যাকড়া গাড়ীতে গিয়েছিলেন। তাছাড়া জ্বররাম কথিত বিবরণ ছাড়া অপর সকলের বিবরণীতে জানা যায় তাঁরা সকাল ৮:৩০টার সময় বেলঘরিয়ার পৌঁছান। সমস্ত ঘটনা আলোচনা করলে এই সময়-নির্ণেয় সুত্প্রসঙ্গত মনে হয়।

১৫ উপাধ্যায় গোবিন্দ রায় : “আচার্য কেশবচন্দ্র”, ধর্মতত্ত্ব, ১৪ই মে,

কীৰ্ণের উপর জুগানো। খুব লজ্জবন্ত পায় কোন জুতা ছিল না। খতাবতই
ব্রাহ্ম প্রচারকগণের অধিকাংশ শ্রীরাধককে মধ্যে বিশেষত্ব কিছু দেখতে পাননি।
তারা মনে করেন ইনি একজন সামান্ত ব্যক্তি।^{১০} শ্রীরাধক কেশবচন্দ্র ও
উপস্থিত ব্রাহ্মতন্ত্রের বিনয় নমস্কার করলে, মনে হয় কেশবচন্দ্র বা উপস্থিত
অপর কেহ শ্রীরাধককে প্রতিদানকারী করেননি। অভ্যাগতদের বসবার
অন্ত আসন দেওয়া হল।

শ্রীরাধক প্রথমেই বললেন, “বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরদর্শন করে থাক,
সে দর্শন কিরূপ আমি জানতে চাই।” এইভাবে সংপ্রসঙ্গ আরম্ভ হল।
এই সংপ্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ হল কেশবচন্দ্রের জীবনে নতুন এক

১৮৭৫ লেখেন, “(পরমহংসদেব) এখন এই বলিয়া খেদ করেন যে, ইচ্ছা হয়
সর্বদা বিতুষণ কীর্তন করিয়া আনন্দে নাচিয়া বেড়াই, কিন্তু শরীর রোগ হওয়াতে
তাহার বড় ব্যাধার ঘটিয়াছে।”

‘দর্শনতত্ত্ব’, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬, ঐ সাক্ষাতের বিবরণীতে লেখে,
(পরমহংসদেবের) “দেহ জীর্ণ ও দুর্বল।”

১০ P. C. Mozoomdar : The Life and Teachings of
Keshabchandra Sen : page 357 “His appearance was so
unpretending and simple, and he spoke so little at his
introduction, that we did not take much notice of him at
first.” শ্রীরাধক-পুথিকার অক্ষয়কুমার সেনের হাতে শ্রীরাধককে দর্শনমাত্র
কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। “কি ছবি ধরিয়া একে অগ্রে দেখ মন। কেশবের
সন্নিকটে প্রভুর গমন। বাসনা-বর্জিত যেন হৃদয়ের খলি। একমাত্র হরিকথা-
অবগ-কাকালী। ব্যাকুলতা একাগ্রতা হীনতা সহতি। হরিকথা মন প্রাণ তাঁর
স্থিতি গতি। ভক্তি স্রীতি এক রতি মূর্তির গঠন। দেখিয়া শ্রীকেশবের না সরে
বচন।” (পৃঃ ২২৬)

১১ মহেন্দ্রনাথ বসু : শ্রীরাধক-অধ্যয়ন গ্রন্থে জানা যায় সেই সময়কার
কলিকাতার সমাজে নমস্কারাদি করার বিশেষ চলন ছিল না। তাছাড়াও
শ্রীরাধকদেবের উক্তি থেকে জানতে পারি, “কলুটোলার বাড়ীতে দেখা হ’ল,
জুয়ে সঙ্গে ছিল, কেশব সেন যে করে ছিল সেই করে আমাদের বসালে।.....তা
আমাদের নমস্কার টমস্কার করা নাই।.....তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম তখন-
তারা কবে জুড়িট হয়ে প্রণাম করতে লিখলে।”—শ্রীশ্রীরাধককথাযুত, ৫।১৫।৮।

অধ্যায়, ১৮ ব্রাহ্মধর্ম আলোচনায় এক বৈশ্ববিক পরিবর্তন এবং হাইকু-
তাবালোকনের প্রথম প্রকাশভাবে প্রচার। ১৮ক, খ

১৮ P. C. Mozoomdar : ibid : pp.357-59 :

"Sometime in the year 1876 in a suburban garden at Belgharia, a singular incident took place. There came one morning in a rickety ticca gari, a disorderly-looking youngman, insufficiently clad, and with manners less than insufficient. He was introduced as Ramkrishna, the Paramhansa (great devotee) of Dakshineswar.....But soon he began to discourse in a sort of half delirious state becoming now and then quite unconscious. What he said, however, was so profound and beautiful that we soon perceived he was no ordinary man. A good many of our readers have seen and heard him. The acquaintance of this devotee which soon matured into intimate friendship, had a powerful effect upon Keshub's catholic mind. The very first thing observable in the Paramhansa was the intense tenderness with which he cherished the conception of God as Mother.....The purity of his thoughts and relations towards women was most unique and instructive. It was the opposite of the European idea. It was an attitude essentially, traditionally, gloriously national."

১৮ক কেশবচন্দ্রের ভাবজগতে যে বিশাল পরিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে তার প্রমাণস্বরূপ বাম্বী কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

Keshubchandra Sen's speech on "Hindu Theism" at the Union Chapel, Islington, Eng. on June 7, 1870. ".....and if He (God) is really merciful and anxious for the salvation of men, then certainly He must interpose to remove all the errors of idolatry and caste, and give the Hindu nation a better form of religious and national life.....We desire that

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা চলতে থাকে ।

কিছু সময় পরে শ্রীস্বামীজী আলোচ্য বিষয়োপযোগী একটি স্বাক্ষরসাহী গান
ধরলেন, “কে জানে যন কালী কেমন, বড় দর্শনে মিলে না দরশন” ইত্যাদি ।
অনুভববী মধুকর্ত্তের সঙ্গীত বেলঘরিয়ার তপোবনে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করল ।
লক্ষীতের রঙ্গ সম্পূর্ণ আত্মায়ন করার পূর্বেই ব্রাহ্ম প্রচারকগণ অবাক হয়ে দেখেন

Christian missionaries should help the Theistic missionaries
of India in gathering up the elements and materials which
exist for the development of a better Hindu life.”
[Keshubchandra Sen in England : Navavidhan Publication
Comm.273-74]

শ্রীস্বামীজীর সঙ্গে লাক্ষাতের পরবর্তী বাৎসরিক ভ্রমণে কেশবচন্দ্র বলেন,
“Verily, verily, this Brahmo Samaj is a ridiculous caricature
of the church of God. Such an assertion may startle many
here present, but it is nevertheless true. (pp. 260).....So
there is condemnation within and without. (p. 263).....
Let us look upon Hindu and Christian brethren as our
elders, and humbly sit at their feet to learn those things in
which they excel us. Brethren, check all desire of vain glory.
Cast away proud antagonism and sectarian malice.” (p. 268),
“Lectures in India” by Keshub C. Sen (fourth edn.), Lecture
on “Our Faith and our Experiences” on Jany. 22nd, 1876.
কেশবচন্দ্রের বনোজগতে বৈদ্যবিক পরিবর্তন লক্ষ্যে বিজয়রত্ন গোস্বামীর নিকট
শোনা ঘটনা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে । “আবার যেখানে বলিরা ঈশ্বরচিন্তা
করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ
করিয়াছিলেন । হৃদয়েষ্যে আগমনপূর্বক ‘জয় বিধানের জয়’ বলিরা ঠাকুরকে
প্রণাম করিতে আশাধিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে ।” শ্রীশ্রীস্বামীজী-
প্রসঙ্গ (সাধক ভাব), পৃঃ ৪০৪ । Bipin Chandra Pal : ‘Saint Bijoy
Krishna Goswami’ p. 3. “The meeting of Ramakrishna with
Keshub was an important event in our modern religious and
spiritual history”.

পায়ক বাহুজান হারিয়ে কেলেছেন। স্পন্দহীন দেহ, স্থির দৃষ্টি, প্রফুল্ল আনন, প্রেরণা-বিগলিত বক্তৃত নয়ন—শ্রীরাধকৃষ্ণের চিত্রাঙ্গিতের স্তায় সমাধিস্থ মূর্তি দর্শন করে প্রচারকগণ বিম্বিত হন বটে, কিন্তু এর গভীর তাৎপর্য জয়কর করতে সক্ষম হন না। উপরন্তু অনেকে মনে তাবেন, এই অবস্থা একটা বিখ্যা তান বা মস্তিষ্কের বিকারগ্রস্ত অথবা কোন ধরনের এক তেজিবাদী। সমাধি থেকে ব্যাখ্যিত করার ক্ষমতা আগিনের জয়কর গভীরত্বের ওঁকারধ্বনি করতে থাকেন এবং উপস্থিত সকলকে ওঁকার উচ্চারণ করতে আহ্বান করেন। তাঁরা তাবেন, এ আবার কি তেজি? ব্যাখ্যার কি হয় দেখার ক্ষমতা জয়কর আহ্বান করেন। মিলিতকণ্ঠের ওঁকারধ্বনি ভগ্নোবনের পরিবেশ সাদৃশ্য করে তোলে। “পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রুর উদয়ম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল।”^{১৯} তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠল। এইরূপ অধ্বনিমালায় তিনি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল ছোটখাট দৃষ্টান্তের সাহায্যে সরল ভাষায় বলতে থাকেন; মিষ্ট সহজ সরল কথা উপস্থিত উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মপ্রচারকগণের জয়কর স্পর্শ করে। তাঁরা মুগ্ধ বিষয়ে শ্রীরাধকৃষ্ণের মধুর বাণী শুনতে থাকেন। “তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন।”^{২০}

এখন শ্রীরাধকৃষ্ণই প্রবক্তা।^{২১} কেশবচন্দ্র ও উপস্থিত সকলে মনঃসম্মত তাঁহার স্মৃতি কণ্ঠের বাণী শুনতে থাকেন। কিছুটা প্রোমা ভাবায়, প্রাত্যহিক জীবনে দৃষ্ট বিষয়সকল উদাহরণ দিয়ে তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে থাকেন। আলোচ্য বিষয়ের স্বপ্নভাষ্য, তত্ত্ববিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গিমার অভিনবত্ব সকলে বিষ্ময়াবিষ্ট হন।

শ্রীরাধকৃষ্ণ ভাবাবস্থার বলতে থাকেন,^{২২} “ঈশ্বরকে যে তত্ত্ব বেরূপ দেখে

১৮ খ্রিঃ চিরঞ্জীব শর্মাঃ জিঃ, পৃঃ ২৪৬, “রামকৃষ্ণের প্রকৃত মতঃ সাহা কিঙ্ক, কেশব দ্বারা জগতে তাহা প্রথম প্রচারিত হয়।”

১৯ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ দাস রচিত “আচার্য কেশবচন্দ্র”, পৃঃ ১০৪০

২০ ‘ধর্মতত্ত্ব’, ১লা আশ্বিন, ১৩০৮ শক

২১ Sevak Priyanath Mallick : Prabuddha Bharat : 1936.

‘At such meetings Ramakrishna almost monopolized the conversation. Keshubchandra hardly said anything. He only expressed his appreciations by smiles and nods.’

২২ সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ব্যক্তিদের কথা প্রত্যাগতঃ কল্লোদার, ঐন্দ্রোদ্যনাথ

সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গুণগোল্ নাই। তাঁকে কোনরকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা'হলে তিনি সব বুঝিয়ে যেন। একটা গল্প শোন—

“একজন বাচ্ছ সিঁছিল। সে দেখলে যে, গাছের উপর একটা জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আরেকজনকে বললে—দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর করলে, ‘আমি যখন বাচ্ছ সিঁছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হতে বাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ।’ আরেকজন বললে ‘না না—আমি দেখেছি হলদে।’ এইরূপে আরও কেউ বললে, ‘না জরবা, বেগুনী, নীল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলার গিরে দেখে, একজন লোক বলে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, আমি এ গাছতলার থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বলছ, সব সত্য—সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয়। বহুরূপী। আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই। কখনও সন্তপ, কখনও নিগুণ।”

“অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা যেন, নানাভাবে দেখা যেন—তিনিই সাকার, আবার তিনিই নিরাকার। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। যে গাছতলার থাকে সেই জানে বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অস্ত্র লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।”২৩

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্ম প্রচারকগণ একাধরনে শোনে, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা বা তাঁর মহিমা বর্ণনা করা বাহ্যের সাধ্যাতীত, তিনি যদি কৃপা করে ধরা যেন তবেই বাহ্য তাঁকে জানতে পারে। ঈশ্বরাক্তক বলতে থাকেন, “কেউ কেউ বলে ঈশ্বর সাকার, আবার কেউ বলে তিনি নিরাকার। এই বলে আবার ঝগড়া।”

সার্যাল, উপাখ্যার গৌরগোবিন্দ দাস প্রকৃতি ব্রাহ্মপ্রচারকগণের লেখা, সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত ঘটনা এক স্বয়ং ঈশ্বরাক্তকের বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও জগদীশ্বরের নিকট হতে সংগৃহীত বিবরণী হতে সেদিনকার আলোচিত বিবরণগুলি জানা যায়। কাহিনীগুলি বঙ্গদেশের ঈশ্বরাক্তকের স্থাননির্ভর “কথাবৃত্ত” প্রকৃতি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২৩ ঈশ্বরাক্তককথাবৃত্ত, ১৩৩৪ হতে গৃহীত।

“যদি ঈশ্বর সাক্ষ্যে বর্ণন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে বর্ণন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাক্ষ্যে আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন মুখে বলা যায় না।

“বেশ, কতকগুলো কানা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ আনোয়ারটির নাম হাতী। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হ’ল, হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর পা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে ‘হাতী একটা ধানের মত’। সে কানাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে ‘হাতীটা একটা কুলোর মত’। সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম তারা ভেঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।

“এ সব বুদ্ধির নাম মজুরার বুদ্ধি; অর্থাৎ আবার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি ধারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়। আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।”^{২৪}

“একটা ডেও পিঁপুড়ে চিনির পাহাড়ে গেছিল। একটা দানা মুখে করে পালাল, আর সেইটে খেয়েই হেউ চেউ। আর শক্তি কোথা যে থাকে? সেইরকম ভগবানকে যেনে কে শেব করতে পারে? আবার তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে জানবার ঘোড়ি নেই।”^{২৫}

সময় গড়িয়ে চলে। ব্রাহ্ম প্রচারকগণ খ্রীস্টীয়কালের বচনাবৃত্ত পান করতে থাকেন। সকলেরই মনের ভাব, এমন সবল ভাবায় প্রাণস্পর্শী তত্ত্বকথা পূর্বে কেউ কখনও শোনেননি। খ্রীস্টীয়কালের দৃষ্টি কেশবের উপর নিবদ্ধ হ’ল কেন। কেশবচন্দ্রের সাধন-জীবনের দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে থাকেন, “সাধন-তত্ত্বজ্ঞের প্রথম অবস্থায় হাঁকডাক, ক্রমে সব থেমে যায়। ঘিরে লুটী ছাড়লে প্রথমে টপ্-বপ্ করে ওঠে, আল হতে থাকলে আর শব্দ হয় না। তেমনি জান পাকা হলে আর বাহ্য আড়ম্বর থাকে না, অল্প জানেই আড়ম্বর।”^{২৬}

“দুরকমের সাধক আছে,—একরকম সাধকের বানরের ছা-র স্বভাব আর একরকম সাধকের বিড়ালের ছা-র স্বভাব। বানরের ছা নিজে বো শো করে থাকে

২৪ খ্রীস্টীয়াব্দকালকালক, ২৫৫, হাতে লিখিত

২৫ খ্রীস্টীয়াব্দকালকালক : জন্মকাল বর্ষ : পৃ ১৫১

২৬ উপাখ্যায় গৌরমোক্ষিন : এ, পৃ ১০৪০ হাতে লিখিত

আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেঁচা করে ভগবানকে ধরতে চায়।

“বিড়ালের ছা কিস্তি নিজে হাকে ধরতে পারে না। সে শুড়ে কেবল মিউ মিউ করে তাকে। বা বা করে, বা কখনও বিছানার উপর, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে; বা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে হাকে ধরতে পারে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না।—এত জপ করবো, এত ধ্যান করবো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে, তিনি তার কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।” ২৭

সংগ্ৰসকের অক্লান্ত ধারা ব্রাহ্মভক্তদের আন-আহার উপাসনা ভুলিয়ে দেয়, সকলে অপার আনন্দে মগ্ন। তখন কেশবচন্দ্র কি করছিলেন? কি ভাবছিলেন? অল্পমান করা যায়, কেশবের ত্বষিত ক্ষুদ্র অসুভাবারিসিঞ্জে অপার তৃপ্তিতে তখন মগ্ন। তিনি ক্ষুদ্রতার উন্মাদন করে অমিয়ধারা গ্রহণের জন্ত ব্যাকুল; তিনি বিনীত ও কথঞ্চিৎ সন্তুষ্টিত ভাবে বসে থাকেন। ২৮ সংগ্ৰসকের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মপ্রচারকদের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রায় অজ্ঞাত কারণে সকলেই বোধ করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আপন-জন, যেন নিকট আত্মীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের আসরে তাঁর অভ্যর্থনার একটা সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত করেন একটি উপহার সাহায্যে। তিনি বলেন, “গরুর পালে অস্ত্র অস্ত্র এলে শিং দিয়ে শুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু অস্ত্র গরু এলে পর স্বজাতি বলে কত খাতির—তখন গা চাটাচাটি করে।” এই কথাই হালির বোল ওঠে।

সকলের অজ্ঞাতসারে পূর্বদেব তিন চার বর্টার পথ অভিক্রম করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় নেওয়ার জন্ত প্রস্তুত হন, বিদায়গ্রহণের সময় কেশবচন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “এঁরই ল্যাজ খসেছে।” কথার তাৎপৰ্য না বুঝে

২৭ কথাবৃত্ত, ৩.৭।১

২৮ ভাই সিংহচন্দ্র সেন লিখেছেন, “পরম বার্ষিক, বহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরাক্ষর পরমহংসের নিকট শিষ্টের জ্ঞান, কনিষ্ঠের জ্ঞান বিনীতভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন; আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথাসকল গ্রহণ করিতেন, কোন বিন কোনরূপ তর্ক করিতেন না।

নভান্দ্র লোক হেলে ওঠে। তখন কেশবচন্দ্র বাধা দিয়ে বলেন, “তোমরা হেলো না। এর কিছু মানে আছে। এঁকে জিজ্ঞাসা করি।”

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দুহুহাতে বলতে থাকেন, “যতদিন বেড়াটির ল্যাঙ্গ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে তাকার বেড়াতে পারে না; যেই ল্যাঙ্গ খসে, অমনি লাক দিয়ে তাকার পড়ে। তখন জলেও থাকে আবার তাকায়ও থাকে। তেমনি বাহুবের যতদিন অবিকার ল্যাঙ্গ না খসে ততদিন সঙ্গারজলে পড়ে থাকে। অবিকার ল্যাঙ্গ খসলে, জ্ঞান হ’লে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সঙ্গারে থাকতে পারে।”^{২৯} “কেশব, তোমার মন এখন ঐরূপ হয়েছে; তোমার মন সঙ্গারেও থাকতে পারে আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে।”^{৩০} সামান্ত কথার মধ্যে যে গভীর তাৎপর্য তার ব্যাখ্যা শুনে উপস্থিত সকলের বিশ্বাসের সীমা থাকে না। কেশবচন্দ্র লম্বন্ধে তাঁর সূচ অভিযন্তা^{৩১} যেনে ব্রাহ্ম-প্রচারকদের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাঁরা বুঝতে পারেন, পরমহংসদেব শুধু একজন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষমানুষ নন, তিনি একজন অন্তর্বেত্তা।

সংপ্রসঙ্গে তিন-চার ঘণ্টা অতিবাহিত হলে আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় নেন, হৃদয়শেষে কিরে যান। কেশবচন্দ্র ও তাঁর লাকপাড়েরা অনাবাহিতপূর্ব আনন্দরসে লম্পৃত হয়ে প্রাণে প্রাণে অস্তিত্ব করেন হৃদয়শেষের পরমহংস একজন অসাধারণ ব্যক্তি। প্রথম দর্শনেই তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, তাঁর পুত সঙ্গলাভের জন্য লালসিত হন।

“.....শ্রীশ্রীসাহুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কিতাবে গ্রহণ করিতে হয়, কেশবচন্দ্র হেথাইরা গিয়াছেন। অনেক দিন পরমহংসের নিকটে যাওয়ার পূর্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি বিবরে তিনি প্রার্থনা করিয়া প্রসন্ন হইয়া গিয়াছেন।”

তত্ত্ব মনোমোহন, পৃষ্ঠা ৯৮, “.....দেখিলার ঠাকুরের প্রতি কেশববাবুর প্রাণ তত্ত্ব কত গভীর, তাঁহার সেবার্ণ কত নিখুঁত, আরও তাঁহার প্রকার এক অংশও পাই নাই।”

২৯ কথামৃত, ১১৩৭৪

৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাঞ্জলি, সাধকভাব, ৪০০ পৃঃ, হ’তে গৃহীত।

৩১ অধিনীতুমার হস্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেশববাবু কেমন লোক? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, “ওসো, সে দৈবী বাহুব।” (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট)

এভাবে জগদ্ধাতার উপর সর্বদা নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে আবিষ্কার করে, তার স্বল্পে রুদ্ধ তত্ত্বের কোয়ারা উন্মুক্ত করে শুধু কেশবের জীবনে ও তাঁর ধর্মসংস্কার-প্রচেষ্টার বৈশ্ববিক পরিবর্তন সাধন করেন তাই নয় ; দেখা যায় এই প্রথম ৩২ সাংস্কারের ফলশ্রুতি-স্বরূপ গুণগ্রাহী কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা-প্রচারে প্রথম উদ্যোগী ৩৩ হয়েছেন । “এর মধ্যে যে ভাব আছে, যে শক্তি আছে, তাহা এখন প্রচার করার প্রয়োজন নেই—একে বক্তৃতা বা খবরের কাগজ দ্বিগুণে প্রকাশ করতে হবে না,” ৩৪ কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই নিবেদনবাণী অগ্রাহ্য করে তিনি নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের নিকট পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সাহায্য প্রচার করতে থাকেন ।

অপরূপ কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, “দেখ ! পরমহংস মণ্ডায় পাটের ঝাল নহেন, তিনি অমূল্য বস্তু, রাসকণ্ঠে রাখিবার উপযুক্ত ।” (ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ৫৫)

৩২ সত্যচরণ মিত্র : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৭ সালে প্রকাশিত), (পৃঃ ৮১-৮৪) । এই গ্রন্থকারের মত—ব্রাহ্ম অন্নদাচরণ মল্লিকের নিকট সংবাদ পেয়ে কেশবচন্দ্র একদিন অন্নদাচরণের সঙ্গে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেন । পরে মহিমাচরণের সঙ্গে একটি গাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বয়ংবান কমলকুটীরে যান । সেখানেই ‘তোমার লাজ খণেছে’ ইত্যাদি কথোপকথন হয় । এই ঘটনা অপর কোন গ্রন্থকার স্মরণ করেননি ।

৩৩ Bhudhar Chatterjee, Editor of the monthly Veda Vyasa (1888) : “And afterwards it was Keshab Babu that became the chief helper in his (Ramkrishna's) preaching work and gradually extended the sphere of his activity.” (Prabuddha Bharata, Feb, 1936. p. 95)

৩৪ ভক্ত মনোমোহন, পৃষ্ঠা ৩৩

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ

‘খেলিছ এ বিশ্ব ময়ে বিরাট শিল্প আনমনে’—বিরাট শিল্পের চিরন্তন খেলা ছড়িয়ে আছে বিশ্বভুবনের সর্বত্র, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের নানা প্রকাশের মধ্যে ক্ষুধিত তাঁর নব নব অভিব্যক্তি, বহু সাবলীলভাবে ভরসারিত তার বিচিত্র গতিছন্দ। আবার রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-বৈচিত্র্যের মাধুর্যে ও মৃদুতার সাক্ষানো জগৎ-মালাকে যখন বিরাট-শিল্প একটি মানবশিল্পের আকার ধারণ করে আবির্ভূত হন, সেই শিল্পের খেলাধুলা মানবমনে সঞ্চার করে পরম বিষম, তাঁর জীলাবিলাস তত্ত্বজনমানসে উদ্বেগ করে বহু আকাজিকত মাধুর্যরস। দেবশিল্পের ক্রিয়াকলাপ ছায়াভপের স্তার জানা-অজানার লুকোচুরিতে প্রায়ই রহস্তধন, তবুও তাঁর প্রতিটি আচরণ বিচরণ হতে বিচ্ছুরিত হয় আনন্দের কাগ; কারণ আনন্দধন তাঁর স্বরূপ-সত্তা। জগৎ-মালাকে দেবশিল্পের আবির্ভাব পূর্বেও ঘটেছে অনেকবার, ভবিষ্যতেও ঘটবে অনেকবার, সন্দেহ নাই। কিন্তু এবারের আবির্ভাবে দেবশিল্পের চরিত্রে একটিই হয়েছে অভূতপূর্ব একটি বৈশিষ্ট্য,—দেবশিল্প তাঁর খেলানীপনাতে উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর অনিন্দ্য শিল্পকুশলতার একটি সরোয়া রসধন ভাবমূর্তি।

আনন্দোন্মোহে খসিযানি তুতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দঃ প্ররম্ভ্যতিসংবিশন্তি—আনন্দ হতেই উৎসারিত এই সৃষ্টিগহনী, আনন্দরসেই তার অবস্থিতি, আবার সেই আনন্দতেই তার অবলুপ্তি। আনন্দোন্মোহে পূর্ণ জগৎ-মালাকের এক কোণার বাংলায় শ্রামল পল্লীতে দেবশিল্প গদাধর আপন মনে খেলাধুলা করতে করতে শশীকলার রত বিকশিত হয়ে ওঠেন। গদাধরের রূপের লাবণ্য, গুণের সিদ্ধতার আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শী সকলেই প্রীত, মুগ্ধ।

গদাধর আজন্ম তাবুক, ভাববাল্যের ঘাটে-বাটে বেচ্ছার বিচরণে তাঁর বড়ই প্রীতি। তাঁর অন্তরের নহবতে সানাইয়ের পৌর রত অহরনিত হতে থাকে ‘ডুব ডুব রূপাগরে আবার যন।’ গদাধরের বয়স মাত্র ছ’বছর, সে-সময়ে তিনি রূপাগরে ডুব দিয়ে ডুগিয়ে যান, অরুণরতনকে ধরবার জন্ত ছুটে যান। পরবর্তীকালে তিনি স্বল্পে বর্ণনা করেছেন তাঁর শিল্পমনের অভিজ্ঞতা : “..... সেটা লৈষ্ঠ কি আবার বাল হবে; আবার তখন হয় কি নাও বহু বয়স।

একদিন সকালবেলা টেকোর হুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে বাচ্ছি। আকাশে একখানা হুন্সর জলতরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও বাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে কেলেছে; এমন সময় এক ঝাঁক নাড়া ছুঁধের মত বক ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হল!—দেখতে দেখতে অপূর্বভাবে তন্নর হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে, আর হাঁশ রইলো না। হুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল।”

তাবতন্নরতা দেবশক্তিকে গভীর হতে গভীরে টেনে নেয়, রূপ-প্রাণের অবজ্ঞানে আবৃত অরূপের হাতছানি শিশু-প্রাণকে আকুল করে তোলে। তাঁর হৃদয়-সরোবর সন্ধান করে ওঠে প্রেমের হিরোলাল, ভক্তির কমলোল, তার উপর বিমল স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করে চিদাকাশে উদ্ভিত প্রেমচন্দ্র। অন্তররাজ্যে উদ্ভাসিত অরূপের রূপ-ব্যক্তনা তাঁর দেহতটে উপচিয়ে পড়ে। গদাধর বাহুবলী হারান, তাঁর কোমল হৃদয়-আনন দিব্যদ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন তাঁর বয়স মাত্র আট বছর।^১ তিনি আছড়ের বিব-লক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর দর্শনে চলেছিলেন। তাঁর সঙ্গী করেকজন ভক্তিময়ী রমণী। দেবী-শক্তির তাবাবেশ গদাধরকে যেন প্রাণ করে, বালকের গান খেমে যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ আড়ুট হয়ে যায়, চক্ষে ঝরে প্রেমাক্ষারা। হৃদয়প্রাকবেশের অগাধ জলে ডুব দিয়ে বালক বোধে বোধ করেন অরূপের পরমগতা, দর্শন করেন মহাশক্তি জগন্মাতার চিরমুরূপ।^২ বিস্মিত সঙ্গীরা লক্ষ্য করে যে, দেবী বিশালাক্ষীর নাম-উচ্চারণে বালকের সংবিলম্বে তেলে উঠেছে রূপসাগরের জলে। সেই মুহূর্ত হতেই বালক চোখ উন্মোলন করে দেখেন এক অপরূপ মহিমার বিশ্বলগার সমাচ্ছন্ন, অভিনব এক আনন্দ ও সৌন্দর্য সর্বত্রই তরকারিত। তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত হয় বিশ্ব-বৈচিত্র্যের নূতন তাবখন এক রূপ।

গদাইঠাকুরের মন যেন শুকনো দেশলায়ের কাঠি, একটু ঘর্ষণেই দগ্ধ করে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৪৩১।২) ও (৪৩২) তে ঠাকুরের উক্তি অহুসারে। তাঁর বয়স তখন দশ বা এগারো। লীলাপ্রসঙ্গ (২।৫০) অনুযায়ী আট বছর।

২ মাতারমশাই রোরাঁ রোলীকে ২৮।১১।১৯২৮ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন: “শ্রীভক্তদেবও তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি যখন এগারো বছরের তখন তিনি সমাধি অবস্থার ঈশ্বরকে দেখেছেন। সেই সময়ে তিনি আছড়ের পথে তাঁর বা ও অভ্যন্তর বাহ্যিকীয় সঙ্গে কোন দেবদেবিতার বাচ্ছিলেন।”

—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২।৫১)।

অলে ওঠে; সামান্য উদীপনার তাঁর মনপাখী বেহালা ছেড়ে উড়ে যেতে চায় চিদাকাশের অন্তরীণ লোকে। একবার শিবরাত্রিতে নিয়মিত নটের অকস্মাৎ-অভাব পূরণের জন্য বানক গদাধর নটের ভূমিকায় বকসকে আবির্ভূত হন। দর্শকেরা সচরাচর যে অভিনয় দেখে অভ্যস্ত সেই অভিনয় সেদিন অপ্রতীত হয় না। কিন্তু গদাধরের অভিনয় অভিনয়ের মার্ঘ্য ভাবুকদের মন প্রবীড়িত করে, তত্ত্বচিন্তে ভক্তিবাসি লিখন করে। বিশ্রিত দর্শকেরা লক্ষ্য করেন,

শিবভাব প্রভু-অঙ্গে তাই চক্রে করে ॥ জানহারা দর্শকেরা দেখিয়া মূরতি।

শিউ গদাধর অঙ্গে মহেশ-প্রকৃতি ॥ গরগর মহাতাব উঠেছে সপ্তমে।

আপনার স্থানে নাহি নামে কোনক্রমে ॥৩ গদাধর আশৈশব উদার প্রেমিক, তাই অল্পতরুণ নিজে আত্মদান করেই তৃপ্ত হতে পারেন না, অপরকেও সেই আনন্দের অংশভাক্য করতে তিনি ব্যগ্র। তিনি তাঁর জুহু উৎসারিত আনন্দানুভূতি শব্দ রেখা বর্ণ ও বেহের ছন্দে মাধ্যমে সঞ্চারিত করে দেন অপর মাহুকের অন্তরে। সেই কারণেই গদাইঠাকুর সহজাত শিল্পী। আত্মবিক প্রবর্তনার প্রবৃত্তি হয়েছে তাঁর শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা, সাবলীল গতিতে তাঁর ভাবকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করেছে শিল্পের বিচিত্র ঐশ্বর্যে—চিত্রে ভাবের সঙ্গীতে নৃত্যে অভিনয়ে।

অগতে শিল্পীর জীবনেতিহাসে দেখা যায় দীর্ঘকালের কঠোর সাধনার ফলে তাঁদের শিল্প-প্রতিমা মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পী গদাধরের জীবনচক্রে প্রথমেই ফল ধরেছিল, ফুল ফুটেছিল পরে। বালাকালেই তাঁর জীবনচক্রে প্রস্তুতিত ফুল চারিদিকে সৌন্দর্য বিকাশ করেছিল, গন্ধ বিতরণ করেছিল, বসিকজনদের আকৃষ্ট করেছিল। এই কারণে তাঁর শিল্পীজীবনের ইতিবৃত্ত অধিকতর বিস্তার সৃষ্টি করেছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যখন বিরাট-শিল্প মানবশিল্পের বিগ্রহ ধারণ করেন তখন তাঁর আচার-আচরণ আরই দেখা যায় 'বে-আইনী'।^৪

বালকের স্মৃতি কঠে মেন স্থা করে পড়ত। তাঁর গান শুনতে, তাঁর মুখে পাঠ শুনতে পাড়াগড়শব্দের ভিড় লেগে যেত। শুধু গান কেন, বাজা নাটকেও তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ স্পষ্ট-প্রশংসিত। গদাধরের বয়স তখন পাঁচছ'বছর।

৩ (ঐশ্বর্যরত্নক পুঁথি, পৃ: ২৭) ঐশ্বর্যরত্নকলীলাঙ্গনকার লিখেছেন যে গদাধরের ভাব অনেক চোঁতাতেও তাকে নি, তিনি তিনদিন ভাবাবস্থায় ছিলেন। (লীলাঙ্গন, ২১৫৮)

৪ বীরভক্ত গিরিশ ঐশ্বর্যরত্নকে কথায়ই বলেছিলেন: "আপনার সব বে-আইনী!" (কথাবৃত্ত ২১৫৭৩)

পাঠশালার গুরুমশাই একদিন তাঁর অভিনয়-হস্ততার সুখ্যাতি শুনে তাঁর লাহনে
অভিনয় করতে আবেশ করেন। লহানন্দ বালক আবেশ পেয়েই

এত ভনি যাজ্ঞারত করেন গদাই ॥ আপনি করেন গান মুখে বাত বাজে।

ছুই হাতে মেন তাল পদধর নাচে ॥ গীতবাত নৃত্য তাঁর অতি পরিপাটি।

বাক্যে বাখে নং দেওয়া কিছু নাহি জটি ॥৫

কয়েক বছর পরে যেখি শিল্পী গদাধরের নেতৃত্বে বানিক রাজ্যের আয়বাপানে
যাজ্ঞাভিনয়ের বহড়া চলেছে। পুরাতন-স্বতি চরন করে শিল্পী পরবর্তী কালে
বলেছিলেন : “এক এক যাজ্ঞার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ
বলত আমি কালীরদমন যাজ্ঞার ধলে ছিলাম।”৬ তিনি আরও বলেছেন :
“ওদেশে ছেলেবেলায় আমার পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান
শুনত। আমার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেই সব দেখত ও শুনত।
আবার বাড়ীর বউরা আমার অস্ত্র খাবার জিনিষ রেখে দিত।”৭

এ সকলের চাইতেও চমৎকৃত করে ভার্ষ্যে ও চিত্রে বালক-শিল্পীর নৈপুণ্য।
গদাধর তখনও পাঠশালার পড়ুয়া। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেই তাঁর মনের
স্বাভাবিক আকর্ষণ। একদিন পণ্ডিত রামপ্রসাদ গুপ্ত পড়ুয়াদের পাঠ দিয়ে
অস্ত্রত্ব গিয়েছিলেন। পাঠশালার এক কোণে একজন কারিগর প্রতিমা গড়চ্ছিল।
পণ্ডিতমশাই উঠে যেতেই গদাইঠাকুর কারিগরের কাছে যান, প্রতিমা ঠিক হচ্ছে
না বলে কটাক্ষ করেন। বালকের চাপল্য কারিগর প্রথমে উপেক্ষা করে।
শেষকালে গদাইঠাকুরের এক চ্যালেঞ্জ বরফ কারিগরকে উত্তেজিত করে, সে
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। স্থির হয়, দুজনেই একটা করে এঁড়ে গরু তৈরী করবেন,
কারটা ভাল হয় দেখা যাবে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়, পড়ুয়ারা দুই প্রতিযোগীকে
ঘিরে বসে। কিছু সময়ের মধ্যে দুজনে এঁড়ে গরু তৈরী শেষ করেন, আবার
সেই সময়ে পণ্ডিতমশাই এসে উপস্থিত হন। ব্যাপার কি? কারিগর বলে :
“ব্যাপার আর কি? ওই তোমার গদাইয়ের কৌড়ি, আর এটা আমি গড়েছি।”
পণ্ডিতমশাই গদাধরের তৈরী শিল্পকর্মটি পছন্দ করেন এবং শোনা যায় সে বছর
তিনি গদাইয়ের তৈরী এঁড়ে গরুটি পূজা করেছিলেন।৮ আবার দেখা গেছে,
গ্রামের যুগ্মশিল্পী যেখানে দেবদেবীর প্রতিমা গড়ছে, নং দিচ্ছে, চোখ আঁকছে,
বালকশিল্পী গদাধর বন্ধুদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। বালকশিল্পী

৫ পূঁষি, ১৮৬ কথাস্বত, ৫৩২১৭ কথাস্বত ৫৩২১৮ তত্ত্ব-সংগ্রহী,
৭ বর্ষ/১০ম সংখ্যা/পৃ: ২৩৪।

কসু করে বলেন: “এ কি হয়েছে? দেবচন্দ্ৰ কি এ রকম?” কি হুঃশাহস বালকের। তিনি যুৎশিল্পীর হাতের তুলি নিয়ে ছুটি টান দেন। লম্বাই তাক্সব হয়ে যায়; দিব্য মনোহর দেবীমূর্তির চাহনি দর্শকদের প্রাণে শিহরণ আগার। বাহু যুৎশিল্পী গালে হাত দিয়ে ভাবে, গদাইঠাকুর এ বিভা শিখলো কোথায়? ইতিমধ্যে বরশ্রবের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে গদাধর সরে পড়েন। তাঁর অন্ততম জীবনীকার লিখেছেন: “গদাই এখন নয় দশ বৎসরের ছেলে,.....মূর্তিকা লইয়া কখন শিব, শিববাহন যুৎ, ত্রিশূল, শিখা ইত্যাদি, কখন কালী, জয়া, বিজয়া, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি করেন। এই সকল মূর্তির গঠন এত নির্দোষ এবং সৌন্দর্যপূর্ণ হইত যে, অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার এই অকৃত কামতার কথা গ্রামের সর্বত্র রটিল এবং গ্রামে বাহার বাটীতেই পূজার জন্য প্রতিমা প্রস্তুত হইত, তিনি গদাইকে গৃহে আনাইয়া প্রতিমা নির্দোষ হইয়াছে কিনা মত লইতে লাগিলেন। দোষযুক্ত হইলে অনেক সময়ে গদাই বহুদে এই সকল প্রতিমার দোষ সংশোধন করিয়া দিতেন।”^{১৯} অসাধারণ তীক্ষ্ণ তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও স্বল্প তাঁর কল্পনার গভীরতা। তাছাড়াও দেখা যেত মূর্তিভবের রহস্য বিশেষতঃ মূর্তির তালমানের জ্ঞান তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত।^{২০} তিনি জানেন দেবমূর্তির জুগল হবে ‘নিষপজাকৃতিঃ ধন্বজাকৃতির্বা’, শ্রবণ হবে ‘গ্রাহককারবৎ’, নাসা ও নাসাপুট হবে ‘তিলগুপ্তাকৃতির্নাসাপুটম্ নিশাপবীজবৎ’, চিবুক হবে ‘আম্রবীজম্’, কণ্ঠ হবে ‘শম্ভলমাবৃতম্’। যুৎশিল্পের স্তায় তাঁর প্রতিভার বিস্তারক বিকাশ দেখা গিয়েছিল চিত্রশিল্পেও। চিত্রশিল্পের একটি নিদর্শন উল্লেখ করেছেন স্বামী সারদানন্দ। বালক গদাধর একবার পৌরহাটি গ্রামে ছোট বোন সর্বমঙ্গলার কাছে গিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে ঢুকেই দেখেন সর্বমঙ্গলা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সেবা করছেন। মনোহর কল্যাণ-জীবন্ত গৃহস্থ বাড়ীর চিত্রখানি শিল্পীর মনে গভীর রেখাপাত করে। কয়েকদিন পরে গদাধর একটি চিত্রাঙ্কনের মধ্যে তুলে ধরেন স্বন্দর দৃশ্যটি। সর্বমঙ্গলা ও তাঁর স্বামীর নিকট সাদৃশ্য চিত্রের মধ্যে যেখে আত্মীয়-স্বজন বালক শিল্পীর প্রতিভার প্রকাশ করেন।^{২১}

১৯ ভক্তদাস বর্মন : ত্রিপুরামকুচচরিত, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৫-৬

২০ ভক্তনীতিলার, যুৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বলক্ষণসম্পন্ন দেবদেবীর মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।

২১ লীলাপ্রসঙ্গ, ১১১৪২

শিল্পী গদাধরের শিল্প-সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বোধ করি দেবদেবীর মূর্তি গড়া। ‘সেব্যাসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং নৃতম্’, প্রতিমা ও শিল্পীর মধ্যে সেব্য ও সেবকের, অর্চিত ও অর্চকের মধুর সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের প্রলম্বিত ভাবটি ধরে গদাধর ভাবরাজ্যের গভীরে প্রবেশ করতেন। তিনি দেবদেবীর প্রতিমা গড়তে ভালবাসতেন, ততোধিক ভালবাসতেন নিজ হাতে গড়া প্রতিমার পূজা করতে।

মাটির প্রতিমা হাতে গড়ে গদাধর।

হৃদয় হইতে তেহ অধিক হৃদয় ॥

ভাবে রূপে হঠাৎ হৃদয় অবিকল।

দেখিলে না যায় চেনা মাটির নকল ॥

চক্ষুদানে আধিতারা হেন দীপ্তিমান।

মুগ্ধ মূর্তি হয় জীবন্ত সমান ॥

.... ...

গড়েন গদাই হাতে দেবীর প্রতিমা।

সঙ্গিন লয়ে হয় পূজা আরাধনা ॥^{১২}

মাকালীর প্রতিমা গড়ে মনের সাথে পূজা করেন গদাধর। অনন্তহৃদয় হ’ত তাঁর হাতে-গড়া প্রতিমা, আর তাঁর পূজা-আরাধনাও হ’ত অনন্তসাধারণ। তাঁর অম্লরাগ-প্রদীপ্ত আরাধনার প্রতিমায় আবির্ভূত হ’ত চৈতন্যশক্তি, এদিকে তাঁর বালক-হৃদয় একাগ্র হয়ে ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধির রাজ্যে প্রবেশ করত। সময় সময় নানা দিব্যদর্শনের আনন্দছাতি তাঁর হৃৎপদকে প্রস্ফুটিত করত।^{১৩}

শিল্পী ছবি এঁকে, প্রতিমা নির্মাণ করে, মাটি কাঠ পাথরের মধ্যে বিচিত্র বীর্ষ ঐশ্বর্য সৌন্দর্য মাদুর জ্ঞান প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য ও আনন্দের ভাব অভিব্যক্ত করে ভগবানের ভগবতাকে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করতে চান। বালক গদাধরের মধ্যে হৃদয়ভাবে সমাধিত হয়েছে শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য ও ভগবৎ সাধকের সাধনকলার সিদ্ধি। তিনি একাধারে মুরারীর রূপশিল্পী ও চিররীর ভাব—হৃৎসী, সেই কারণে তিনি সাকল্যের সঙ্গে অনীম ও সনীমের মধ্যে, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মধ্যে, চিং ও জড়ের মধ্যে যোগদেহু রচনা করতে

১২ পুঁথি, পৃ: ২৯-৩০

১৩ লীলাগ্রন্থ, ১।১১৪

সমর্থ হয়েছেন। সার্বক হয়েছেন তাঁর শিল্প সাধনা। আর না হবেই বা কেন ?
 “বে শক্তির দেখে রয়ে স্থাটির ঠাকুর। তাঁহারই ঘনমূর্তি গদাই ঠাকুর।”

শিল্পীর অন্তঃকরণের ভাড়া কাঁথার হাড়িতে অক্ষুট বা ক্ষুটনোদ্ধত কত
 বৈচিত্র্যময় বীজ, তাঁর সামান্য করেকটি উপযুক্ত স্থান ও কালে অক্ষুরিত হয়ে
 ওঠে। আর বেগলি অক্ষুরিত হয়ে উঠে তাদের হিসাবই বা রাখে কে ?
 বালকের মত শিল্পী খেলানৌ, খেলানের আবেশে রূপকাল সৃষ্টি করেই তাঁর
 আনন্দ। সেই সকল বর্ণাঢ্য রূপের সৃষ্টির কিছু কিছু তাঁর সৃষ্টির চোরকুঠুরীতে
 গচ্ছিত থাকে। দক্ষিণেবরে একদিন (২৫ মার্চ, ১৮৮৩) স্মৃতিচারণ করে তিনি
 বলেন : “দেখ আমি ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম, কিন্তু শুভকরী
 আঁক খাঁখা লাগতো।” আবার একদিন (১০ই জুন, ১৮৮৩) বলেন : “পাঠশালে
 শুভকরী আঁক খাঁখা লাগত। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম; আর ছোট
 ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।” কানীপুরে তিনি একদিন প্রোতাদের
 উপহার দেন বাল্যের করেক খণ্ড চাকচিক্যময় সৃষ্টি। প্রবীণ শিল্পী তখন
 কঠিন রোগশয্যায় শারিত। দেহের ব্যথা-বয়না যেন পড়ে থাকে শয্যার এক
 কোণে। তিনি ভক্তদের আনন্দ দান করতে ব্যগ্র। সেদিন ২৮শে ডিসেম্বর,
 ১৮৮৫ খ্রীঃ। কবিরাজ রোগীকে হরিভাগ ভ্রম'খেতে দিয়েছিলেন। ঔষধ সেবার
 সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ঔষধ নিয়ে রসিকতা করেন রোগী। তিনি বিবাদগ্রস্ত
 দেবকদের চিত্রার জগাল ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তাঁদের উপহার দেন করেকটি
 অখসৃষ্টি। সেখানে উপস্থিত দেবক লাটু, বুড়ো গোপাল ও মহেন্দ্র মাটার।
 প্রবীণ শিল্পী বলেন : “আগে কম বয়সে দেশে ছোট ছোট ঠাকুর গড়তুম—
 কেউ ঠাকুর, তাঁর হাতে বাঁশী এসব। এরকম নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়তুম।
 আবার পাঁচ আনা ছ'আনা দামে বিক্রি করতুম।” দেবক লাটু মন্তব্য করেন :
 “আজ্ঞে চৈতন্ত মহাপ্রভু বাজার করতেন, খোড় প্রভৃতি কিনতেন।”

শিল্পী : “আবার হবিও আঁকতুম।” “পুতুল গড়তুম, কল শুদ্ধ হাত পা
 নড়ছে এসব। রাসের সময় যিহির। অনেক সময় আমার কাছে ভদ্রী জেনে
 নিতো।” লাটু রংয়ের পিচকারী ধরার ভদ্রী দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন,
 “এ রকম ?” এ কথায় কোন উত্তর না দিয়ে শিল্পী আরও বলেন : “আবার
 ইটের কাজও জানতুম।”^{১৪} ভক্ত দেবকেরা শিল্পীর বাল্যকালের কীর্তিকগণের
 ছোট একটি কীর্তি শুনে অবাক হন।

মৌবনে গদাধর কলকাতার এগে পিতৃদত্ত রামকৃষ্ণ নামটিতে পরিচিত হন। দাদা রামকৃষ্ণ তাঁকে 'চালকলা-বাঁধা বিভা'র উদ্ভূত করতে চেট। করেন কিছু ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণিকে উপলক্ষ্য করে গড়ে উঠেছিল ভগ্নাভা ভবভারিণীর সাধনপীঠ। রামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কয়েকদিনের মধ্যেই নৃতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যুবক-শিল্পী শিল্প-সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। সাধক-শিল্পী অন্তররাজ্যে আবিষ্কার করেন আধ্যাত্মিক ভাববৈশিষ্ট্যের নব নব মূর্তি, সেই সঙ্গে প্রায়ই বহির্জগৎ রূপদান করেন তাঁর ভাবগুণগুলিকে—ভাস্কর্যে চিত্রে সঙ্গীতে ভরসারিত হয়ে ওঠে সেই ভাবের রসমাধুর্য। যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাক্ষর হয়ে ওঠে একাধারে অধ্যাত্মসাধনার তপোবন ও পার্শ্ব-শিল্প সাধনার পাদপীঠ। সাধনায় অগ্রসর হয়ে তিনি আবিষ্কার করেন সর্বাত্মক অর্থও চৈতন্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বসংসার।

শিল্পের প্রাণ রস। সেই রস স্বরূপ এবং তা শিল্পীর একান্ত নিজস্ব। শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিল্প সাধনার রস সংগ্রহ করেছিলেন সর্বসময় অর্থও চৈতন্য হতে। এভাবে বিশ্বস্তার শিল্পপীঠে এক হাত রেখে, 'বুড়ী ছুঁয়ে' তিনি শিল্প-সৃষ্টির আনন্দবিলাসে মেতে উঠেছিলেন, সেই কারণেই নবীন-প্রবীণ রসিক-অরসিক সকল মাতৃস্ব তাঁর শিল্পকলার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত।

শিল্পী বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুয়েরই ভাব চরন করেন, লাভ্য চরন করেন, রূপ প্রমাণ সাদৃশ্য বর্ণিকাত্তর চরন করেন। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বিচিত্রভাষা প্রশোভিত বহির্জগৎ ও আনন্দবেদনা অঙ্গরূপে বিশ্বাস ভাবভক্তির সহরীতে ভরপুর হৃদয়সরোবর—শিল্পী এই দুই রাজ্যে বধেচ্ছ বিচরণ করে পুষ্ণচরন করেন, ভাবগুণ দিয়ে মনোহর মালা গাঁথেন এবং প্রাণের দেবতার গলায় সেই মনোবিমোহন মালা পরিয়ে তৃপ্তিলাভ করেন। সাধনার হৃদয় পথ অতিক্রম করে সিদ্ধ সাধক উপলব্ধি করেন যে তাঁর প্রাণের দেবতা প্রকৃতপক্ষে সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাং সর্বব্যাপী এক বিরাট অর্থও পুরুষ। সেই পুরুষই অনন্তরূপে বিচিত্রভাবে অভিযুক্ত। তাঁকে নামরূপের বন্ধনে বিবৃত করেই বিভিন্ন দেবদেবীর সৃষ্টি।

একদিন যুবক শিল্পীর বাসনা হয় তিনি নিজহাতে শিবঠাকুর গড়ে পূজা করবেন। গদাগত হতে মাটি সংগ্রহ করে বাঁড়, ডমক ও জিন্দুলসমেত একটি মনোমুগ্ধকর শিব মূর্তি তৈরী করেন এবং পূজা করতে বসে অল্প সময়ের মধ্যেই

সতীর ভাবে নিমগ্ন হন। ঘটনাক্রমে রাণী রাসমণির জামাই ও দক্ষিণহস্ত মথুরানাথ সেখানে উপস্থিত হন। তিনি মুকুটটিতে দেখেন দিব্য তাম্রোজ্জ্বল মহেশ-মূর্তি। সম্মুখে দেখেন দিব্যভাবে উজ্জ্বল ধ্যানস্থ এক স্তম্ভনম্বক। প্রতিমার ছন্দ বা ইচ্ছা মথুরানাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। শিল্পকলার মর্মহানে ছন্দ এবং এই ছন্দ আনন্দের তরঙ্গমালার মত বিশ্ব-স্থিতিতে পরিব্যাপ্ত। এই ছন্দ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল নম্বক শিল্পীর গড়া প্রতিমাত্তে। তত্ত্বিমতী রাণী রাসমণির অন্তরে ঝিলিক দেয়, এই দৈবনিষ্ঠ শিল্পীর সেবাতে সাধনাতে পাবাণী ভবতারিণী সম্ভবতঃ তাঁর চৈতন্তরূপ উদ্ঘাটন করবেন এবং দেবীর আগ্রহে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ভগ্নবদারাদনা সার্থক হবে। মথুরানাথ শিল্পীকে অনেক দূরিয়ে স্থিতিয়ে ভবতারিণীর মন্দিরে বেশকারীর পদে নিমুক্ত করেন।

স্বপ্ন রচেন বেশ প্রভু ভগধর। দেখা মাত্র দর্শকের বিমোহ অন্তর ॥

নিভাই নূতন বেশ নাহিক উপমা। মূর্তিময়ী ঠিক যেন চিত্রময়ী ভ্রামা ॥

... ..

ঘোষণা হইল বার্তা কথায় কথায়। আছে বহু কালী-মূর্তি এমন কোথায় ॥১৫

শিল্পীর মন-মধুর চাকে দানা বেঁধে উঠেছিল অহরাস, প্রীতি ও বিশ্বাস—
এদের সমন্বয়ে পাবাণী প্রতিমার চৈতন্তসত্তা যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

আমাদের শিল্পী নূতন প্রতিমা গড়তে, তাঁকে সাজাতে যেমন নিপুণ, তেমনি দক্ষ প্রতিমার সংস্কার ও সংযোজনে। পূজারীর হাত হতে রাখাগোবিন্দ বিগ্রহ হাটিতে পড়ে যায়, বিগ্রহের একটি পা ভেঙ্গে যায়। শাস্ত্রবিদগণ নাকে নস্ত্রি দিয়ে বিধান দেন অকলীন বিগ্রহে পূজা নিবিদ্ধ, নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্তব্য। নূতন মূর্তি তৈরীর আদেশ হয়। এদিকে ঐরামকৃষ্ণের সহজ সরল ভাব, অলৌকিক মৌলিক তাঁর প্রতিভা। তিনি বলেন, রাণীর কোন জামাইয়ের পা ভাঙলে কি তিনি সেই জামাইকে ফেলে দিবেন? না তাঁর স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন? শিল্পীর সহজ কথা প্রোক্তার প্রাণে বেঁধে রাণী করকোড়ে নম্বক শিল্পীকে বলেন: “ভবে বাবা, তুমি অহরহ করে বিগ্রহের চিকিৎসা করবে কি?” শিল্পী সন্মত হন। নিপুণহস্তে বিগ্রহের ভাঙা পা ঝুড়ে যেন। ইতিমধ্যে ভাঙার নূতন একটি প্রতিমা নিয়ে হাজির। ঐরামকৃষ্ণকে অহরোধ করা হয়, নূতন মূর্তি পূর্বকার মত হয়েছে কিনা দেখবার জন্য। ঐরামকৃষ্ণ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করেন, তাঁর মধ্যে

ঐরাধিকার ভাবাবেশ হয় এবং তিনি ভাবাবস্থায় বলেন : 'ঠিক হয় নি।' হুতরাং সংকৃত পুরানো মূর্তিটির পূজা হতে থাকে।^{১৬} শোনা যায় জানবাজারের বাড়ীতে মথুরানাথ আয়োজিত দুর্গাপূজার প্রতিমার দেবীর চোখ শিল্পী ঐরামকৃষ্ণ হয় নিজে এঁকে দিতেন, নতুবা তাঁর উপস্থিতিতে মৃৎশিল্পীষ্ট আঁকত। মথুরানাথ ও মৃৎশিল্পী সকলেরই ছিল ঐরামকৃষ্ণের বৈবদ্য শিল্পগটুতা লব্ধে অগাধ বিশ্বাস।^{১৭}

দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে চিত্রশিল্পী ঐরামকৃষ্ণের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর বাসগৃহের উত্তরের বারান্দার দরজার হুপাশে আঁকা ৪' x ৫' মাপের দুটি প্রাচীর-চিত্র।^{১৮} একটি চিত্রে একটি আভাসাছে বলে আছে এক ঝাঁক তোতাপাখী। অপরটিতে চলন্ত একটি জাহাজ খাত্ত নির্মিত পতাকা উড়িয়ে গজার উজানে চলেছে। প্রাচীর-চিত্র দুটিতে এমন কিছু ছিল যার আকর্ষণ দেখামাত্রই দর্শকের মনকে আবিষ্ট করত। চিত্র দুটির মাত্রাবদ্ধ প্রকাশ-ভঙ্গী, প্রতিশীল রেখা, সহজ-স্বাভাবিক আবেদন রসাল্প দর্শকের মনকে আকর্ষণ করত। শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর

১৬ ঐরামকৃষ্ণচরিত, পৃ: ৩০

১৭ দুর্গাপদ মিত্র : ঐরামকৃষ্ণদেব, বঙ্গমতী, আর্ষাট, ১৩৫০ সন

শিল্পাচার্য নন্দলাল লিখেছেন : 'দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময় পোঁটোদেব সব সময় guide করতেন। তিনি প্রতিমার উপর চালচিত্র আঁকার ভারও কখন কখন নিভেন, প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তাঁর ডাক পড়ত, চোখের তাগা ঠিক জায়গায় দেওয়া বড় কঠিন বলে। চোখের ঠিক হেবতাব না হলে সংশোধন করে দিতেন। তিনি একজন সহজশিল্পী ও শিল্পের সমর্থক ছিলেন।' (বরেন নিরোগীকে লেখা চিঠি)

১৮ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি, এই প্রাচীর-চিত্র তাঁরা দেখেন নি। অপরগকে অনেকেই দেখেছেন ঐরামকৃষ্ণ অঙ্কিত অপর একটি প্রাচীর-চিত্র—যার বিষয়বস্তু হচ্ছে উপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র, 'বা হুপাং সযুজা সযারা সমানং বৃক্ষং পরিব্রজাতে। তন্নোরন্তঃ পিঙ্গলং স্বাষভ্যানন্নরন্তো অভিচাক্ষীতি।' একটি পাছে দুটো পাখী (চিত্রে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট)। তাদের একটি পাছের কল তুলির সঙ্গে বাজে, অপরটি হুপচাপ পাছের ডালে বলে আছে। এই চিত্রটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দার উত্তর-পূর্ব-কোণের খামে কাঁচে আবদ্ধ অবস্থায় বর্তমানে দৃশ্যমান।

বহু সাবলীলতা ও বর্ণিত বিষয়ের বহু-নিষ্ঠা দর্শককে মুগ্ধ করত, যেমন তৃপ্তি দিত শিল্পীর নিকম্প, লীলারিত ও হৃৎতাসম্পন্ন রেখা। রেখা-বিশ্লেষকে মূলধন করে সৃষ্ট এই রসোজ্জ্বল চিত্র দুটি আদ্য অবলুপ্ত, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে অবলুপ্তির সম্পূর্ণ সর্বনাশের পূর্বেই শিল্পাচার্য নন্দলাল বহু তাঁদের প্রতিক্রিয়া লংক্ষণ করেছেন।^{১৯}

আমাদের শিল্পীর এইকালের সাধনা নূতন এক ধারার মূলতঃ প্রবাহিত হয়ে গিছিল অমৃতসাগরে পৌঁছেছিল। শিল্পী ভাবধণ্ডা অবলম্বনে ভাবস্বরূপকে, আবার ভাবস্বরূপের গভীরে প্রবেশ করে শুদ্ধ-চৈতন্যকে ধারণা করতে অগ্রসর হন। তিনি পুরাণমতে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, তন্ত্রমতে সিদ্ধিলাভ করেন, বেদমতেও সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি সত্য শিব ও হৃদয়ের রূপসাগরে ডুব দিয়ে অল্পময় অশকম্ অল্পমম্ ভাবাতীত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধকে বোধে বোধ করেন। সেখানেও থামে না তাঁর অগ্রগতি, আবার 'নী' হতে 'লা'তে নেমে এসে রূপসাগরে আনন্দে বিচরণ করেন এবং অল্পভব করেন, জগৎসংসার একই আনন্দরসে জারিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন "আমি দেখি তিনিই সব হয়েছেন—মাল্লব, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না।"^{২০} তাঁর সর্বাসুহ্যত একাত্মার অল্পকৃত্তিতে জড় ও চৈতন্যের ভেদ মূঢ়ে যায়, ভূমি ও ভূমার সীমারেখা মুছে যায়। শিল্পী স্ত্রীরামকৃষ্ণ এখানে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীর চৈতন্যকে চিন্তা করে অথও মন লয় হলেও আনন্দ, আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখে আনন্দ। বিজ্ঞানী শিল্পীর অবস্থা 'রসে ভাসে প্রেমে ভোবে করছে রসে আনাগোনা।' তিনি বালকবৎ রসে বশে থাকেন। সামান্য উদ্দীপনাতেই তাঁর মনপাখী বিচরণ করে চিদাকাশে। সংকীর্ণন করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়েন চিজার্গিভের স্তায়। গলার গোড়ের মালা। দুটি স্থির, চক্রবদন প্রেমাঙ্গুরজিত। সেই দেবদুর্লভ পবিত্র মোহন মূর্তি দর্শন করে নয়নের বেন তৃপ্তি হয় না। ইচ্ছা হয়, আরও দেখি, আরও দেখি। দর্শকের অবস্থা : "ডুবলো নয়ন ফিরে না এস, গৌর রূপসাগরে সীতার কুলে ডলিয়ে গেল আমার মন।" বিজ্ঞানী-শিল্পীও নিজে অমৃতরস আবাদন করে তৃপ্ত হন না। তিনি সর্বজননে অকাতরে বিতরণ করেন সেই হৃদ্য। বিতরণ করেন নানান ভাবে, বিবিধ শিল্পবৈচিত্র্যের মাধ্যমে।

১৯ বরেন্দ্রনাথ নিরোগী : শিল্পী-বিজ্ঞানায় শিল্পীদীপকর নন্দলাল, পৃঃ ৪১

২০ কথাস্বত, ৪।২:১১

শিল্পী ঐরামকৃষ্ণের স্রষ্টাশ্রুতিত স্বপ্নদের আকর্ষণে ছুটে আসে রসলিপী নানান বাহুব। তাঁর স্মৃতি কণ্ঠের বাণী শুনে রসগ্রাহী বলেন যে, তিনি কবি চূড়ামণি। “রসে গাঢ় বশে দৃঢ়—ঐরামকৃষ্ণ কবি। রসে সিস্ত বশে শক্ত—কবি ঐরামকৃষ্ণ।”^{২১} উপমায়িত্র ঐরামকৃষ্ণ উপদেশ করতেন, নিত্য সাংসারিক জীবনের আটপোরে কাহিনী চিত্রখমী গল্পের সাহায্যে ভুলে ধরতেন, তার মর্মবাণী দৃঢ়াক্ষিত হত শ্রোতার মানসগণ্ডে। রসগ্রাহী শিল্পাচার্য নন্দলাল বহু ঐরামকৃষ্ণ কথিত ‘মাথায় কলসী রেখে নৃত্য’, ‘মাছধরা ও পখিক’, ‘কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নর’, ‘ব্যাথের শিকার সন্ধান’, ‘ঢেঁকিতে মন রেখে চিঁড়ে কোটা’ গল্পগুলি স্রষ্টা রেখাবিভাগে চিত্রিত করেছেন।^{২২} সেগুলিই কথাশিল্পী ঐরামকৃষ্ণের কাহিনী-শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি যেমন কথাশিল্পী তেমনি আবার স্রুশিল্পী। তাঁর প্রাণমাতানো গান শুনে কার হৃদয়-ময়ূর না নেচে উঠেছে, কোন পাখির কাণ্ড অশ্রুধারার না ভিজছে? তিনি সঙ্গীত-শিল্পী, আবার সঙ্গীত-সমালোচক। স্রুশ্রুতিস্রুশ্র তাঁর ভাবগ্রহণের ক্ষমতা। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ওস্তাদ গাইয়ে নরেন্দ্রনাথ একদিন কীর্তন সবছে ডাঙ্কিল্য করে বলেছিলেন : “কীর্তনে ভাল সম্ এই সব নাই—তাই অত popular—লোকে ভালবাসে।” প্রতিবাদ করেন ঐরামকৃষ্ণ, তিনি বলেন : “সে কি বললি। করুণ বলে তাই অত লোকে ভালবাসে।”^{২৩} আমাদের স্রুশিল্পী আবার নৃত্যপটু। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা ঐরামকৃষ্ণের উদ্ভাস নৃত্যের রেখাচিত্র এঁকেছেন^{২৪} শিল্পাচার্য নন্দলাল বহু। সেটি দেখলে তাঁর নৃত্য-মাধুর্য সামান্য ধারণা করা যেতে পারে। মহানট গিরিশবাবু আত্মকথায় লিখেছেন, “...তন্মধ্যে পরমহংসদেব ভগবত্বাবে বিভোর হইয়া ‘নমে টলমল করে’ এই গানটি গাহিতেছেন ও তৎসহ নৃত্য করিতেছেন। আমার মনে হইল আমি স্রুবিখ্যাত নটগণের নৃত্য দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এক্ষণ চিত্তবিমোহক নৃত্য ইহজীবনে দেখি নাই।”^{২৫} বিজ্ঞানী ঐরামকৃষ্ণ বাহুবশায় কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা হতেন, অর্ধবাহুবশায়

২১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কবি ঐরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৮

২২ উদ্বোধন : কার্তিক, ১৩৬১ ও আশ্বিন, ১৩৬৩ সংখ্যা দ্বিবি

২৩ কথাস্রুত, ৪:১৭১১

২৪ উদ্বোধন : আশ্বিন, ১৩৬০

২৫ উদ্বোধন : আশ্বিন, ১৩৫৮

‘ভাবোন্নত হয়ে নৃত্য করতেন, অন্তর্ভাবের গভীর সমাধিতে যত্ন হতেন—সর্বাবস্থায় তাঁর চতুর্দিকে বিরাজ করত ‘আনন্দের কুয়াশা’।

নৃত্যগীত ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয়নৈপুণ্য অভিনয়কুশলীদের দ্বারা সমাদৃত। নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ বলেছেন : “যদি ঠাকুরকে আমাদের কোন বিষয়ে খাটো দেখিতাম, গুরু বলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নোঙরাইতে পারিতাম না। অভিনেতা বলিয়া আমার কিছু খ্যাতি আছে। কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে আমাকে যে সকল অভিনয় দেখাইয়াছেন, তাহা হৃদয়ে জীবন্ত ভাবে গাঁথা রহিয়াছে। বিষয়কালের সাধকের চরিত্র তিনি যেরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন, আমি নাটকে তাহার ছায়াযাত্রা তুলিয়াছি।”^{২৬} তাঁর অভিনয়-দক্ষতার কারণ বিশ্লেষণ করে স্বামী সারদানন্দ বসুর্থাই বলেছেন : যে ভাব বখন তাঁহার ভিতরে আসিত তাহা তখন পুরোপুরিই আসিত, তাঁহার ভিতর এতটুকু আর অন্তর্ভাব থাকিত না—এতটুকু ভাবের ঘরে চূরি বা লোক-দেখান ভাব থাকিত না। সে ভাবে তিনি তখন একেবারে অস্থপ্রাণিত, ভয় বা ডাইলুট (dilute) হইয়া যাইতেন। ...ভিতরের প্রবল ভাবতরঙ্গ শরীরের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া শরীরটাকে যেন এককালে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত।”^{২৭} তিনি ভাবে ‘ডাইলুট’ হয়ে যেতেন, সে কারণে তাঁর ভাবের ব্যঞ্জনা দর্শক ও শ্রোতাদের অতি সহজে রসমিস্ত্র করে তুলত। কিন্তু আমাদের বিন্মত হলে চলবে না যে, অতি অল্পত প্রতীতিশালী শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানী, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অসংখ্য উদাহরণের একটি উল্লেখ করা যাক। দক্ষিণেশ্বরের নাট্যমন্দিরে বিভাস্বন্দরের রাজা অলুটিত হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শক হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন সকালে তিনি মন্তব্য করেন : “আমি কেন বিভাস্বন্দর শুনলাম? দেখলাম—ভাল, মান, গান বেশ। তারপর যা দেখিয়ে দিলেন যে, নারায়ণই এই রাজাওয়ারাদের রূপ ধারণ করে রাজা করেছেন।”^{২৮} অপরের আচার-আচরণের অলুক্রণ রাজাই চাককলা নয়। অপরের অলুক্রত ভাবটি শিল্পীর চিত্তরসের জারকে ত্রবীভূত হয়ে দর্শকের চিত্ত বখন রসায়িত করে, তখনই শিল্প-

২৬ শশীকৃষ্ণ ঘোষ : শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৬২

২৭ লীলাগ্রন্থ, ৪১২০০

২৮ কথাবৃত্ত, ৫১৫৭১

হয় রসোত্তীর্ণ। শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্তরসের আরক চিনানন্দ হতে আসিত, সেই কারণেই তাঁর শিল্পসাধনা হত রসের পরাকাষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে বিজ্ঞানী ও শিল্পী। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি বলেন, ‘এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।’ শিল্পীর দৃষ্টিতে তিনি এই ‘মজা’ ত্রিতাপদ্বয় মাহুকের মধ্যে বিলিয়ে দিতে ব্যাকুল হন, দিশেহারা মাহুকে আনন্দলোকের সন্ধান দিতে ব্যাকুল হন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনঘট ছিল আনন্দঘন রসে পরিপূর্ণ, সেই স্বে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বিভিন্ন শিল্পে নৈপুণ্য। সেই কারণে তাঁর বাবতীয় শিল্পচর্চাতে অল্প ভক্তিমায় তরঙ্গারিত হত আনন্দহৃদয়ের লহরী। তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি শিল্পকলা রসমাধুর্যে হত অভুলনীর। কুশলী শিল্পীর দক্ষতা সৰ্ব্বদা আচার্য নন্দলালের প্রত্যাশা অরুণোদয়। “তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) রূপশক্তি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহার ক্ষমতার সব ভাবই রূপে পরিণত হত।”

বিজ্ঞানী শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রোচুদের কোঠায় পরীক্ষণ করলেও দেখা যেত তিনি ভাবে শিশু ভোলানাথ। তিনি স্বভাবতঃই পাঁচ বছরের বালকের মত। কিন্তু যখন তিনি শিল্পসৃষ্টিতে মেতে উঠতেন বা লোকশিক্ষা দিতেন তাঁর মধ্যে একটি হত বোবনের প্রাণচাকলা ও দৃঢ়তা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগানে। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। রোগের প্রচণ্ড আলাবদ্বণা জ্বলে গিয়ে তিনি প্রায়ই শিল্পসৃষ্টিতে মেতে উঠতেন। একদিন দেখা গেল, তিনি রোগশয্যা ছেড়ে ঘরের মেঝেতে কি আঁকজোক করছেন। তাঁর এতই গভীর অভিনিবেশ যে সেবকের অস্বরোধ উপরোধ কিছুই তাঁর কানে ঢোকে না। প্রত্যক্ষদর্শী সেবক শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের আঁকজোকের মর্মোদ্ধার করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর অভিনিবেশ দেখে বিস্মিত হন।^{২১}

শ্রীরামকৃষ্ণের গলার গভীর কত কাঁখে বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর গর্ভ-নির্মিত কঠোর প্রায় তরু, তাঁর স্ঠায় দেহ পমুদন্ত, কিন্তু তাঁর আনন্দবিস্তরণকারী শিল্পী মনটি তখনও অটুট। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, ভাস্কর্য সব কিছু সেনময়ে তাঁর শারীরিক কর্মতার বাইরে, তবুও তাঁর দুর্বল হাতে সৃষ্ট হতে থাকে

২১ “His attention was so fixed, his thought so abstracted that no one dared approach or ask him what he was doing.” (Sister Devmata: Sri Ramakrishna and his disciples, P. 151)

চিহ্নমালা। সেবকেরা আনন্দমূর্তি শিল্পীর কাণ্ড দেখে মুগ্ধ বিম্বিত হন। চিত্রাঙ্কনের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যে কোন সময়ে শিল্পী স্টুডিও-উদ্ভূত মনের ভাবটি প্রকাশের জন্য হাতে কাঠকয়লা বা পেন্সিল বা একটুকরো ছুঁচলো কাঠি নিয়ে বসেন। একদিন মধ্যাহ্নের পূর্বে কাশীপুরের বাড়ীর গাড়ীবারান্দার ছাদে সেবক কালীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণকে তেল মাথিয়ে দিচ্ছিলেন, সেদিন তিনি স্বান করবেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি একটি ছুঁচলো দৃঢ় কাঠি নিয়ে দেয়ালের বালির উপর আঁকতে শুরু করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি প্রাচীরচিত্র আঁশ্বপ্রকাশ করে; দেখা গেল গাছের ডালে বেন বলে আছে একটি জীবন্ত পাখী। আঁকা শেষ হতে দেখা গেল শিল্পীর মুখে ফুটে উঠেছে আশ্চর্য্যস্বাদের মুহূর্ত। বিম্বিত সেবক কালীপ্রসাদকে তিনি বলেন : “আমি ছেলেবেলার সব পোড়োদের ছবি এঁকে অবাক করে দিতুম।”^{৩০}

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী। সে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে রোগের বাড়াবাড়ি, কতস্থান হতে প্রায়ই রক্তক্ষরণ চিকিৎসক ও সেবকদের ভাবিত করে তুলেছে। দেখা গেল সব বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি কাঠকয়লা দিগ্ধ একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন। আঁকার বিষয়বস্তু বিবিধ ও বিচিত্র। আঁকেন হাঁকো হাতে একটি বারবধুর ছবি, একটি হাতির মাথা, তার পাশে লেখেন “ও রাম (তোমার ভ্রাতা)।” আবার তিনি আঁকেন শিবঠাকুর, আঁকেন বাবা তারকনাথ, আঁকেন একটি পাখী।^{৩১} রেখাভূষিত চিত্রে শিল্পীর রেখা-বিশ্বাসের মুন্সিরানা সবাইকে অবাক করে দেয়। শিল্পীর বাস্তবনিষ্ঠ চিত্রগুলি প্রমাণ করে তাঁর পশুপক্ষী মাহুত ও তাদের হাবভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণের কুমত। তাঁর অন্ততম জীবনীকার লিখেছেন, “সাধারণভূমিতে ঠাকুরের ইঞ্জির মন বুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণসম্পন্ন ছিল, তার কারণ ভোগসুখে অনাসক্তি। কলে তাঁর দর্শন হত অধিক বস্তুনিষ্ঠ। কামনা-রাভানো মনের ভাব দ্বারা মুগ্ধ হত না।”^{৩২} শিল্পী বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতি এমন ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, তিনি অনার্য্যস রেখার টানে যেহেতু ভঙ্গী, মুখের ভাব, চোখের চাহনি চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হতেন। সেই সজ্জ শিল্পীর গভীর দরদ রেখার ছন্দে তুলত আনন্দ শিহরণ। সে কারণে তাঁর চিত্র হত এত মনোমুগ্ধকর।

৩০. স্বামী অভয়ানন্দ : আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮২

৩১. মাইরমশায়ের ভায়েরী

৩২. লীলাপ্রসঙ্গ, ৪।১৭০

বিজ্ঞানী শ্রীমত্ৰুক্ষ তাঁর আদৃত আনন্দরূপা লোককল্যাণার্থে আবিষ্কার বিতরণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন কয়েকটি মহৎ চরিত্রকে, তাঁদের মধ্যে প্রধান নরেন্দ্রনাথ। মুখ্য ভাবসংবাহক নরেন্দ্রনাথকে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই শ্রীমত্ৰুক্ষের বিভিন্ন চিত্রশিল্পের মধ্যে। তিনি নরেন্দ্রনাথকে লোকশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁকে লোকশিক্ষার চাপরাস লিখে দিয়েছিলেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী শনিবার (১৮৮৬) সন্ধ্যাবেলা শ্রীমত্ৰুক্ষ তাঁর সেবকের কাছে চেয়ে নেন একটুকরো কাগজ ও একটি পেন্সিল। তিনি প্রাঞ্জল হৃদয় করে লেখেন: “জয় রাধে প্রেমময়ী, নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে। জয় রাধে।” প্রকৃতপক্ষে তাঁর লেখাটি ছিল, “জয় রাধে পৃথমোহি, নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে, জয় রাধে।”^{৩৩} লেখার নীচে তিনি আঁকেন একটি আকর্ষণীয় মূর্তি, তাঁর পদ্মপলাশ নেত্র, দৃঢ় চোয়াল ও স্ব-উচ্চ নাক। তাঁর পিছনে ব্যগ্র হয়ে ছুটেছে একটি দীর্ঘপৃষ্ঠ ময়ূর। সহজেই কল্পনা করা যায় চিত্রের বিষয়বস্তু। নির্বাচিত লোকশিক্ষক নরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে সাগ্রহে ছুটেছেন লোকশিক্ষকের শিক্ষক শ্রীমত্ৰুক্ষ। তিনি লোকশিক্ষার চাপরাস নিজে হাতে তুলে দেন নরেন্দ্রের হাতে। তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ বিদ্রোহ করেন, শ্রীমত্ৰুক্ষ মুচ্কি হেসে বলেন, ‘তোরা ছাড় করবে’। নরেন্দ্র তাঁর নরনের মণি। নরেন্দ্রকে লোকশিক্ষক হতে হবে। লোকশিক্ষার জন্য প্রয়োজন বিশেষ শক্তি। নরেন্দ্রকে তিনি যনের মত গড়ে তোলেন, তাঁর মধ্যে অলৌকিক শক্তির সঞ্চার করেন, কিন্তু এত করেও তিনি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তিনি অঘটন-ঘটন-পটিলী মহাশক্তি জগন্নাথের নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে নরেন্দ্রের জন্য প্রার্থনা করেন। নরেন্দ্রের জন্য তাঁর এই আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একটি মনোরঞ্জনকারী চিত্রশিল্পে। সেদিন ছিল ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। কালীপুর বাগানবাড়ীর নীচের তলায় দানাদের ঘরে বসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন ও মাঠারমশাই, সেবক শশী এসে তাঁদের উপহার যেন একখণ্ড কাগজ। কাগজের একপিঠে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ‘নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও,’ আর তার নীচেই আঁকা রয়েছে একটি বাঘ ও একটি ঘোড়া। কাগজখণ্ডের উল্টোপিঠে আঁকা রয়েছে একটি রমণী, তার মাথায় বড় ধোঁপা।^{৩৪} প্রবীণ চিত্রশিল্পীর খেলালিপনা ও

৩৩ মাঠারমশায়ের ভায়েকী

৩৪ মাঠারমশায়ের ভায়েকী

শিল্পনিপুণতা দর্শকদের মোহিত করে, কাকুর কাকুর চোখে জল এসে যায়।
আমাদের শিল্পী রসজ্ঞ চিত্রসমালোচকও বটে। একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে
আমরা প্রসঙ্গান্তরে বাব। দক্ষিণেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেয়ালে
নানান দেবদেবীর ছবি।^{৩৫} একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দেয়ালে টাকানো বশোদার
ছবিটি দেখিয়ে বলছেন: “ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনীমানী
করেছে।”^{৩৬} চিত্রসমালোচক শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিভিন্ন শিল্পসাধনা ও অধ্যাপনসাধনার লক্ষ্য একমুখী,
বরঞ্চ বিভিন্ন শিল্পসাধনা অধ্যাপনবিভারই অন্তর্ভুক্ত। “পরমহংসদেব বলিতেন,
যাহার শিল্পরসবোধ নাই—সে কোমল ও আধ্যাত্মিক রাস্যে পৌছিতে পারে
না।”^{৩৭} শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানীর অবস্থায় ভক্তি-ভক্ত নিয়ে রসে বশে থাকতেন,
নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্যের খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্যে সত্য শিব হৃদয়ের প্রতিফলন
সন্ধান করে আনন্দ বিলাসে মগ্ন হতেন। তিনি বলতেন, “যেমন জলরাশির
মার থেকে ভুড়ভুড়ি উঠে সেইরূপ মহাকাশ চিহ্নাকাশ থেকে এক একটি রূপ
উঠেছে দেখা যায়।”^{৩৮} সেই নিখিল সৌন্দর্যের অভিব্যক্তনা অভিব্যক্ত করতে
গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামিল্ল, সঙ্গীতশিল্প, নৃত্যশিল্প, নাট্যশিল্প, চিত্রশিল্প,
ভাস্কর্যশিল্প প্রভৃতিতে মেতে উঠেছেন এবং তাঁর হৃদকন্দর-উৎসারিত অফুরন্ত
আনন্দধারা বিভিন্ন শিল্পকলার মাধ্যমে ‘অগচ্ছিত্য’ অব্যক্তের বিতরণ
করেছেন। তিনি তাঁর সাত কোকরের সানাইয়ে নানা স্বরের লহরী তুলে
অগচ্ছিত্য মাতিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু বোধ করি বিশ্বশিল্পী সৃষ্টিকর্তার শিল্প শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর
জীবন-শিল্প। লৌকিক ও অলৌকিক শিল্পকলার সর্বমঙ্গল সমন্বয় ঘটেছে তাঁর
জীবনশিল্পস্রোতে! শিল্পীশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের জীবন-রসকে রাঙিয়ে

৩৫ চরিত্রগঠনে ছবির প্রভাব গভীর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: “দেখ,
সাপুল্ল্যাসীদের পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল বেলা উঠে অন্ত মুখ না দেখে
সাপুল্ল্যাসীদের মুখ দেখে উঠা ভাল।....বেকরপ লোকের মধ্যে থাকবে, লোকপ
অভাব হয়ে বাবে। তাই ছবিতেও দোষ।”

৩৬ কথামৃত, ৫:৪১২

৩৭ সিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী: স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙালার উনবিংশ
শতাব্দী, পৃ: ৩৩৪

৩৮ কথামৃত, ৪:১১৫

ছিলেন বিশ্বস্ততার সেই বাহু-রঙে, যে রঙের গায়লায় চুবিরে তিনি প্রত্যেক প্রার্থীকে তার নিজের রুচি ও অধিকার অনুযায়ী বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে দিতে পারতেন। সর্বভাব-সমন্বিত তাঁর জীবনরসে ছিল সকল ভাবের স্বতন্ত্র আকর, সেই কারণে এই অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেছিলেন। তাই দেখতে পাই তিনি নরেন্দ্রনাথ থেকে গড়েছেন বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ, তৃত্য রাধুভূরামকে করেছেন ব্রহ্মজ্ঞ অকুতানন্দ, নাট্যাচার্য গিরিশকে বানিয়েছেন বীরভক্ত, কুমে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার জুর্গাচরণকে তৈরী করেছেন আদর্শ গৃহীতক্ত, রসিক মেথর থেকে সৃষ্টি করেছেন হরিতক্ত। শিল্পকুশলী শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য মূল্যায়নায় মুগ্ধ হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ স্বার্থহীন বলেছিলেন : “মনের বাহিরের জড় শক্তি সকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অকুত ব্যাপার দেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলাবামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে দিয়ে ভাঙত, পিটত, গড়ত, স্পর্শযায়েই নূতন হাঁচে কেসে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি না।”^{৩২} আবার তাঁর প্রবর্তিত নূতন যুগের পথ নির্দেশের জন্য তিনি রেখে গেছেন যোগ-কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি সমন্বিত তাঁর আদর্শ ব্যক্তিত্বের রূপ-নির্মাণ—তাঁর জীবন-শিল্প-সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধশতকের জীবন আত্মশক্তির সীলভূমি। আত্মশক্তি জড় ও চেতন মিশিয়ে তৈরী করেছেন বিশ্ববৈরাগ্যের খেলাঘর এবং ইদানীংকালে সেই খেলাঘরে খেলতে পাঠিয়েছেন তাঁর সেরা পাকা খেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীরামকৃষ্ণ জড় নিয়ে শিল্প গড়েছেন। চেতনের ফলাকোশলের রহস্যভেদ করেছেন। জড় ও চেতনের ভেদ ঘুচিয়ে প্রমাণ করেছেন সার সত্য, বিস্তারিত একমাত্র সং-চিন্তা-আনন্দ। বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য জ্বিতাণে তাপিত মানুষকে তার স্বরূপের সন্ধান দেওয়া, শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার উদ্দেশ্য মানুষের রূপরসাত্মক পরিবেষ্টনীর গভীর ভেদ করে মানুষকে তত্ত্ববোধমুখী করে দেওয়া আর বিজ্ঞানী ও শিল্পীর সমন্বিত সাধনা—জড়ের স্বরূপ ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষকে চিন্তানন্দে স্থাপনানে প্রতিষ্ঠিত করা, ‘খোঁকার টাটি’ সংসার-খেলাঘরকে ‘মজার কুঠিতে’ রূপান্তরিত করা।

একটি ব্রাহ্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে বাবুরাম

নাভিদীর্ঘ বলিষ্ঠ ত্রুটিষ্ট যুবক। পরিধানে রক্তাশ্বর। তাঁর হুঠায় ঘাঘা, হুঠী কমনীয় চেহারা, হুখে-আলতার মেশানো গায়ের রং। তাঁর বিনীত স্বভাব, সাম্বিক প্রকৃতি ও আনন্দোজ্জ্বল মুখ ঘেঁষে কেউ কেউ ধারণা করে, যুবক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কোন ভট্টাচার্যের পুত্র। খোজ নিয়ে জানা যায়, যুবকের নাম বাবুরাম ঘোষ। বাড়ী তার তত্ক্ষা আটপুর। বর্তমানে কলকাতার কলুনিয়াটোলার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকেন।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শীর্ষনেতা শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বাবুরাম ঈশ্বরকোটি, নিত্যসিদ্ধ, অকৈতব ভক্তির বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে বাবুরাম সখ্যে বলেছিলেন, “দেখলুম দেবীমূর্তি—গলায় হার, লম্বী সর্কে।” “ও নৈকশুকুলীন, হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।” “ও রত্নপেটিকা।” রাখারাপীর অংশ হতে তাঁর উদ্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাত্ম্যের সময় তিনি বাবুরাম ভিন্ন অপর কারুর স্পর্শ সহ্য করতেন না। বাবুরামের অনন্য মাতঙ্গিনী দেবী বিজ্ঞানজ্ঞ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে বাবুরামকে চেয়ে নিয়েছিলেন। বাবুরাম এখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী, নিত্যদাস। তার চাইতেও বড় কথা বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের ‘দরদী’, অন্তরঙ্গ সেবক-সঙ্গী।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার বাবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন। একটি ব্রাহ্মোৎসবে তাঁর নিয়ন্ত্রণ। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে বাবুরাম তাঁর গামছা, মশলার বটুরা ও কাপড়চোপড় শুছিয়ে নেন। ঘোড়ার গাড়ীতে যাবেন। এঁদের সঙ্গে যাবেন প্রতাপচন্দ্র হাজরা—রামকৃষ্ণ লীলাবিলাসের জটীলা-কুটীলা।

আত্রহস্তের স্তম্ভ বস্ত্রসকলের সার্বিক কলনকারী কালীই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ‘মা’ জগদম্বা—একাধারে সোম্যা ও ভীমা ভাবের সার্বিক সমন্বয়। মা জগদম্বার আদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের অমিত্যবীতে নারেবী করছেন, যম্মী জগদম্বার হাতের বস্ত্রবস্ত্রপ জিতাপতাপিত মাহুকে কালীকল্লভকমূলে আশ্রয় জুটিয়ে দিচ্ছেন, সকল মাহুকে ঈশ্বরামৃতের আশ্বাসনে আবৃত্তি করবার জন্ত মাহুকের ধারে ধারে ভগবদাব প্রচার করছেন। ‘গোরাগ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা’ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজই খুবই খাতির। তাঁর চরিত্রে ঈশ্বরোদ্ভাবনার ঈশ্বর দেখে

ইংরাজী শিক্ষিতেরাও যুঁহ। তিনি কলকাতার চলেছেন ব্রাহ্মভক্ত মণি মল্লিকের বাড়ীতে। সেখানে আজ সাপ্তাহিক ব্রাহ্মোৎসব। জীৱামল্লিক প্রেমিক, তাঁর স্বভাব অনন্তস্বতন্ত্র। প্রেমিকের থাকে না কেউ আশ্রয়। প্রেমিক সকলেরই। সে কারণে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলেই জীৱামল্লিকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বোধ করেন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে বাজা করার পূর্বেই জীৱামল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কলকাতার কলেজের তিন পড়ুয়ার। জীৱামল্লিকের লাংগামণ্ডিত রূপমার্ঘ্য, শ্রীতিপূর্ণ আন্তরিক অভ্যর্থনা যুবকদের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে, উদ্বীগিত করে। তিনি যুবকদেরকে আমন্ত্রণ করেন কলকাতার ব্রাহ্মোৎসবে যোগদানের অন্ত। তিনজনই সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

জীৱামল্লিক সন্ধ্যা চলেছেন একটি ঘোড়ার গাড়ীতে। সিদ্ধুরিয়া পট্টিতে অবস্থিত মণি মল্লিকের বাড়ীতে যাবেন। বাড়ীর ঠিকানা ৮১ নং চিংপুর রোড।^১ বাড়ীর পূর্বদিকে হারিসন রোডের চৌমাথা। ফলের বাজারের অন্ত সেখানে লোকের বেশ ভীড়।

মণিলাল মল্লিক প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত। ধর্মশ্রায়ণ মণিলাল বাড়ীতেই পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পারিবারিক সমাজ ও তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি চিত্র এঁকেছেন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের প্রধান একজন ইতিহাসবিদ সোফিয়া ডবসন্-কোলেট। তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণীতে লিখেছেন,—"The Samaj is regularly going on for the last sixteen years. Its fixed time for service is Friday evening. In a certain sense this Samaj may be called a model one. Babu Moni Mohan Mallick, with his sons, daughters, daughter-in-law and grand children—all these together have formed the Samaj. Several men and women from outside come and join in the services, but their number has been a little diminished, owing to the last agitation in the Brahmo Samaj. The beautiful sight of a father, in the midst of his family, regularly and reverently calling on the name of the

১ বৈকুণ্ঠনাথ সার্যালের মতে বাড়ীর ঠিকানা ছিল ৮১নং সিদ্ধুরিয়া পট্ট। বাড়ীটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

Supreme Being, is not often to be seen elsewhere. The natural reverence of the Hindu nation is the chief feature of this Samaj. There is one want to be seen in this respect, viz., those anusthanas which separate the Brahmo Samaj from the idolatrous Hindu community, have not yet been performed here.^{১২} বিদেশিনী বিদুসী মহিলা মল্লিক পরিবারের এই ব্রাহ্মসমাজটিকে বলেছেন একটি মডেল বা আদর্শস্থানীয়। একহুঁরে গাঁথা মল্লিক পরিবারের সকল ব্যক্তি। পরিবারের ব্রাহ্মসমাজটির অবয়ব ও ভাব, ছুটিরই প্রশংসা করেছেন তিনি। অন্তর্ভুক্ত ত্রিধা-বিভক্ত ব্রাহ্ম-আন্দোলনের স্বশক্তি ক্রীণ হতে চলেছিল, এর প্রতিক্রিয়াতে উদারপন্থী মল্লিক পরিবারের সমাজে জন-উপস্থিতি কম হওয়াই স্বাভাবিক। কোলেট সমালোচনা করে বলেছেন মণি মল্লিকের পরিবারের সমাজে দেবেজনাথ প্রবর্তিত ‘ব্রাহ্মী উপনিষৎ’ ও প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতি চালু হয়েছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মমতাবলম্বীর আচার-ব্যবহার নিয়মিত করার জন্য ব্রাহ্মদের ‘অছুষ্ঠান’ অংশটি তখনও গৃহীত হয়নি। আদি ব্রাহ্মসমাজ ক্রমেই হিন্দুধর্ম বা হয়ে পড়ছিল এবং কোলেটের মত অত্যাংশাচরী সমর্থকগণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের চিন্তা ও আচরণে অসংগত সহযোগিতা দেখে অত্যধিক ভাবিত হয়েছিলেন। সে কারণেই প্রাপ্ত সমালোচনা। এই প্রসঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ১৮০৭ শকাব্দের মাঘ (১১০ সংখ্যা) যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সেটি স্বরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, “সকল হিন্দুশাস্ত্রের চরম উপদেশ যে ব্রহ্মোপাসনা তাহা বাহ্যতে প্রচলিত হয় এই উদ্দেশে মহাত্মা রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মহৎ অভিপ্রায়সম্মত ঐ সমাজের কার্য অভ্যাস চলিতেছে।”

কোলেটের হিসাব অনুযায়ী লিন্দুরিয়া পণ্ডি মল্লিকদের পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজটি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৮১ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ (১২০ সংখ্যা) হতে জানতে পারি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লিন্দুরিয়াপণ্ডির গোপাল মল্লিকের বাড়িতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। স্বরং দেবেজনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন উপদেশ দিতেন।^{১৩} প্রকৃতপক্ষে লিন্দুরিয়া-

১ Sopia Dobson Collet: Brahmo Year Book for 1880; p. 87

৩ বিনয় বোষ (সম্পাদিত): সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১২৬

পট্টিতে বৃহৎ মল্লিক পরিবারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ব্রাহ্মসমাজ স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেশ কিছুকাল। কিন্তু হিন্দুতাব ঘোঁষা আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও যশি মল্লিক ও তাঁর পরিবারবর্গের হাবডাব দেখে বিশেষতঃ ঐরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তপ্রীতি লক্ষ্য করে “ঐঐরামকৃষ্ণপুঁথি”-কার বে মন্তব্য করেছেন, সেটি বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন,

নিরাকারবাদী তেঁই ব্রাহ্ম মাজ নামে।

বড়ই পীরিত ভক্তি প্রভুর চরণে।

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, “যশিবাঁধু আত্মতানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রী-পুত্রব সকলেই বে তৎকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন এবং উক্ত সমাজের পদ্ধতি অনুসারে দৈনিক উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেন, ইহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি।” কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনীসূত্রে নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, যশিলাল মল্লিক সিন্দুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আরও জানা যায় বে যশিলাল ছিলেন আদি ব্রাহ্ম-সমাজভূক্ত। “তাঁর দুই পুত্র, গোপালচন্দ্র মল্লিক ও নেপালচন্দ্র মল্লিক উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ পরিচিতি হয়েছিলেন।”^৪ কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতে নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিক—দুজনেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন।^৫

কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্মৃতিকথা হতে আরও জানা যায় বে এই মল্লিকদের বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে ব্রহ্মোপাসনা এবং বৎসরান্তে একবার ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হত। এখানেই তিনি (মিত্র মশায়) ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে ঐরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ব্রহ্মোপাসনার সময় শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা পরিচালনা করেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপদেশ দি়েছিলেন। “কত ভালবাস গো মা মানবসন্তানে মনে হলে প্রেমধারা বরে ছুন্নয়ে।” এই গানটি শুনে ঐরামকৃষ্ণ ডাবসমাধিতে মগ্ন হন। তাঁর এই মাধুৰ্যমণ্ডিত রূপ দেখে উপস্থিত সকলের মন উল্লসিত ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়।^৬

৪ হেমলতা দেবী : শিবনাথ-জীবনী, পৃ: ১১০

৫ কৃষ্ণকুমার মিত্র : “আত্মচরিত” : “পরমহংসকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সিন্দুরিয়াপটির নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটীর ব্রহ্মোৎসবে এবং বেণীমাবব দাসের সিঁথি উত্তরশাড়ার বাগানবাটীর উৎসবে বহুবার দেখে থাকি।” (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭-এ উদ্ধৃত)

৬ কৃষ্ণকুমার মিত্র : ‘রামকৃষ্ণ পরমহংস,’ প্রবাসী, ১৩৪২, কাকুন, পৃ: ৩৮৩

মণিলাল বিশেষ অল্পগৃহীত ভক্ত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ শ্রিয়পাণ্ড।
কিঞ্চিৎ রূপণ বলে পরিচিত ছিলেন মণিলাল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিয়ে-
ছিলেন, “ভাখ গো, তুঁনি ভারী হিসেবী, এত হিসেব করে চল কেন? ভক্তের
বড় আর তত্ৰ ব্যয়।” মণিলাল পরীষ হেলেদের পড়াড়নার ভক্ত অনেক টাকা
ব্যয় করতেন। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা হতে জানতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ
তাঁকে সন্নেহে উপদেশ দিয়েছিলেন, “ভাখো, বয়স হোলে সংসার থেকে চলে
গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। ঈশ্বরকে ফুরে ধ্যান করতে হয়। তাহলে তাঁর
উপর প্রেম জন্মায়।” লাটু মহারাজের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ মণি মল্লিককে তাঁর
একজন ভক্ত বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

সেই মণি মল্লিকের বাড়ীতে সারাদিনব্যাপী মহোৎসব। সাংস্কৃতিক
ব্রাহ্মোৎসব। বাড়ীর দোতালার বৈঠকখানা। সেখানেই কীর্তনামির ব্যবস্থা
হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, “উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও
ভিতরে হরিৎ বৃক্ষশল্লবে, নানা পুষ্প ও পুষ্পমালায় স্ত্রশোভিত।”

উৎসবের দিনটি ছিল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর। সোমবার। শীত-
কালের উষ্ণযমাত্র ঘটেছে। স্নিগ্ধ আবহাওয়া, উৎসবপ্রাক্কণের পরিমণ্ডল আনন্দ-
পূর্ণ। উপস্থিত ভক্তদের অন্তরে আনন্দের কলধারা, বাইরের আনন্দক্ষুণ্ণতির
কেজে রয়েছেন আনন্দকন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ তদানীন্তন ধর্মসাধনার কেজে
বিচিত্র-বিশ্ব ও জনপ্রিয় আনন্দঘন ব্যক্তি।

বেলা চারটা নাগাদ সেখানে উপস্থিত হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সেই
তিন পড়ুয়া—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী (পরে স্বামী সারদানন্দ), বরদাহন্দর পাল ও
হরিশ্রসয় চট্টোপাধ্যায় (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ); কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হন
তাঁদের বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ দাম্মাল। তাঁরা দেখেন মধ্যাহ্ন উপাসনা সঙ্গীতাদির পর
বিরতি চলেছে। পরবর্তী আকর্ষণ, সায়াহ্ন উপাসনা ও কীর্তনামির আসর।
পরিবারের মহিলা ভক্তদের অল্পরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্দরমহলে গিয়েছেন, কিছু
মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করবেন। হাতে সময় আছে ভেবে শরচ্চন্দ্র ও তাঁর সহপাঠীরা
অস্ত্রজ বেড়াতে যান।

এই ব্রাহ্মোৎসব করেকটি বৈশিষ্ট্য বোশ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন, “সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ
করিতেছেন। তাঁহারা আজ একটি বিশেষ উৎসাহে উৎসাহাধিত—আজ
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে।” ব্রাহ্মনেতাদের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

আশ্চর্য এক ব্যক্তি। জনৈক ব্রাহ্মনেতা লিখেন, “পরমহংসদেবের চারদিকে এমন এক জ্যোতির্ঘন ভাবসমীরণ সঞ্চারিত হয় যে তার মধ্যে স্বভাবই তাঁর চিত্ত অঙ্কন আনন্দে ভাসতে থাকে।” অপর একজন ব্রাহ্ম আচার্য লিখেন, “(পরমহংসদেব) খর্বচর্চা ঐশ্বর্যশালী তির সাংসারিক কথা বলিতেন না। কথায় তিনি অত্যন্ত রসিকতা ও প্রভুত্বের বুদ্ধির পরিচয় দিতেন।... তাঁহার যেমন শাক্তভাব, তেমনই বৈষ্ণবভাব ও তেমনই ঋষিভাব ছিল। তাহাতে যোগভক্তির আশ্চর্য সম্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের স্তায় প্রমত্ত হইয়া তালে তালে হৃদয় নৃত্য করিতেন, নৃত্যকালে অনেক সময় ভাবে বিস্তার হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগসমাধিতে একেবারে স্পন্দহীন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া থাকিতেন।”^১ শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে যে আনন্দ-মৌভাত সৃষ্টি হত তার আকর্ষণ সকলেই কম-বেশী অনুভব করত, যদিও তার বৃত্তিসম্বন্ধ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অধিকাংশ ব্যক্তিই একমত হতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক উৎসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তির উপস্থিতির সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করে তদানীন্তন একটি পত্রিকা লিখেছে, “Learned pundits, educated youths, orthodox Vaishnavas and yogis gather in numbers, some from curiosity, some for the sake of Sadhu Sanga or good company, others for acquiring wisdom and joining the Kirtan.”^২

যিনি যে উদ্দেশ্য নিয়েই যোগদান করুন না কেন, উপস্থিত ব্যক্তিদের গভীর অঙ্গভূতি ও লকিত আনন্দসম্ভারের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। সহজ দৃষ্টিতে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণ তাঁর প্রিয় গানের বাগীতে পাওয়া যায়। তিনি গাইতেন, “প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বভাবের। ও তার থাকে না ভাই আশ্চর্য।” শ্রীরামকৃষ্ণ খাঁটি প্রেমিক। সমাগত ব্যক্তিদের সমষ্টিচেতনায় যে আনন্দলহরীর স্রবণ ঘটত সে সম্বন্ধে প্রাক্তন পত্রিকা লিখেছে, “We have invariably found on such occasions an outburst of living devotional enthusiasm—a mighty wave of rapturous excitement—sweeping over the whole audience.

১ চিরঞ্জীব শর্মা: শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি, চতুর্থ সংস্করণ

২ New Dispensation dated Jan. 8. 1882.

The effect is wonderful. Theological differences are lost in the surging wave of love and rapture."^৯

আন্দোলনের লক্ষ্য আন্দোলনের মধ্যে স্বয়ং উৎসবের উদ্বোধন। উৎসব-দীপালোকে প্রতিটি স্বয়ংকে প্রদীপ্ত করতে সমর্থ ঐরামকৃষ্ণ। আনন্দ-নিব্বার ঐরামকৃষ্ণ জী-পুত্র, বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মাছুষের কাছে, নিকট-জন। সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ গত্যাত ও সহজ মেলায়েশ। যে সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত আন্দোলমাত্র তাঁর প্রেরণেবিশেষে প্রমত্ত, সে সময়েও দেখতে পাই ঐরামকৃষ্ণের আকর্ষণে আন্দোলমাত্রের একটি সম্প্রদায়ের ধর্মাস্থানে উপস্থিত হয়েছেন সকল সম্প্রদায়ের আনন্দগণ। সেখানে উপস্থিত আদি আন্দোলমাত্রের একজন বিশিষ্ট নেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। "ইহার সমস্ত বিজ্ঞানবুদ্ধি ও জীবন আন্দোলমাত্রের পরিচর্যায় নিয়োজিত। ইনি একজন প্রসিদ্ধ সৎকথা। তেজস্বী অগ্নিময় বাক্যে চিন্তা উত্তেজিত করিতে এবং করুণ ও কোমল বাক্যে চিন্তা আর্জ করিতে ইহার জ্ঞান অতি অল্প লোকেই পারেন।"^{১০} উপস্থিত নববিধানের সঙ্গীতাচার্য জৈলোক্যনাথ সায়াল ওরফে চিরঞ্জীব শর্মা। সঙ্গীত বিহনের ছাটি পাখা, কথা ও স্বরের স্বচ্ছন্দ সকালনে জৈলোক্যনাথ তাঁর স্বরেলা ও মাধুর্যমিশ্রিত কর্তে যে ভাব ও ব্যক্তির উপস্থাপনা করতেন তার অভিব্যক্তি ছিল স্বয়ংকারী। সাধারণ আন্দোলমাত্রের আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও সেখানে বিদ্যমান, তিনি সবভাবে প্রকাশোন্মুখ। শুধু আন্দোল নেতারাষ্ট্র নন, আন্দোল হিন্দুদের মধ্যেও অনেক উপস্থিত। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ঐরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুগামী। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঈশ্বরকোটি বাবুরাম, তারবাহী শরচ্চন্দ্র, তপস্বী হরিপ্রসন্ন, ভক্তিরসসিক্ত রসদার বলরাম, অবতারলীলার নিজস্ব সংবাদদাতা মহেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ লীলাবিলাসের জটিলাকুটিল প্রতাপচন্দ্র হাজরা।

দোতলার বৈঠকখানা ঘরে সায়াল উপাসনার পূর্বে ভক্তপরিবৃত হয়ে বসে আছেন ঐরামকৃষ্ণ। ঐরামকৃষ্ণ রসিক। তাঁর আনন্দরসতা রসে বশে পরিব্যাপ্ত, বিচিত্রভঙ্গীতে প্রকটিত। নিজের সখকে তিনি বলেছেন, "আমি কখনো পূজো, কখনো জপ, কখনো বা ধ্যান, কখনো বা তাঁর নামগুণ গান করি, কখনো তাঁর নাম করে নাচি।" ঐরামকৃষ্ণ "হরিপ্রসঙ্গে যাতোয়ারা ; তাঁহার প্রেম, তাঁহার

৯ New Dispensation dated Jan. 8. 1882.

১০ ভববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৮০০ শক, ৪২৮ সংখ্যা

অসম্ভব বিশ্বাস, তাঁহার বালকের দ্বার ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা হইয়া কল্পন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে তাঁঁ আত্মিক পূজা, তাঁহার বিষয় কথা বর্ণন, ও ভৈলখারাতুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্বধর্মসম্বন্ধ ও অপর ধর্মে বিবেক-ভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বর ভক্তের জন্ত রোদন—এ সকল কারণে তিনি ঈশ্বরানুগামী ব্যক্তি মাত্রেই ক্ষণে হুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপাসনার লক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শন, ধর্মাচরণের লক্ষ্য ভাবভক্তি আত্মজ্ঞান। ভাবায়িতে প্রদত্ত তাঁর জ্যোতির্ময় ব্যক্তিসত্তা মানুষকে আকর্ষণ করে। তাঁর অমিয় কণ্ঠের কথাবৃত্ত শ্রোতার হৃদয়অমিকে তন্ত্রিসাম্যেতে সিক্ত করে। উপস্থিত ব্যক্তি সকলের মধ্যে যদি আধিকারিক পুরুষ কেউ থাকেন তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সহজেই উদ্যম হয়ে ওঠে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসে আছেন সাধকপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অধৈতগোস্বামীর শোণিত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত। বিজয়কৃষ্ণ ও অষ্টানুগদের সঙ্গে সলাপ করতে থাকেন সহানুভবন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তরুণ নেতা শিবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়জন। শিবনাথের শুদ্ধ আধার। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শিবনাথ যেন তন্ত্ররূপে ভূবে আছেন। শিবনাথের মধ্যে প্রকাশোন্মুখ বিশেষ ঐশ্বরিক শক্তি চিনতে পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহিত করেন। অপর পক্ষে শিবনাথ রচিত গুরুবন্দনার মধ্যে পাই, “রামকৃষ্ণঃ শক্তিসিদ্ধো মাতৃভাব সমবিতঃ” এবং তাঁর স্বাকৃতি “স্বৈচ্ছতান্ মহতীং শক্তিং লভেহং ধর্মসাধনে।” কর্ম ব্যস্ততার জন্ত শিবনাথ আজ আনন্দোৎসবে বোপ দিতে পারেন নি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন দক্ষিণেশ্বর যাবেন, কিন্তু বান নি, এমন কি কোন খবরও যেন নি। সাধক জীবনের পক্ষে এ আচরণ গর্হিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই আচরণের মধ্যে দৃষ্টি বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, “এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্রা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।” “সত্যো ন লভ্যশুশ্রুসা হেথ আত্মা।” মুণ্ডকোপনিষদের ঋষিও বলেছেন, ‘সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকাই শ্রেষ্ঠ তপস্রা।’ শ্রীরামকৃষ্ণের সকল আচার আচরণ নজিরের জন্ত। শিবনাথ ও অপরদের তত্ত্বের আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা করে দেবার জন্ত অহং-শূন্য-প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন নিজের জীবনে পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। জীবনব্যাপী তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল যাতে তাঁর সত্যের আঁট কখনও শিথিল না হয়। তাঁর সাধন জীবনের উল্লেখ করে বলেন :

“আমার এই অবস্থার পর মাকে হুল হাতে করে বলেছিলাম, ‘মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমার শুদ্ধা ভক্তি নাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমার শুদ্ধা ভক্তি নাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমার শুদ্ধা ভক্তি নাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমার শুদ্ধা ভক্তি নাও।’ বখন এই সব বলেছিলাম, তখন একথা বলতে পারি নি, ‘মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য।’ সব মাকে দিতে পারলুম, সত্য মাকে দিতে পারলুম না।” অগ্ন্যাতার উগর চূড়ান্ত শরণাগতির নিদর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র, কিন্তু সেখানেও দেখছি একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই তাঁর আদর্শের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।

সন্ধ্যা নেমে আসে। অন্ধকার ঘন হয়। সমাজ গৃহে আলো জ্বালা হয়। ব্রাহ্মোপাসনার পদ্ধতি অনুযায়ী আচার্য বিজয়কৃষ্ণ ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। প্রণব সংযুক্ত এই মন্ত্র সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, সমবেত উন্মুখ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। সকলের মন ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর ভাবনার নিবিষ্ট হয়। উপাসকগণ চোখ বুঁজে সত্ত্ব ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হন, পরিবেশের গুণেই বোধ করি সকলের মন ধ্যানমুগ্ধীন হয়। ভক্ত সাধারণের মধ্যে স্নেহোন্মিত হচ্ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যেন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল কৈমিনী ভারতের শ্লোক :

অহমেব বিকশ্বেষ্ঠঃ লীলাপ্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।

ভগবন্তুক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্বদা।

ভক্তের ভূমিকার শ্রীভগবান। দীর্ঘকালের অলৌকিক সাধনার সিদ্ধ হয়ে সর্বভূতে ব্রাহ্মোপলব্ধির নবরূপায়ণে তিনি স্মরণ নিযুক্ত। ব্রাহ্মোপলব্ধির মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ। চিত্তার্শিত্যের দ্বার বসে আছেন, ধীর হির স্পন্দনহীন। নাগাশ্রে তাঁর দৃষ্টি স্থির, আনন্দদীপ্তিতে মুখ উদ্ভাসিত। সমবেত সকলেই প্রাণে শিহরণ অনুভব করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসারিত আনন্দের ফাগে সকলের হৃদয়ে সাময়িক-ভাবে হলেও রঙীন আনন্দলোক সৃষ্টি করে। রোমান্টিক-বপু শ্রীরামকৃষ্ণের মুখকমলে দিব্যানন্দের বিভা। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাদির গভীরতা অনেকেই ধারণা করতে পারে না। কিন্তু বাহ্যজগৎ লব্ধে দ্রুতবৎ হয়েও তিনি যে অপূর্ব কোন কিছু ধর্মন করেছেন, প্রবণ করেছেন, রস সন্তোষ করেছেন, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমে সমাধি থেকে ব্যথিত হন। বাহ্যশুভির প্রত্যাবর্তন ঘটে। তিনি চারদিকে চোখ মেলে দেখেন; দেখেন সমবেত অনেকেই চোখ বুজে বসে আছেন। ভাব-প্রযত্ন শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ ‘ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্ম’ উচ্চারণ করে গাড়িয়ে পড়েন। খোল করতাল সহযোগে কীর্তন আরম্ভ হয়। অল্পসময়ের মধ্যেই অদ্বৈতপূর্ব এক দৃষ্টের অবতারণা হয়।

প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে নরজা দিয়ে মাথা গুলিয়ে শরচ্ছত্র দেখেন, এক অপূর্ব দৃষ্ট। “গৃহের ভিতরে অগ্নীর আনন্দের বিশাল ভরল খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্নতের স্তায় আচরণ করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্নত স্তরের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন ক্ষতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা ঐক্যে পচাতে হাটিয়া আসিতেছেন এবং ঐক্যে বখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মগ্নমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনার্য-সমনাগমনের কল্প হান ছাড়িয়া দিয়াছে। তাঁহার হস্তপূর্ণ আনন্দে অদ্বৈতপূর্ব দিব্যজ্যোতি জ্বলিয়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের স্তায় বলের বৃগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লক্ষন নাই, কুক্কুসাধা অস্বাভাবিক অলংকৃতি বা অলংকরণ-রাহিত্য নাই; আছে কেবল আনন্দের অধীরতার মাধুর্য ও উত্তমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি। নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্ত যেমন কখনও ধীরভাবে এবং কখন ক্ষত সত্তরপ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও বেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি বেন আনন্দসাগর—ব্রহ্মবরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অলংকরণে প্রকাশ করিতেছিলেন। ঐক্যে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেছিলেন; কখন বা তাঁহার পরিধেয় বসন ঝলিত হইয়া বাইতেছিল এবং অগ্রে উহা তাঁহার কটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিল; আবার কখনও বা কাহাকেও তাবাবেশে সংজ্ঞাহীন হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন।”^{১১}

১১ আদী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসীলোগ্রন্থ, ৫ খণ্ড, পৃ: ৩১-৩২

ভাই জৈলোক্যনাথ সান্যাল স্বকণ্ঠ এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান একজন সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি প্রাণের অল্পকৃতি মিলিয়ে সুরেলা দরদর কণ্ঠে বরচিত একটি অক্ষয়লক গান বারংবার গাইতে থাকেন। ভাবের বহু উৎসাহিত হয়, আধ্যাত্মিক সৃষ্টির অভিব্যক্তি গভীর ভাব ও ব্যক্তির মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি গাইছেন :

নাচরে, আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে।

মনের স্বেচ্ছা হস্তস্বেচ্ছা মাকে ঘিরে।

শান্তিরস পান করি নাচ ধীরে ধীরে ;

(জনক সনকের মত রে)

যোগনেত্রে হে হরিরূপ হৃদয়মন্দিরে।

হৃদয় পঙ্কজে নাচ মহানন্দ ভরে ;

(নিতাই পৌরের ভাবে রে)

প্রেমমদে মত্ত হয়ে বিদূর্ণিত শিরে।^{১২}

বাজছে খোল করতাল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমধু সংগ্ৰহ করছেন, বিতরণ করছেন। তিনি আখর দিচ্ছেন—

নাচ মা ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে

আপনি নেচে নাচাও গো মা ;

(আবার বলি) হৃদপদ্মে একবার নাচ মা ;

নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভুবনমোহন রূপে।

ভদ্রপত হয়ে তিনি আখর দিচ্ছেন। আবার কীর্তন গানের সঙ্গে প্রায় অবিরাম তাঁর নৃত্য। কথাবৃত্ত, নৃত্য ও কীর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহোৎসবের আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের স্মৃতিচারণ হতে জানতে পারি “চিরঞ্জীব শরীর একতারা বাজনে ‘নাচরে আনন্দময়ীর ছেলে তোরা ঘুরে ফিরে।’ গীত-জবনে ভাবাবেশে গলিত কাকনবপু প্রভু ভক্তগণকে স্বর্গস্থি বিতরণ মাননে বামবাহ উত্তোলন ও দক্ষিণহস্ত কুঞ্জে, বামপদ আগে ও দক্ষিণ চরণ পিছে বাড়াইরা এমন মধুর নৃত্য করেন, তাহা বর্ণনাতীত। আপনি যেতে অগ্ন মাতার এই প্রথম দেখিলাম।”^{১৩}

কথা ও সুরের সমন্বয় বাটরে বাড়ালীর এক অভিনব সৃষ্টি কীর্তন গান। হৃদ-

১২ “চিরঞ্জীব সঙ্গীতাবলী”তে প্রকাশিত ৩২৮ নং গীত।

১৩ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাবৃত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৬

নৈপুণ্যে, ভাবার কাককার্বে, ভাবের মাধুর্যে, রঙ্গের প্রাচুর্যে, ব্যঙ্গনার ঐশ্বর্যে কীর্তন ও সংকীর্তন বাহুল্যের প্রাণরসের পুষ্টিবিধান করেছে। সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দও বলতেন, “সত্যকার সঙ্গীত আছে কীর্তনে—মাথুর বিরহ প্রভৃতি রচনাবলীতে।” সেই কীর্তনের স্বর ও ভাব যখন নৃত্যের চলন, বয়ান, আঙ্গিক ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সহজ মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তখন প্রোতা ও দর্শক বিমোহিত হয়। সাময়িকভাবে হলেও লৌকিক চেতনা হারিয়ে যেন আলৌকিক আনন্দলোকে তারা ভাসতে থাকে। বিশেষ করে সেই আসরে যদি অংশগ্রহণ করেন পুরুষোত্তম জীরাংকৃষ্ণ। জীরাংকৃষ্ণের সঙ্গীতনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি লিখেছেন “সাধারণ লোকের কীর্তন হইল গতি হইতে ভাব-এ...পরমহংস মশাই-য়ের কীর্তন হইল ভাব হইতে গতিতে।...পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল মেঘনৃত্য, বাহাকে চলিত কথায় বলে শিবনৃত্য। ইহার সহিত চল ভাবের কোন সংশয় নাই। এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই নিশ্চল ও বিভোর হইয়া বাইত; যেন সকলের মনকে তিনি একেবারে ভাবলোকে লইয়া বাইতেন।...এই সময়ে পরমহংস মশাই-এর দেহ হইতে যেন আর একটি ভাবদেহ বিকাশ পাইত।...পরমহংস মশাই যেন ভাবমূর্তি ধারণ করিতেন এবং স্বয়ং চাপ জমাট ভাবমূর্তি লইয়া, সকলের ভিতর, অন্নবিস্তর, সেই ভাব উদ্বোধিত করিয়া দিতেন।..কীর্তনেও যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদাই অনুভব করিতাম।”^{১৪} বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ কৃতি ও সামর্থ্য অহুযায়ী একই বস্তু বিভিন্নভাবে দেখেন ও বর্ণনা করেন। সঙ্গীতনে নৃত্যরত জীরাংকৃষ্ণ চিত্রশিল্পী শ্রিয়নাথ সিংহের দৃষ্টিতে যেকোন প্রতিভাত হয়েছিলেন সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। “রামকৃষ্ণদেব এদিক ওদিক হেলিয়া ছলিয়া আবার কখনও বা তালে তালে করতালি দিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছেন। দর্শকের মনে হইতেছে, যেন রামকৃষ্ণ-দেবের শরীর অস্থিবিহীন। যখন দক্ষিণ দিকে হেলিতেছেন বোধ হইতেছে, তাঁহার নিরোদেশ প্রায় ভূমি স্পর্শ করিল। পদদ্বয় তালে তালে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আবার কখনও ‘লক্ষ্যে যশ্শে কশ্শে ধরা’ উচ্চায় নৃত্য, যেন সেই নরীর মত কোমল দেহে সিংহের বল। গানের ভাব অহুযায়ী তাল ও লয় তরঙ্গ, তাল ও লয়ের তরঙ্গের সঙ্গে শরীরের তরঙ্গ তাহার সহিত সমস্ত ভক্ত-বর্গের মনে ভাবতরঙ্গ যেন ভগবৎপ্রেমের বস্তা। যম যার পৃথী বাহু আকাশ

১৪ মহেন্দ্রনাথ দত্ত : জীরাংকৃষ্ণের অহুযায়ী, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১১৫-৬

সমস্ত বিশ্বলংগার যেন সেই প্রেম-প্রবাহে স্পর্ষিত ও আশ্রয়িত।”^{১৫} আমাদের সোভাগ্য যে, শিল্পাচার্য নন্দলাল বহু সঙ্গীর্জনানন্দে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি রেখাচিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। “দিব্য ভাবাবেশে আশ্রয়িত হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে বেরুণ রক্ত মধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত এবং ভাবোন্মাদে উল্লসিত হইয়া তাঁহার দেহ বখন হেলিতে ফুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন অম হইত...বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সন্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির আগোচর হইবে।”^{১৬} এই প্রাণবন্ত দৃশ্যটি শিল্পাচার্যের তুলিতে বিদ্যুত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবত্বে ডাইলুট (dilute) হয়ে গিয়েছিলেন। ভিতরের এবং ভাবতরঙ্গ শরীরের অবয়ব ও রূপ যেন এককালে পরিবর্তিত করে ফেলেছিল। এদিকে জনসংঘের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেগ সংক্রামিত হয়, উপস্থিত সকলেই অল্পবিস্তর ভাববিহ্বল হয়ে “এক উচ্চ-আধ্যাত্মিক স্তরে” অবস্থিতির রসাস্বাদন করে ধস্ত হয়। এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা সংঘে লীলাসুতকার লিখেছেন, “এই নৃত্য দর্শনে ভক্তের ত কথাই নাই, দর্শকেরাও সংক্রামিত হইয়া নৃত্য করিতেছে, বোধ হ’ল যেন সমগ্র ভবনটিই নাচিতেছে।”^{১৭} সংকীর্তন-গায়ক ও শ্রোতার মনমগ্নপকে হরিসমুখও আকৃষ্ট করে। কীর্তনানন্দ সঞ্চার করে হরিরস যদিবা পান করে বিষয়ানন্দ তুলে বান সকলে। ভাব মাধুর্য ও লালিত্যে সন্মুগ্ন সকলের মন কিছুকণের জন্ত হলেও বৃন্দ হয়ে থাকে। এভাবে ছুৎপটারও বেশী সময় অতিবাহিত হয়। এবার কীর্তনীয়া এই আসরের শেষ সীতটি ধরিলেন,

“এমন মধুর হরিনাম অগতে আনিল কে।

এ নাম নিতাই এনেছে না হয় গৌর এনেছে,

না হয় শাস্তিপুরের অষ্টমত সেই এনেছে।”

কীর্তনের নাম শুনে শ্রোতা গায়ক বাদক সকলের চিত্ত হেলিতে-ফুলিতে থাকে—সকলেই নামে মাতোয়ারা—কারো নয়নে বারিধারা—লোকনির্বিশেষে সকলে আশ্রয়িত। এবার সকল সন্তোষ ও ভক্তাচার্যদের প্রণাম জানিয়ে

১৫ গুরুদাস বর্ষণ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, পৃ: ২৪৩-৪৪

১৬ স্বামী পরমানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৩-৭৪

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাসুত : ঐ, পৃ: ৩৪৬

কীৰ্তন সাজ হয়। সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। স্বামীজীৰ দিব্য-
ভাবেৰ ঐশ্বৰ্য্যবিতায় সকলেই মুগ্ধ, এৰ হৃৎকৃত্তি বাবুৰাম সৰস্বতীৰ স্মৃতিকোঠিৰে
সাজে।

শ্রীৰামকৃষ্ণৰ দৃষ্টি পড়ে ব্রাহ্ম নেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ৰ উপৰ।
শ্রীৰামকৃষ্ণ তাঁকে অহরোধ কৰেন ‘হরিরাম মণিরা পিছে মম মানস মাতরে’
গানটি গাইতে। পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত গান। নগেন্দ্রনাথ
আবিলি চিন্তে তাঁর স্মরণে কঠে গানটি পরিবেশন করেন। সকলেই ভূপ্ত হন।
কীৰ্তনে, ভাসানীতে, ডাকনে বা, অল্প অধ্যাক্ষত্বের গানে শ্রীৰামকৃষ্ণৰ শ্রীতি।
তাঁর প্রধান লক্ষ্য গানের ভাব শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করা। গানের রসিনী-
শক্তিতে শ্রোতাদের মোহিত করা।

বিষয়বিনিবৃত্ত প্রশান্ত মন নিয়ে অধিকাংশ ব্যক্তি উপস্থিত। সংসারী
ভক্তবৃন্দের প্রতি করুণা যেন উথলে ওঠে শ্রীৰামকৃষ্ণৰ। তিনি তাঁর হৃৎকঠে
বলতে থাকেন, “হাতে তেল মেখে কাঠাল ডাললে হাতে আঠা লাগে না।
চোর চোর যদি খেল বুড়ি ছুঁয়ে কেসলে আর ভয় নেই।...মনটি দুধের মত।
সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে যাবে। তাই
দুধকে নির্জনে মই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে মাখন করে মনরূপ
দুধ থেকে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন তোলা হ’ল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার
জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার
জলের উপর নির্দিষ্ট হয়ে ভাসবে।” শ্রীজগন্নাথ বস্তু, শ্রীৰামকৃষ্ণ বস্তু। যেমন
আকাশের জল ছাদ হতে বাঘের মুখ, হাতীর মুখের ভিতর দিয়ে বেরোয়,
তেমনি জগন্নাথের নৈবদ্যাদি স্মৃতিত হয় শ্রীৰামকৃষ্ণৰ মাধ্যমে। শ্রীৰামকৃষ্ণ
নিজমুখে বলেছিলেন, “অবতারণের মূখ দিয়ে তিনি নিজে কথা কন।”^{১৮}

ব্রাহ্মনেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছিলেন শ্রীৰামকৃষ্ণৰ সম্মুখে। ব্যাপকভাবে
সত্যাহ্বানকেই তিনি ব্রাহ্মধৰ্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ
বিবেকের তাড়নার আদি সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেও তৃপ্তি পাননি। তাঁর স্বতাবাহ্বান
ভক্তির প্রসবণ জ্ঞান বিচারের পাথরে চাপা পড়েছিল। শ্রীৰামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য ও
ঘটনাবিবর্তনে সেই প্রসবণ এখন মুক্তপ্রায়। বৈরাগ্যের প্রেরণায় তিনি
সিঁরেছিলেন গঙ্গাতে। নির্জনে কিছুদিন মাখন তুলন করেছেন। আকাশগঙ্গা

১৮ স্বামী জগদ্বানন্দ : শ্রীম-কথা (১ম খণ্ড), ১৩৪২ সাল, পৃঃ ১৪২

পাহাড়ে বোম্বের ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি গেকরার ধারণ করেছেন। সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ক্রম উত্তরণ দেখে অধ্যাপকবিক্রমী জীরাযকৃষ্ণ খুশী। বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়ে অন্তরের উদ্বেগ করে বলেন, “দেখ বিজয়ের এতদিন কোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।” বিজয়কৃষ্ণের সর্বদা সৈরিক চিহ্ন দেখে সহাত জীরাযকৃষ্ণ বলেন, “আজ-কাল এর (বিজয়ের) গেকরার উপর খুব অছুরাগ। লোকে কেবল কাপড় চাদর গেকরার করে। বিজয় কাপড়, চাদর, জামা মায় ভূতো জোড়াটাও পর্বত গেকরায় রাঙ্গিয়েছে। তা ভাল, একটা অবস্থা হয় যখন ঐক্য করতে ইচ্ছা হয়—গেকরার ছাড়া অন্য কিছু পরতে ইচ্ছা হয় না। গেকরার ত্যাগের চিহ্ন কিনা, তাই গেকরার সাধকে শ্রবণ করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের অন্ত সর্বদা ত্যাগে ব্রতী হয়েছে।”

রসময় জীরাযকৃষ্ণ—সে রস বিভিন্ন ধারায় নিঃসারিত হচ্ছে চতুর্দিকে। অধ্যাপকবিক্রমী বিস্মিত বিজয়কৃষ্ণকে তিনি সান্নিধ্য করেন, “বামের ঈশ্বর কর্ম করছেন তারা কলক। তোমার এখন সময় হয়েছে—সব ছেড়ে তুমি বলো ‘মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে’।” এই ভাবটি বিজয়কৃষ্ণের অছুরাগ-অভিসিক্ত হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করার জন্য জীরাযকৃষ্ণ তাঁর প্রাণমাতানো সুরেলা কণ্ঠে গাইতে থাকেন, ‘যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী জামা মাঝে। মন তুই ভাখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে’। ভক্তির আবহ পরিমণ্ডলকে মধুময় করে তোলে।* তিনি বিজয়কৃষ্ণকে উপদেশ করেন ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে লজ্জা যুগা ভয় প্রভৃতি অষ্টাংশ ত্যাগ করতে। খাটি নিষ্ঠা থেকে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়। তারপর হয় ভাব। ভাবতে বায়ু স্থির হয়। আগনি কুন্তক হয়। ভগবানের প্রেম চূর্ণত। প্রেমের উদয়ে লগ্ন তুল হয়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও তুল হয়ে যায়। এই সংগ্রসর জোতার কাছে বলদ প্রাণদ হয়ে ওঠে জীরাযকৃষ্ণের অভুলনীর কণ্ঠের মাধুর্য করণে। তিনি গান ধরেন—

সেদিন কবে বা হবে ?

হরি বলতে ধারা বেয়ে পড়বে (সেদিন কবে বা হবে ?)

জীরাযকৃষ্ণের বাক্যবৃত্তের প্রবাহ সকলকে স্তম্ভ করে রাখে। ইতিমধ্যে নিমন্ত্রিত আরও কয়েকজন ব্রাহ্মতত্ত্ব প্রবেশ করেন। তাঁদের কয়েকজন পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রজনীনাথ রায়। এক. এ. ও. বি. এ. পরীক্ষার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সরকারী অর্থদপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী

নেতা। উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ গ্রন্থ করে সম্মেলনস্থানের চেষ্টা করেন। জীভক্তগণ বৈঠকখানা ঘরের পূর্বদিকে চিকের আড়ালে বসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মণিবাবুর বিধবা কন্যা নন্দিনী। ভক্তিমতী নন্দিনী শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য। তাঁদেরও কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রন্থ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থ-সকলের সমাধান করে দেন। আলোচ্য-বিষয়ে ধারণা স্থম্পট ও দৃঢ় করে দেবার জন্য মাঝে মাঝে প্রেমভক্তির গান পরিবেশন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সৃষ্টি পড়ে নবাবগত রাজকর্মচারী পণ্ডিতদের উপর। তিনি বলতে থাকেন “বারা শুধু পণ্ডিত কিন্তু বাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমালে...কেউ ঐশ্বর্ঘ্যের—বিভব, মান, পদ, এই সবের—অহংকার করে। এ সব ছুই দিনের জন্ত; কিছুই সঙ্গে থাকে না। একটা গানে আছে—‘ভেবে দেখ মন কেউ কাক নর, মিছেভ্রম ভ্রমণে। তুলো না দক্ষিণাকালী বন্ধ হয়ে মারাজালে। ইত্যাদি।’” তিনি আরও বলতে থাকেন, “আর টাকার অহংকার করতে নেই।...ধনীর আবার তারে বাড়ি, তারে বাড়ি আছে। ...ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তাহলে ধনের অহংকার হয় না।”

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিছুকালের জন্য পাশের একটি ঘরে ব্রাহ্মভক্তদের সম্মুখে ‘রামচরিতমানস’ পাঠ ও ব্যাখ্যা করছিলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীকে একের পর এক কীর্তনের লহরী পরিবেশন করে চলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অমাহুযী শারীরিক ও মানসিক শক্তি দেখে মোহিত একজন ভক্ত লিখেছেন, “আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, দীর্ঘকাল নৃত্য করিয়া সকলে ক্লান্ত হইলেও প্রভুর ক্লাস্তি নাই। বরং অধিকতর উল্লাসে ভ্রাম্যাবিষয়ক মধুর গীতে সকলকেই মোহিত করেন। তাতে বোধ হ’ল, ভ’গবতী তনু ব্যতীত মানবদেহে একপ বস্তা ধারণে কদাচ সমর্থ হয় না।”^{১১} শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে পরিবেশন করেন কমলাকান্ত তট্টাচার্য রচিত গান—

“মজল আমার মন-ভ্রমরা ভ্রাম্যাপদ নীলকমলে।

যত বিষয়মধু তুচ্ছ হ’ল কাম্যাদি কুহুম সকলে।” ইত্যাদি

এরপরেই তিনি গান করেন নরেশচন্দ্রের বিখ্যাত কীর্তন—

“ভ্রাম্যাপদ আকাশেতে মন-বুড়িখান উড়তেছিল।

কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোষ্ঠা খেয়ে পড়ে গেল।”

ইত্যাদি

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, এ, পৃ: ৩৪৬

সকল কীর্তনীরা রলের বিভাব, অলঙ্কার, সঙ্গীতবিভাব আদি ক্রম অনুসরণ করে কীর্তনের প্রাণ যে আধ্যাত্মিকতা তাঁর উৎকর্ষতা ও পুষ্টিবিধান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহস্রাভি শিল্পবোধ ও স্বল্প কাব্যরস কীর্তনগানে প্রয়োজনমত আখর জুড়ে দিতে সাহায্য করেছিল। আখরের উদ্দেশ্য গীতার্থের বিস্তার করে রসসিক্ত শ্রোতার মনকে গভীরতর ভাবে আত্মত কর। রবীন্দ্রনাথ বসুর্খই (দিলীপ রায়কে) বলেছিলেন, ‘কীর্তনের আখর কথার তান ।’ আসরে নিজের কীর্তনে আখর জুড়তেন, তেমনি অস্ত্রের গানেও নিপুণভাবে আখর দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কীর্তনের গীতি-রীতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাছাড়াও তাঁর অসাধারণ স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল গুরুপরম্পরায় প্রচলিত আখরগুলি। উপযুক্ত আখরের সংযোগে ভাবের গাঢ়তা বৃদ্ধি পায়। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ ধরেন রামপ্রসাদের গান—

‘এসব ভ্রামা মায়ের খেলা
(বার মায়ার জিভুবন যিভোলা)
(মাপীর আশুভাবে শুশুলীলা ।)
নে যে আপনি কেশা, কর্তা কেশা,
কেশা হুটী চেলা ।’ ইত্যাদি

গায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ সুরের তরঙ্গে ভেসে চলেছেন। এবার তিনি রামপ্রসাদী গান “মন বেচারীর কি দোষ আছে, তারে কেন দোষী কর মিছে,” ইত্যাদি পরিবেশন করেন। এরপরের তাঁর স্বগীত গানটিও রামপ্রসাদী। গানের বাণীর প্রথমংশ “আমি ঐ খেদে খেদ করি। তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।” গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতগুণ লক্ষ্যে শ্রীম লিখেছেন যে, তাঁর ‘মধুরকণ্ঠ’, ‘গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠ’, ‘শ্রেমরসাত্ত্বিন্দিত কণ্ঠ’, সকলেই তাঁর গানের সঙ্গশংস প্রোত। তিনি ভ্রামা-সঙ্গীতের ভাবুক গায়ক। বেশী গাইতেন রামপ্রসাদ, তারপরেই কমলাকান্ত। নিপুণ গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ মূল গানের সুর ও রীতি বজায় রেখেই গাইতেন।

এখানেই গানের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এই গানের আসরে ঘটে গেছে একটি ছোট্ট মধুর ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃস্নেহের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তাঁর ‘দরদী’ বাবুরাম স্খার কাতর, শিশুস্বর পীড়িত। তিনি নিজে থাকেন বলে কয়েকটি সন্দেশ ও জল আনিরে নেন। নিজে কণামাত্র গ্রহণ করেন, অধিকাংশ দেন বাবুরামকে। বাবুরামকে খাইয়ে তিনি আবার গান গাইতে থাকেন।

স্বাক্ষর অঙ্ককার নেমেছে অনেকক্ষণ। রাজি প্রায় নয়টা। নীচের উঠানে লাহা উপাসনা হবে। বিজয়রত্ন উপাসনা পরিচালনা করবেন। বিজয়রত্ন উপস্থিত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। বিজয়রত্নকে দেখে রক্তরসিক শ্রীরামকৃষ্ণ বলে ওঠেন, “বিজয়ের আজকাল সন্ধ্যাবেলা বিশেষ আনন্দ। কিন্তু সে যখন নাচে তখন আমার ডর হয় পাছে ছানপুছ উল্টে যায়।” সকলে হেসে ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন তাঁর প্রায়াকলের অল্পরূপ একটি ঘটনা। বিজয়রত্ন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে প্রসন্নমনে আশীর্বাদ করেন, ‘ও শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি হউক তোমার।’ আচার্য বিজয়রত্ন ও অন্যান্য ভক্তেরা উপাসনার অন্ত নীচে যান। এমিকে শ্রীরামকৃষ্ণকে আহ্বারের জন্য অন্তরমহলে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনামূলে উপস্থিত হন। কিছুক্ষণের জন্য সকলের সঙ্গে একাসনে বসেন। দশ-পনেরো মিনিট পরে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সভামূল ভাগ করেন। রাজি দশটা, উত্তীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেবরের উদ্দেশ্যে খাড়া করেন। মোজা, গরম জামা ও কানঢাকা টুপি পরেছেন তিনি। রাজ্য হিম লাগতে পারে। ঘোড়ার গাড়ী চলতে থাকে। রামকৃষ্ণ-মধুভাওর রস সঞ্চিত হয়ে থাকে ভক্তসকলের হৃদয়কূটরে। যশি মন্ডিকের গৃহ-আত্মনা ভক্তজনের স্বগ্রকমে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে। উৎসবমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সামগ্রিক মূল্যায়ন করে শ্রীম’র সঙ্গে সমকর্মে বলতে হয়, “ভক্তিহুজে লাকার বাদী, নিরাকারবাদী এক হয়; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এক হয়, চারি বর্ণ এক হয়। ভক্তিহুই জয়। ধন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তোমারই জয়।”^{২০}

অবতারকে বুঝতে ‘অল্পভব হওয়া চাই—প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।’ অবতারের কলমির দলের অন্তর্ভুক্ত বাবুরাম। সহজেই তাঁর প্রত্যক্ষ হয়, জ্ঞান হয়। দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের পুত-সাহচর্যে দরদী হিসাবে লীলার রসান্বাদন করেছেন। উৎসবপ্রাঙ্গণে সংকীর্ণনানন্দের ভাবোন্মাসের মধ্যে ‘প্রোজ্জলভক্তি-পটাবৃত্ত’ শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবিড়ভাবে দেখবার বুঝবার সুবিধা পেয়েছেন। শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন নূতন ভাবগন্ধার অন্ততম বাহক হিসাবে। ভাবপ্রচারক স্বামী প্রেমানন্দ বলতেন, ‘আমি যেখানে বাব সেখানে বাহিরে ঠাকুর বলাব না, বাহুরের জগরে বলাব।’ তিনি অগণিত বাহুরের বিশেষতঃ স্বকনের জগরমন্ডিরে নূতন যুগের আদর্শদীপ প্রতিস্থাপিত করেছিলেন, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে বাহুরকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

লীলাপুরুষ ত্রিভুজক অগ্রকট হবার পরেও মণি মল্লিক দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। আলমবাজার ঘাটে থাকাকালীন বাবুরাম ওখা প্রেমানন্দের সঙ্গে মণি মল্লিকের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সাক্ষাৎ হয়েছিল ‘তটিনী কুটারে’, গঙ্গার ধারে মণি মল্লিকের বাগান বাড়ীতে, তাঁর বৈঠকখানা ঘরেতে। সেদিন প্রেমানন্দের সঙ্গে মণিবাবুর অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে মণিবাবু বলেছিলেন, “আমরা সংসারী লোক—ভোগবিলাসে থাকি, আমাদের আবার মুক্তি কোথায় হবে? আর আপনারা সাধু-সন্ন্যাসী—যেন কামধেনু, সামান্য জটাবুড়ি খেয়ে অমৃত-দ্রব্য দিয়ে থাকেন।” মণিবাবু যথার্থই বলেছিলেন প্রেমানন্দ প্রমুখ কামধেনু বর্তমানকালের মানুষের সকল প্রার্থনা মঙ্গুর করতে সমর্থ। রামকৃষ্ণ ভাবধারা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে সকল সমস্যা সমাধানে সক্ষম।

কীৰ্তনে মৰ্তমে শ্রীৰামকৃষ্ণ

শ্রীচৈতন্য, বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, নরোত্তমদাসের হরিভক্তিরসসিক্ত বঙ্গ-দেশ, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, দেওয়ান নন্দকুমারের শক্তিসাধনার পীঠস্থান এই দেশ। এই পীঠস্থানকে স্ফুৰ্ণা স্ফুৰ্ণা করে প্রবাহিত গতিত-পাবন কলকলনাদিনী গঙ্গা। এর পূর্বতীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। রাণী রাসমণি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জগন্নাথ। ভবতারিণীর নবরত্ন মন্দির। পাষণ-যুক্তিতে চিন্নয়ী জগন্নাথাত্মার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন পরমহংস শ্রীৰামকৃষ্ণ। মাহুঘের সাধ্যাতীত বিচিঞ্জ সাধনভজন করে তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞান পূর্ণায়ত্ত্ব করছেন। সাধক পণ্ডিতবর্গ শ্রীৰামকৃষ্ণবপুতে আবিষ্কার করেন ঐশ্বরিক শক্তির অবতরণ। তাঁর মধ্যে কেউ দেখেছেন, “নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্তের আবির্ভাব”, কেউ বলেছেন, “সাক্ষাৎ কালীর জীবন্ত বিগ্রহ”, কেউ স্তুতি করেছেন, “সর্বদেব-দেবীস্বরূপ” বলে। একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে সঙ্কণ্ঠের অশ্রুতপূর্ব ক্ষুরণ ঘটেছে শ্রীৰামকৃষ্ণের মধ্যে। পূর্ণপ্রকাশ, জ্ঞানসুৰ্য ও ভক্তিচন্দ্ৰের সহাবস্থানে শ্রীৰামকৃষ্ণের সত্তা দিব্যোজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত। তাঁর জীবন ও বাণীর তাৎপৰ্য অনুধাবন করে ইংলণ্ডের মোক্ষমূলার তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন ‘একজন বথার্থ মহাত্মা’। ফরাসী রোমঁ। রোলঁ। বললেন, “চৈতন্তভক্তির একটি কুসুমিত শাখা”। নয়ানিশ্চিতদের অন্ততম প্রতিনিধি প্রভাপচন্দ্র মজুমদারের চোখে শ্রীৰামকৃষ্ণ ছিলেন, “full of soul, full of the reality of religions, full of joy, full of blessed purity”.

অপরপক্ষে শ্রীৰামকৃষ্ণের নিজমুখে শুনি : “এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি,—আর একটি ভক্ত হয়ে আছে।...কারোই বা বোলবো, কেই বা বুঝবে! তিনি মাহুঘ হয়ে, অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়...বাউলের দল হঠাৎ এলো;—নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো—গেলো, কেউ চিনলে না”। তিনি আপনমনে গান করেন, “তারে কেউ চিনলি না রে! শুবে পাগলের বেশে কিরছে জীবের ঘরে ঘরে”। অবতারতত্ত্বের অবধারণ কঠিন, কারণ মাহুঘের বুদ্ধি-

বিচারের পরিস্থিতিতে এটা ধরা পড়ে না। এই তথ্য উপমা দিয়ে বোঝান যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “অহুভব হওয়া চাই—প্রত্যক হওয়া চাই”।

উর্গনাভ নিজের ভৈরী জ্বালের মধ্যে অবস্থান করে। তেমনি “ঋং ক্রীড়সে নিজ-বিনির্মিত মোহজালে, নাট্যে যথা বিরহতে স্বকৃতে নটো বৈ”।^১ স্বরচিত নাটকে নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে আনন্দ পান, সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন, কিন্তু নিজে স্বরূপে থাকেন আবিষ্কৃত, তাঁর স্বরূপ থাকে অবিস্মৃত। জগৎসংসারে জগৎস্রাব্যের লীলাবিলাসও অহরূপ। তাঁর শক্তির ঐশ্বর্যই শ্রীরামকৃষ্ণ। অবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বানুশ্রুত ঐক্যাহুত্বিতে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান-অজ্ঞানের চৌহদ্দি পেরিয়ে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থায় ভাবমুখে থাকেন, ‘কাঁচা আমি’ ত্যাগ করে ‘বিজ্ঞান আমি’ ‘পাকা আমি’ রাখেন রসান্বাদনের জন্ত, লোককল্যাণের প্রয়োজনে। চির-আনন্দময় বিজ্ঞানীর “তাকে চিন্তা করে অথও মন লয় হলেও আনন্দ, আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।”^২ অবতারের নরদেহে ভগবৎ-ভাবৈশ্বর্য উপছে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “এ (দেহ) যেন কাঁচের লষ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে”। কীর্তন গান নৃত্য চিত্রাঙ্কন মূর্তিগড়ন যাবতীয় শিল্পচর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞানী যেন ‘দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলেন আপনারে।” “তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানী ও শিল্পীর যৌগাবস্থান। বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে—তাই তো এরূপ এলান ভাব।”^৩ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে সুসজ্জিত জগৎমালাকে চক্ষু মেলেও দর্শন করেন, আর চক্ষু মুদেও দেখেন যে- তিনিই সব হয়েছেন। আবার এক অবস্থায় অথও মন-বুদ্ধিহারা হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ সম্যক্ বৃত্তে না পারলেও তাঁর অসাধারণ জীবন ও কথামৃত রাজধানী কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

১৮৩৬ শকাব্দের জীবন-পূর্ণিমা সংখ্যায় “ধর্মপ্রচারক” লিখল: “মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন কাননের একটি সুগন্ধি পুষ্প।...ইনি বনের ফুল বনে ফুটিয়াই বনদেবতার জোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধলাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন।...লোকে যে সময়ে ভবিষ্য-জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্ত বিজ্ঞানকে যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিয়া থাকে,

১ দেবী ভগবত, ১৭৭৪২ ২ কথামৃত, ৩১৩৩ ৩ কথামৃত, ৩১৩২

সে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্ত আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া বিগলিত হইতেন।...সামক কেবল চন্দন, জবা, গন্ধাজল, নৈবেদ্য মিসাই যারের পূজা করিতেন না। কিন্তু মন খুলিয়া প্রত্যেক জলবিন্দুর সহিত, প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিষদলের সহিত অকণ্ট ভক্তি মাথাইয়া চরণে দান করিতেন, রাধা চরণে রাধা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎসল ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন।...রিপূমদমর্দিনী রত্নিনী কদ্রাণীর নৃত্যতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণমন নাচিয়া উঠিল।...ভক্ত বাইরে পাগল হইলেন, অন্তরে অচল অটল হইয়া মহামায়ার মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।...ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্বে পরমহংস। আশ্চর্য ইহার ভাব, আশ্চর্য ইহার প্রকৃতি; তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থবিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেই অধ্যয়নের উপযোগী।”

জনপ্রিয় পত্রিকা ‘স্বলভ সমাচার’, ১৮৮১ খ্রিঃ ৩০শে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশ করণ : “তিনি ছেলের মত সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মত করেন, তিনি কখনও হরি বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ছায় নৃত্য করেন। কখনও মাকালী বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্তধর্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখনও কখনও পুরাতন বোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া বান।...সম্রাতি তিনি কলিকাতার এক সম্রাট ভক্তলোকের বাটীতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই হরিনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন।”

সুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বৈচিত্র্যই নয়, তাঁকে কেন্দ্র করে যে ভাবতরঙ্গের কল্লোল রাজধানী কলিকাতাকে মোহিত করেছিল তার মনোরম চিত্র ফুটে উঠেছে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। ‘ধর্মমঞ্চ’ পত্রিকায় ১৮০১ শকাব্দ ১৬ই আশ্বিনের সংবাদে প্রকাশিত হয়, “বিগত ৩১ ভাদ্র বেলঘরিয়াস্থ ভগোবনে ২৫।৩০ জন ব্রাহ্ম সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বর প্রেম ও মত্ততা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন স্বর্গীয় মধুর ভাব আর কাহার জীবনে দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে,

‘কচিৎসদ্যচ্যুতচিত্তঃ। কচিৎসদ্য নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ,
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যস্থূলয়ন্তঃ। ভবন্তিভূকীঃ পরমেত্য নিবৃত্তাঃ’।

ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিত্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্ত করেন, কখন আনন্দিত হইলেন, কখন আলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁদের নাম গান করেন, কখনও তাঁহার গুণকীর্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন করে। পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্নত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিময় হইয়া অল্প পুত্তলিকার ভায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, স্মরাসত্তের ভায় শিশুর ভায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রেমভক্ততার অবস্থায় কত গভীর গৃঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।” শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত ঈশ্বরপ্রেমিকের লক্ষণগুলির জীবন্ত স্পষ্ট উদাহরণ দেখে ব্রাহ্মনেতা-গণ বিস্মিত হন, প্রজ্ঞাপূত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশংসা জানান।

১৩ই কার্তিক, ১৮০১ শকাব্দ শারদীয়া পূর্ণিমা। ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বজরা, ডাওয়াগিয়া ও ডিক্কিতে করে প্রায় আশিজন ব্রাহ্ম ভক্তসহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলনে মধুর ভাবের তূফান ছোটে, এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের বজরা ভক্ত-বাজীদের নিয়ে নানা রঙ্গেভঙ্গে ভবসাগরের পথে অগ্রসর হয়। ঠান্দনীঘাটে কেশবচন্দ্র উপাসনা পরিচালনা করেন। প্রার্থনার পর জৈলোক্যনাথ একটি নবরচিত মাতৃভাবের কীর্তনগান পরিবেশন করেন। “তাহাতে পরমহংস মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকল লোককে মত্ত করিয়া তোলেন। ‘মধুর হরিনাম নিয়ে রে জীব যদি স্থখে থাকবি আর’। স্বমধুর স্বরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না।” ৪

বিভিন্ন গোষ্ঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মাধুর্যমণ্ডিত ভাবমূর্তির আন্তরিক স্বপরিচু-
 হয়ে উঠেছিল New Dispensation পত্রিকার ৮ই জাহ্নবী-সংখ্যায়।
 শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের মিলনে উৎসারিত রসমাধুর্যের উল্লেখ করে পত্রিকাটি
 লিখেছে, “We have invariably found on such occasions an
 outburst of living devotional enthusiasm—a mighty wave of
 rapturous excitement—sweeping over the whole audience.

৪ স্বর্গভঙ্গ পত্রিকা

The effect is wonderful. Theological difference are lost in the surging wave of love and rapture". রামকৃষ্ণ কেনোমেননের আবির্ভাবে কলিকাতা সহরবাসীর একাংশ ভগবৎনামে মাতোয়ারা, ভগবদ্ভাবে তাদের নরনে প্রেমধারা, বিভিন্ন ভাবরসে সকল মাহুধই আত্মহারা। সকলেই অহুভব করেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ, দুর্বোধ্য সে আকর্ষণ।

রসনচৌকির একজন পৌ ধরে থাকে অপর একজন সাত ফৌকর দিগে নানা রাগিণী বাজায়। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যে ভারতীয় মহাসঙ্গীত (symphony) উদ্ভূত হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত ধারাটি অধ্যাত্মবিজ্ঞানান্ত্রিত এবং সেটিকে অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পসাধনা বিচিত্রভঙ্গীতে উৎসারিত হয়েছিল, মাহুধ মুগ্ধ হয়েছিল। পঙ্কজের মত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মূল লোকচক্রর অন্তরালে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গভীরে, কিছু সেই উৎস থেকে উৎসারিত রসে পরিপুষ্ট তাঁর জীবনলতা পত্র-পুষ্প, কোরক-কিশলয়ের শোভা ও সৌরভ বিস্তার করেছিল; চিত্রশিল্প, চাক ও 'কারুকলা, সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য প্রভৃতি শিল্পের বিচিত্র সুষমা তাঁর সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। অধ্যাত্ম প্রাণরসনা থেকে উৎসারিত তাঁর শিল্পচেতনা প্রসারিত হয়েছিল তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে, মনোহর দেহসঞ্চালনে, মনোমোহনকারী অভিনয়-পটুতায়। সামগ্রিক বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একটি অল্পমম শিল্পকৃতি; শিল্পের সৃষিত গঠন ছন্দ-শৃঙ্খলার বাধনে পড়েও অপরিমিত বিচিত্র আনন্দফাগ চারিদিকে বিতরণ করেছে। তাঁর পূর্ণায়ত শিল্পীসত্তা গানে, সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যে, পটচিত্রণে, মূর্তিগড়নে যে-নৈপুণ্যের সাক্ষী রেখেছে তা প্রকরণগত বা টেকনিক্যাল পরিমাপে কখনও কোথাও সীমিত হলেও মূল রসসঞ্চারে অমিত অসীম। আমরা ঐতরের স্বাক্ষরে শুনি, "আত্ম সংস্কৃতিবাব গিল্লানি ছন্দোময়ং বা ঐতৈর্বজমান আত্মানং সংস্কৃততে।" শিল্প ও সংস্কৃতির সামুদ্র্য রামকৃষ্ণজীবনে স্বাভাবিকভাবে পরবিভ হয়েছিল, মনোরম জীবন-ঐশ্বর্যের মাধুর্যে সকলকে আনন্দরসে রসায়িত করেছিল। গিরিআশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, "পরমহংসদেব বলিভেন, বাহার শিল্প-রসবোধ নাই—সে কোমল ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে পৌছতে পারে না।" ৫ অধ্যাত্মস্বভাসজ্ঞাত শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি শিল্পবোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল রূপে-

৫ গিরিআশঙ্কর রায়চৌধুরী : স্বামী বিবেকানন্দ ও উনবিংশ শতকের বাঙালি, পৃ: ৩৩৪

রঙে সুরে-বাগীতে নৃত্যে। তাঁর শিল্পগুরিত জীবনের শিল্পচেতনা কিন্তু তাঁর ধর্মচেতনার পরিপূরক। এই শিল্পচেতনা দেশ-কালের সীমানা পার হয়ে বিরাটের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে কেলেছিল, ভূমি থেকে ভূমাজয়ী হয়েছিল।

জাহানাবাদের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর। পল্লীবাংলার স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশে সদানন্দ বালক সহজাত শিল্পবোধকে বিকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সহজেই। রামবাজা, কৃষ্ণবাজা, রামরসায়ন, চণ্ডীর গান, হরিকথা ইত্যাদি ছাড়াও গ্রামের তিন দল বাজা, একদল বাউল, দু'একদল কবি, বালকশিল্পীকে লোকসংস্কৃতির রসান্বাদন ও সঞ্চয়নে সাহায্য করেছিল। তাঁর খেলাধুলার সাথী যুগী, কামার, জেলে মালা সকলের সঙ্গে তিনি সরলপ্রাণে মিশেছিলেন। তাঁর অকপট ভালবাসার চম্ভাতপতলে ও সদাচরণের প্রাক্ষণে গ্রামের উচ্চাচ সকল জাতের ও সকল বয়সের মানুষ স্থান পেয়েছিল। আবাল্য বিভিন্নধরনের মানুষের সাহচর্যের ফলে তিনি সহজেই গণচেতনার অন্তরমহলে অঙ্গপ্রবেশ করেছিলেন। কলে কি তাঁর ধর্মজীবন, কি শিল্পসাধন, তাঁর যাবতীয় কার্যকলাপ ছিল শ্রীতি ও সহানুভূতি মাথানো এবং জগতের কল্যাণাভিমুখী। সাহিত্যিক রোহাঁ রোলঁর ভাবনার সঙ্গে মিল রেখে বলতে হয় প্রোটিয়াসের মত শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা যখন বা দেখত কল্পনা করত তাই মুহূর্তে নিজের মধ্যে রূপায়িত হত। শিল্প ও প্রেমের চিহ্ন এই রূপগ্রহণের শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল অপরিমিত, এই শক্তির সাহায্যে তিনি আটশতাব্দি বিশ্বের সকল মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, বিশ্বের সকল সত্তাকে আপনাত্মক করে নিতে পেয়েছিলেন।

বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, দশ-এগার বছরের সময়, বিশালাকী দেখতে গিরে-মাঠের উপর কি দেখলাম। সেইদিন থেকে আরেকরকম হয়ে গেলাম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলাম।” লোকবুদ্ধির অতীত পথ ও পদ্ধতিতে বালকের অধ্যাত্মজীবনের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি হতে থাকে, এবং তার অঙ্গ-রূপে তাঁর শিল্পচেতনা সজীব চিত্র নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। আত্মিক, ভাবসম্পদ, গভীরতা ও কলাসৌন্দর্যের সমাবেশে তাঁর অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সাধনার পরিমণ্ডল বিচিত্র আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

বিজ্ঞা বৃংহণনাম্; বৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকারকদের মধ্যে বিজ্ঞা শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞা বিজ্ঞার্থীর পুষ্টিবিধান করে। পরাবিজ্ঞা ও অপরাবিজ্ঞার বোঝ-চর্চা ও চর্চা

বালক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পরিষ্কৃট। গ্রামের পাঠশালার পুঁথিপাতার পাঠ্যে
চাইতে বেশী আদরণীয় ছিল যাত্রা, গান, নাচ ইত্যাদির অংশীলন। পাঠশালার
শুক্মহাসনের আদেশে শিশুশিল্পী গদাধর।

আপনি করেন গান মুখে বাজ বাজে।

তুই হাতে দেন ভাল পদধর নাচে।

গীতবাছ-নৃত্য তাঁর অতি পরিপাটি।

মাবে মাবে সং দেওয়া কিছু নাহি ক্রটি।

পাঠশালা হৈল ঠিক রত্নশালা মত।

নিভাপ্রায় গদায়ের যাত্রা তথা হ'ত ॥৬

কিশোর গদাধর লোকালয়ের ভীড় এড়িয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে মিলিত হতেন
গোষ্ঠে, মানিকরাজার আমবাগানে। সেখানে সাথীদের নিয়ে কিশোরশিল্পী
মাধুর-গান করতেন।

অতি-পুলকিত অঙ্গ গদাই আনন্দে।

কাহারে করেন সাথী কৈলা কারে বৃন্দে ॥

আপনি হৈলা নিজে রাই-কমলিনী।

বিদগ্ধ বিরহগান ধরিল তখনি ॥৭

তাঁর গ্রামজীবনের স্মৃতিচয়ন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “ওদেশে
ছেলেবেলায় আমার পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনত।
আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেইসব দেখত শু শুনত।...চিৎর বেশ
আঁকতে পারতুম; আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।...কোনখানে
স্বায়ংপ্রণীত কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম।...তাদের কথা, স্মরণ
নকল করতুম।...আমি এসব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক এক
যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীস-
দমন ৮ যাত্রার দলে ছিলাম।”^৯ এই তথ্যেরই যেন আবৃত্তি করেছেন বামী
সারদানন্দ, তিনি লিখেছেন, “প্রতিমাগঠন, দেবচিহ্নাদিলিখন, অগরের

৬ অক্ষয়কুমার সেন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১৮

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ১৪

৮ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রাকে সাধারণভাবে এই নামে অভিহিত করা
হত।

৯ কথাযুত, ৫০৬২

হাবভাব অহুঙ্করণ, সঙ্কীর্ণ, সংকীর্ণন, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আয়ত্তীকরণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গভীর অহুঙ্কবে এ বালকের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত।”^{১০}

কৈশোর-উত্তীর্ণকালেও গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়ে বই কমে না। তাঁর অতুলনীয় মধুর সঙ্কীর্ণ আহিরীটোলার নাথেরবাগান, কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরের সকল মানুষের নিকট ছিল আকর্ষণীয়। তাঁর বিয়ের আট-নয় মাস পরে ‘নববধূগমন’ উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছিলেন জয়রাম-বাটাতে। তিনি নিজমুখে বলেছেন, “খন্ডরবাড়ী গেলাম। সেখানে খুব সঙ্কীর্ণন। নকর, দিগম্বর বাঁড়ুয়ের বাপ এরা সব এলো। খুব সঙ্কীর্ণন।” অহুঙ্করণভাবে তাঁর সাধনকালে শ্রীরাধিকা ও বৃন্দার ভূমিকায় ভেদধারণ, গীত ও নৃত্য চর্চা তাঁর শিল্পাহরণের ও কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করব, তাঁর সমুখে কথিত একটি রসাল অভিজ্ঞতা। তিনি বলেছেন, “আমি একজন কীর্ণনীরাকে মেয়ে-কীর্ণনীর চণ্ড, সব দেখিয়েছিলাম। সে বললে, আপনাতঃ এ-সব ঠিক ঠিক।” শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্নমুখী শিল্পকলার চর্চার মধ্যে বিচ্ছুরিত হ’ত তাঁর অধ্যাত্মজীবনের ঐশ্বর্য। তাঁর বাবতীর শিল্পসাধনার ও কার্যকলাপের ফাঁক দিয়ে তাঁর ক্রমশঃ-প্রকাশিত দিব্যজীবনের ঐশ্বর্যই উকিঝুঁকি মারত। সেই কারণেই বোধ করি তাঁর শিল্পসাধনা একটি অশ্রুতপূর্ব সৌন্দর্য-মাধুর্য সৃষ্টি করেছিল।

ভারতীয় ললিতকলার সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যে গূঢ় সম্পর্ক, তা বিবিধ মাধ্যমে রঙ্গে ভঙ্গে প্রকটিত হয়েছে শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। শিল্পী তাঁর উপলব্ধ অখণ্ডসত্তার অনন্তবৈচিত্র্যকে নবনবরূপে আধাদন করতে চান। সঙ্কীর্ণ নৃত্যনাট্য প্রভৃতি তাঁর কাছে অবসর বিনোদনের উপাদানমাত্র নয়, তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত। শিল্পকূলনী অধ্যাত্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের মন শিল্পকলার সঙ্গীমরূপ ও ভাবের আধিন। অতিক্রম করে অসীমের অভিমুখে শাবিত। ফলে শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাকৃত আচার-আচরণের আড়াল ভেদ করে অলৌকিক বিস্তার ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত হত বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে। রসবোদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণের বাবতীর শিল্পভাবনা ভগবতাভিমুখীন, কিন্তু যেখানেই দেখেছেন রসাত্তাব বা অসঙ্গতি বা কৃত্রিমতা সেখানে তিনি কৌতুক করেছেন।

বিজ্ঞানী রামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে ‘আনন্দাচ্ছ্যেব ধর্ম্মিনি তুতানি জায়ন্তে।

১০. স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ, পৃ: ৩২১

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রসক্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দচৈতন্তই চরার বিধে অহুস্ত্যত। এই বিশ্বমালঙ্কর আনন্দমলয়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি স্তম্ভর দোলায়মান স্বর্ণলতা। তিনি প্রত্যক্ষ অহুস্তব করেন 'একস্তথা সর্বভূতাস্তরাষ্ট্রা, রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিস্ত'। তিনি নিজমুখে বলেন, "যেন অসংখ্য জলের ভূড়ভূড়ি—জলের বিশ্ব। আমরা দেখছি যেন অসংখ্য বাড়ি বাড়ি।...নানানুসল পাগড়ি থাক থাক তাও দেখেছি!—ছোট বিশ্ব, বড় বিশ্ব"। ১১ সময়স চৈতন্তে আরিত বিশ্বতুবন আর তার মাঝখানে সর্বানন্দী শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পস্থিতিতে যেতে উঠেছেন।

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষণীয় তাঁর স্তম্ভ রসাবাদনের মধ্যেও। একজন অভিনেতার নিকটে তিনি মস্তব্য করেন, "তোমার অভিনয়টি বেশ হয়েছে। কেউ যদি গাইতে, বাজাতে, নাচতে কি কোন একটি বিজ্ঞাতে ভাল হয়, সে যদি চেঁচা করে শীত্ৰই ঈশ্বরলাভ করবে"। বিজ্ঞানসন্মত বাজায় শিল্পের কলাকৌশলের সঙ্গে অন্তর্নিহিত ভাবের সামঞ্জস্য দেখে তিনি মস্তব্য করেন, "দেখলাম—ভাল মান গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণই এই বাজাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে বাজা করছেন"। ঠারে চৈতন্তলীলা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য, "আগল নকল এক দেখলাম" খুবই তাৎপর্যবহ। চৈতন্ত-লীলার "কেশব কুরু করুণা দীনে..." গানটি শুনে তিনি গিরিশচন্দ্রকে বলেন, গান ও অভ্যন্ত গানের সহকারী বাস্তব শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "আহা কি গান!—কেমন বেহালা!—কেমন বাজনা!" আবার তাদের ঐক্যতান বাজনা শুনে বলছেন, "বা! কি চমৎকার!" মহানট গিরিশচন্দ্র বাজা-খিয়েটার সব ত্যাগ করতে চাইলেন একবার। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেন, "না না ও থাক—ওতে লোকশিক্ষা হবে।" তাঁর অনবত্ত উদাহরণ দিয়ে বলেন, "না গো কর্ণ ভালো। জমি পাট করা হলে যা কইবে তাই জন্মাবে"। সে-দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি নীলকণ্ঠকে বলেন, "তোমার সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্ত। অষ্টপাশ। তা সব যায় না। দু-একটা পাশ রেখে দেন—লোকশিক্ষার জন্ত। তুমি এই বাজাটি করছো, তোমার ভক্তি দেখে কতলোকের উপকার হচ্ছে"। রসবোধে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বাবতীয় শিল্পকার্য ভগবতভাবাহুরঞ্জিত। তিনি নিপুণ আত্মুলের মোহনমার্শে দেবদেবীর মূর্তি গড়েছেন, তুলির টানে রূপ-

অল্পের মধ্যে মারাজাল সৃষ্টি করেছেন, নাট্যভাবসমৃদ্ধ গীতিকাব্যমূলত কীর্তন-
গানে ও সংকীৰ্তনের নৃত্যে আনন্দলোক সৃষ্টি করেছেন।

বাক্সা, কথকতা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষপ্রীতির একটি কারণ।
এসকলের মাধ্যমে সম্ভব হয় জনগণের সঙ্গে একাত্মতালাভ। রত্নমন্ডের আসরে
জনসমাগম দেখে রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে
উদ্বীপনা হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।”

যেন দিগদিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে, রহস্যঘন তার রূপ, দুর্বোধ্য তার
বরূপ। সম্মুখে অজ্ঞান অবিচার পাঁচিল, সেকারণে মাঠ দেখা যাচ্ছে না,
একাধারে শিল্পী ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি ফোকর, তাঁর ভিতর
দিয়ে সব দেখা যায়, দিগদিগন্তব্যাপী প্রান্তরের রহস্য সহজে উন্মোচিত হয়।
শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবিধ নিরুসাধনার মধ্যে কীর্তন ও নর্তনে তাঁর ভূমিকা এই
দিগদর্শনের পক্ষে বোধ করি সর্বোত্তম। কীর্তনে ভাবস্থ সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের
মন একখণ্ড শিলার সমুদ্রে পতনের মত অমৃতচৈতন্যে একাত্ম হয়ে যায়।
শাস্ত্রকার বলেন, “বজ্রজ্ঞান্য মন্তো ভবতি স্তম্বো ভবতি আশ্রয়ামো ভবতি।”
দিব্য আনন্দোচ্ছ্বাস বধন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে, সেসময়ে
তাকে দেখে উপলব্ধি হয় রোমঁ। রোমঁর উক্তির তাৎপৰ্য : “দিব্য নগরদুর্গের
সকল দিকই রামকৃষ্ণ জয় করিলেন। এবং যিনি ভগবানকে জয় করেন, তিনি
ভগবৎ প্রকৃতির অংশও গ্রহণ করেন।” ১২ কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে জগৎ-রত্নমন্ডে
তাঁর যাবতীয় জিন্নাকলাপ লীলাবিলাস বৈ ত নয়।

ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন জনপ্রিয় সাধনাদি। নারদ বলেন, ‘অব্যবৃত্ত ভজনাৎ’
—নিরবচ্ছিন্ন ভগবানের ভজনাধারা পরাভক্তিলাভ হয়। তিনি আরও
বলেন, “লোকোহপি ভগবদ্গুণপ্রবণকীর্তনাৎ”, অর্থাৎ সংসারে থেকেও
ভগবানের গুণপ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভক্তিলাভ হয়। অনন্তচিন্ত সাধকের
নামায়ত্ত-সাধনের ফল সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত বলেন, “নামের ফলে কৃষ্ণপদে
মন উপজয়।” ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য, কখনও না কখনও এর ফল
হবেই হবে। প্রায়োগিক শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু সাবধান করে বলেছেন, “নামের
খুব মাহাত্ম্য আছে বটে, তবে অহরাস না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্ত প্রাণ
ব্যাকুল হওয়া দরকার।” যেখানে ঈশ্বরের আন্তরিক কথা হয়, ব্যাকুলতার

১২ রোমঁ। রোমঁ।: রামকৃষ্ণের জীবন, অহুবাচক স্ববি দাস, ওয় সঃ

পৃঃ ৩৩

সঙ্গে নাম হয়, সেখানে ঈশ্বরবির্ভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণও অঙ্গীকার করেছেন ভক্তবর নারদের নিকট “মরাম গায়তি যজ্ঞ তজ্জ তিষ্ঠামি নারদ।”

কীর্তন বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ। “নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।” উচ্চভাষণ সম্যক্ তাল ও যোগ্য রাগরাগিণী সম্বিভ হবে। কীর্তন দুই প্রকার: নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। নামকীর্তনে শ্রীভগবানের নাম ও রূপার বিবৃতি, আর লীলাকীর্তনে হরির রূপ গুণ ও ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্ত। বখাবণ তাল প্রয়োগ, বিশুদ্ধ স্বর ও বিবিধ রাগরাগিণীর দ্বারা গ্রথিত বাণীসমূহের প্রস্রবণ। কীর্তন ভাবপ্রধান সঙ্গীত। ভগবৎ ধ্যান-ধারণাই তার মুখ্য লক্ষ্য।

সপার্বদ শ্রীচৈতন্য নামসংকীর্তনের প্রবর্তন করেন। বিপুল ও দুর্দম তার প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে হিরোল তুলিয়াছিল সে একটা শাদ্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মাহুদের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল।...বাঁধন ভাঙিল—সেই বাঁধন বস্ত্রত: প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্ভব।...তখন সংগীত এমন সকল স্বর ধ্বজিতে লাগিল বাহা হৃদয়বেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়”।^{১৩} ভাবের রসের দিকেই কীর্তনের বোঁক, রাগরাগিণীর রূপ-প্রকাশের দিকে মন নাই। কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত। প্রকৃতগণকে এখানে স্বর ও ভাবের মধ্যে মনোহর অর্ধনারীশ্বর-যোগঘটেছে।

বিভিন্ন রাগরাগিণীতে নানা ছন্দে তালে কীর্তন গাওয়া হয়। সঙ্গে বাজে খোল করতাল বাঁশি কঁাসির ঘণ্টা। কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত লয়ে সংকীর্তনের স্বর মুদারা উত্তীর্ণ হয়ে তারায় ছুটে যায়। গানের বাণী ও স্বরের ভাবে উদ্ভোষিত গায়ক ও শ্রোতা নৃত্যে যেতে ওঠেন। স্বন্দ রসের বিভাস ও স্বরলয়ের সঙ্গতি কীর্তনকে করে শ্রুতিমধুর। রসদ্বীপ-মুক্ত স্বকর্ষ স্বরজ ও তালমানবৃত্ত সঙ্গীতজ্ঞ রসের বিভাব, অহুভাব, সঞ্চারিতাব আদি ক্রম অহুসরণ করে কীর্তনকে নিখুঁত করেন, তার পুষ্টিসাধন করেন।

‘কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ। বখা—কথা, দোহা, আখর, তুক ও ছুট।’^{১৪} এর

১৩ রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৪ খণ্ড, পৃ: ৮২৭

১৪ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়: বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, সাহিত্য-সংসদ, পৃ: ৮৪

মধ্যে কীর্তনরসান্বাদনের প্রধান সহায় আখর। হুল গারেন প্রয়োজনমত অলঙ্কার বা আখর (অক্ষর) ছুঁড়ে দেন; উদ্দেশ্য সীমিত রাখা, রচয়িতার গৃহভাব সুরের রসধারার সিক্ত করে পরিবেশন করা। গায়কের কবিত্বশক্তি ও সুরতালের নৈপুণ্য সময় সময় হুল পদাবলী অপেক্ষা আখরকে অধিকতর প্রতিমধুর করে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে, কীর্তনের আখর কথার তান। আখর শুধুমাত্র পদের ব্যাখ্যান নয়, পদে অন্তর্ভুক্ত কথাও আখরে প্রকাশ পায়। সেদিক হতে আখর হচ্ছে পদের ব্যাঙ্গনা।

ছন্দ নানাবৈচিত্র্যে মুকুলিত, তাল নানারক্কে প্রকাশিত। কীর্তনে বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে গায়ক জ্যোতার মনের পদ্যের দীর্ঘসময় ধরে বিষয়বস্তুটি উপস্থাপিত করেন। বাস্তব ক্রমে বিস্তারলাভ করে গানের পারিপাট্য বিধান করে। সেইসঙ্গে ভাবের আবেগ গায়ক ও জ্যোতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনোরম ভঙ্গীতে ছন্দায়িত করে। ভাব ও রূপ সমন্বিত হয়ে রসমধুর সৃষ্টি করে। কীর্তনের প্রাণ-রসকে একই সঙ্গে সঙ্গীতে ও নৃত্যে বিকশিত করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই কীর্তন-নর্তনের উদ্ভব। সুর-তাল-বাজনার সঙ্গমস্থিত কীর্তন-নর্তন বাংলার সংস্কৃতির গর্বের ধন।

* শ্রীরামকৃষ্ণের নান্দনিক অমুভূতি ও সৃষ্টি অনন্তমাত্র হলেও কীর্তন ও নর্তন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল দেশীয় ঐতিহ্যমুগ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি বলতেন, “ঐপদ, ধ্যেয়াল প্রভৃতিতে বিজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু সত্যকার সঙ্গীত আছে কীর্তনে—মাখুর, বিষহ প্রভৃতি রচনাবলীতে।” তিনিই অজ্ঞ বলেছেন, “আমাদের দেশে যথার্থ সঙ্গীত কেবল ঐপদ ও কীর্তনে আছে, আর সব ইসলামী ছন্দে গঠিত হইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে।” সেই স্বামী বিবেকানন্দ (পূর্বে নরেন্দ্রনাথ) একদিন তাহিল্য করে মন্তব্য করেছিলেন, “কীর্তনে তাল^{১৫} সম্ এসব নাই—তাই অত popular—লোকে ভালবাসে”। এই মন্তব্য শুনে প্রতিবাদ করেন দিব্যশক্তিসম্পন্ন কীর্তন গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেন, “সে কি বলি! করণ বলে তাই অত—লোকে ভালবাসে”।^{১৬}

১৫ কীর্তনে তালের সংখ্যা ১০৮ প্রকার। এই সকল তাল ছোট, মধ্যম ও বড় ভেদে নানাপ্রকার হয়। ক্রত ও বিলম্বিত ভেদেই এই প্রকার-ভেদের হেতু। (ধ্যেয়নাথ মিত্র : কীর্তন, বিশ্বভারতী, পৃ: ৫৫-৫৬)

১৬ কথাস্মৃতি, ৪।১৭।১

বহুশাখায় প্রসারিত জনসংগীতের মধ্যে কীর্তন গানের রয়েছে একটি বিশিষ্ট স্থান। বাঙালীর আত্মবিক টান করণাত্মক রস। তাকে আশ্রয় ক'রে কীর্তন বাঙালীর হৃদয় জয় করেছে। কীর্তনের ভাবরূপসী করুণ-রসের রত্নমালা গলায় ধারণ ক'রে বাঙালীর চিত্তকে আকর্ষণ করেছে।

• কলিতে নারদীর ভক্তি। সহজ পথ, সরল তার প্রভৃতি। ভক্তির বহিঃস্থ ও অন্তরস্থ সাধনার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন গিরিশচন্দ্রকে, “ভক্তির মানে কি—না কার্যমনোবাক্যে তাঁর উজনা। কার্য—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা; পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া; কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নাম-গুণ-কীর্তন শোনা; চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যানচিন্তা করা, তাঁর লীলা শ্রবণ-মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-ভক্তি, তাঁর নাম-গুণ-কীর্তন, এইসব করা। “বেধী ভক্তি-সাধনের অঙ্গ শ্রীভগবানের নাম-গুণ-কীর্তন, রাগাদিক ভক্তির সিদ্ধ অবস্থাতেও নাম-মাহাত্ম্য একটি সহচর, কারণ ‘তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়’।”^{১৭}

শ্রীরামকৃষ্ণের মন শুকনো দেশলাইয়ের মত। সামান্য উদ্বীপনেই আগুন জলে ওঠে। মধুর কণ্ঠে ভাবস্বরভালময় সমন্বিত কীর্তন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমুদ্রে উদ্ভাল-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। দক্ষ সীতার শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানন্দ-সাগরে সীতরে চলেন, ভাসেন, ডোবেন—আবার সাগরপারে ফিরে গিয়ে তৃপ্ত ভক্তগণকে প্রেমমুনার প্রেমবারি অঞ্জলি ভরে বিতরণ করেন। প্রত্যক্ষদর্শী কালীপ্রসাদ (পরে স্বামী অভেদানন্দ) স্মৃতিচয়ন করেছেন, “কখনও তিনি ভাবাবেশে হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন ও নাচিতেন এবং কখনও বা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা মধুরকণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রভৃতি সাধকগণের গান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কখনও কখনও তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কীর্তন করিতেন। কখনও বিজ্ঞাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজনরচিত পদাবলী গান করিতেন এবং আপন-ভাবে মাতোয়ারা হইয়া নৃতন নৃতন আখর দিতেন। কখনও বা পরমবৈষ্ণব ভুলসীদাস যেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপে রামসীতার লীলা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেগে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া বাইতেন”^{১৮}

কীর্তন ও নর্তন অকাঙ্ক্ষীভাবে পরস্পর যুক্ত ও সমৃদ্ধ। কীর্তনের বৈশিষ্ট্য

১৭ কথায়ূত, ৩।১১।৩

১৮ স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা, পৃ: ৩৮

সময়ে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন, “ওর (কীর্তন সঙ্গীতের) মধ্যে ভাবগ্রহণের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি না।”^{১৯} ছন্দোময় দেহে প্রাণের আন্দোলন ছাড়াও ভাবের আন্দোলনের যেভাবে ক্ষুধা বটে তাতেই উদ্ভূত হয় কীর্তনালিঙ্গিত রসমাধুর্য।

কীর্তনের লক্ষ্যভিত্তিকীন ছন্দোবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও সুদৃষ্ট অঙ্গসংকলনের সমাবেশে উদ্ভূত হয় নৃত্য বা ভাবনৃত্য। নৃত্য ও নৃত্য ছুটিরই মূলধাতু নৃতি। ‘নৃতি’র অর্থ গাঢ়নিক্ষেপ। নৃত্যের বিশেষ বিশেষরূপ ও গতির বিচিত্র সমাবেশ মাহুকের মনকে সহজে ও বিশেষভাবে রঞ্জিত করে। “বাক্য ও অঙ্গভঙ্গনের সুকুমারতা, গীতনৃত্য বিষয়ে উন্নত ও শৃঙ্খলারসের প্রাধান্য” এই তিনের সমাবেশে কৌশলিকী বৃত্তি। ভরত ও শার্ঙ্গদেবের মতে সঙ্গীতে চারিটি বৃত্তির মধ্যে কৌশলিক বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ। একে অবলম্বন করেই কীর্তন ও পদাবলীসমূহের সমৃদ্ধি। সংকীর্তন প্রথমাবস্থায় গীতপ্রধান। বাস্তব করে গীতকে অঙ্গসংকলন, ক্রমে নৃত্য করে বাস্তবকে। অঙ্গগতির সঙ্গে সংকীর্তনে নৃত্য প্রাধান্য পায়, গীত ও বাস্তব তাকে অঙ্গসংকলন করে। গীতবাস্তব ও নৃত্যের স্রষ্টা সমগ্র কীর্তনের সৌন্দর্য ও ভাবব্যঞ্জনার চরম মাধুর্য সৃষ্টি করে। কীর্তনের ভাবগরিমা, রচনালালিত্য, রসবাস্তি ও সৌন্দর্যমূলক নৈপুণ্য শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যগীতনাট্যে সুপ্রতিবাস্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর সকল আয়াস-প্রয়াসের মূল-উৎস অধ্যাত্মশক্তিকৃত। প্রত্যক্ষদর্শী গদাধর (পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ) আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি মধুর স্মৃতিখণ্ড। তিনি একদিন দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর বিছানায় বসে মধুরকণ্ঠে গোবিন্দ অধিকারীর “বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের—রাই আমাদের, আমরা রাই-এর” কীর্তনটি গাইছেন। কীর্তনটি রঙ্গে-ভঙ্গে সম্পূর্ণ করতে করতে অজস্র অশ্রুধারায় তাঁর বক্ষ প্রাবলিত হ’ল এবং তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ঐ কীর্তন কতরকমেই না তিনি গাইলেন! সমস্ত বিকালটা কীর্তনেই কেটে গেল। জীবনে এরূপ “অদ্ভুত ব্যাপার” তিনি আর দেখেন নি।^{২০}

নামকীর্তনে ভাবের সঞ্চার ও গভীরতাই কাম্য। কাব্যগুণ ও স্রষ্টামাধুর্য

১৯ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ, নবভারত পাবলিশার্স, পৃ: ৬৮

২০ স্বামী অখণ্ডানন্দ : স্মৃতিখণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ: ১৪

সম্বিত হয় কীৰ্তনে। নামমাহাত্ম্যের কীৰ্তনে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্লাস্তি ছিল না। তিনি বলতেন, “সর্বদাই তাঁর নামগুণ কীৰ্তন দরকার। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বরদর্শন হয়। গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ঈশ্বরের নাম কর্তে লজ্জা ভয় ত্যাগ করতে হয়। যারা হরি নামে মত্ত হয়ে নৃত্যগীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না।...ঈশ্বরের নাম কর্তে হয়।—দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাকো না ক্যান—যদি নাম কর্তে অহুরণ দিন দিন বাড়়ে, যদি আনন্দ হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই; তাঁর কৃপা হবেই হবে।”^{২১} শ্রোতাদের মনে চিরকালের মত গৌণে দেবার অস্ত্র তিনি যে সব উপদেশ উপহার দিতেন তা ছিল নানা রূপকল্পে সমৃদ্ধ চিত্রময়। তিনি বলেছেন, “তাঁর নাম-গুণ-কীৰ্তনকালে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহবুদ্ধি পাপপাখী; তাঁর নামকীৰ্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বুদ্ধের উপরে পাখী সব পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণ-কীৰ্তনে চলে যায়।” তাঁর উপদেশ ছিল তাঁর দিনচর্যার প্রতিকলন। তাঁর আচরণ ছিল নজির স্থাপনের অস্ত্র, অপরের অহুসরণের অস্ত্র।

“শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে হাততালি দিতেছেন। অশ্বরে বলিতেছেন : হরিবোল, হরিবোল, হরিময় হরিবোল; হরি হরি হরিবোল। আবার রামনাম করিতেছে—রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম রাম, রাম, রাম। ঠাকুর এই প্রার্থনা করিতেছেন...আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—আমি ক্রীয়াহীন।...দেখহুখ চাইনে রাম! লোকমাত্ত চাইনে রাম।...কেবল এই করো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার মুগ্ধ হই না রাম।”^{২২} ঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণের অহুরণপ্রসঙ্গিত কল্পনামাধা নামগান শুনে উপস্থিত অনেকেই অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না।

সর্বানন্দী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণমাতানো গানে শ্রোতার মন-ময়ূর নৃত্য করত। কিন্তু অস্তরের উবেলিত ভাবতরঙ্গ যখন তাঁর অকপ্রত্যক্ষে তাললয়যুক্ত হয়ে ছন্দায়িত হত, উপস্থিত সকলের শুধু প্রাণের আন্দোলনকে নয় ভাবের আন্দোলনকেও উত্তোলিত করে দিত এবং তারাও ক্রমে যেন বেশামাল হয়ে

২১ শশিভূষণ ঘোষ : শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃ: ৩৮৬

২২ কথামৃত, ৫।৪।১

২৩ কথামৃত, ২।১৬।২

পড়তেন। তাবোধেনিত পরিবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনৌকা হলেহলে চলতে থাকত, এদিকে প্রেমোক্তধারার সিক্ত হয়ে যেত তাঁর ভাবাকাপড়। তাঁর প্রেমাহরকনের দিব্যাত্মনে সকলের প্রাণ রঞ্জিত হত।

ভাবে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের একক নৃত্যের বা কি পারিপাট্য! বলরাম-ভবনে রথযাত্রার দিনে প্রত্নাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর হৃত্য করে, মধুর গান গেয়ে উপস্থিত সকলের মনমধুপকে আকৃষ্ট করেছেন। মনে পড়ে ঠাকুরের প্রিয়-গানের একটি কলি : “হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন, লোহাকে চুষকে ধরে।” পরদিন সকালবেলা! “উত্তমগণ মৃদুবিস্ময়ে দেখেন, ঠাকুর রামনাম করে ককনাম করছেন। “কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! গোপীকৃষ্ণ! গোপী! গোপী! রাখালজীবন কৃষ্ণ। নন্দনন্দন কৃষ্ণ। গোবিন্দ! গোবিন্দ!” আবার গৌরাক্ষের নাম করছেন, “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রত্ননিত্যানন্দ! চরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ।” আবার বিলম্বিত করণধরে বলেন, “আলেখ নিরঞ্জন।” তিনি প্রেমোক্ত বিসর্জন করেন। তাঁর কারা দেখে, কাতর স্বর শুনে কাছে দাঁড়ানো ভক্তেরা কাঁদছেন। তিনি চোখের জল কেসে বলছেন, “নিরঞ্জন! আম বাপ—খারে নেয়ে—কবে তোরে খাইরে জন্ম সকল করবো! তুই আমার জন্ত দেহধারণ করে নররূপে এলেছিস।”

জগন্নাথের জন্ত আর্তি করছেন—“জগন্নাথ! জগবন্ধু। বীনবন্ধু। আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ, আমার দয়া কর!” প্রেমোক্ত হয়ে গাইছেন—“উড়িঙা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জী।” এবার তিনি নামকীর্তন করছেন—নাচেন ও গাইছেন, “শ্রীমন্নারায়ণ। শ্রীমন্নারায়ণ। নারায়ণ! নারায়ণ!” আবার নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গাইছেন, “হলাম বার জন্ত পাগল, তারে কই পেলাম সই।” যেন পাঁচ বছরের বালক। ছোট ঘরটিতে বসে। প্রফুল্ল বদন। এই নামোচ্চারণের মধ্যে স্তর ও কণ্ঠের জোর, কদম্বাবেগের ঝোঁক, অম্লরাগের আর্তি মধুর পরিবেশ রচনা করে।

রামনাম বা ককনাম ছিল সহজ উদ্বীপক। জগন্নাথের নামও সামান্ততেই মনবেশনের হাওয়া উত্তপ্ত করে তাকে ভাবের আকাশে উন্নীত করত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গাপূজার নবমী তিথি। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ষর। নিকটের বারান্দার ঘুমিয়েছিলেন তখনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও মাঠার। ঘুম ভাঙতেই এঁরা দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে মাতোয়ারা। আত্মাহুত আনন্দে ভরপুর। মধুরকণ্ঠে নামগান করছেন, “জয় জয় দুর্গে! জয় জয় দুর্গে!” ঠিক

যেন একটি পাঁচ বছরের আনন্দমুগ্ধ বালক। কোমরে কাপড় নেই। জগন্নাথার নামগান করতে করতে ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছেন। আত্মার আনন্দমাগরে মীনবৎ ভেসে চলেছেন। এক একবার খেমে বলছেন—
“সহজানন্দ! সহজানন্দ!” পরমুহূর্তেই কাতর আতকণ্ঠে বলছেন, “প্রাণ
হে গোবিন্দ মম জীবন।” ২৪

বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক রোমারোলার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ চিরকালের শিশু মোংসাঁট। “শিল্পময় ভাবাবেগ এবং সৌন্দর্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বসিত একটি অহুত্বতির মধ্য দিয়াই ভগবানের সহিত রামকৃষ্ণের মিলন ঘটে।” শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পচেতনা, সৌন্দর্যপ্রীতি, বিবিধ রসান্বাদন চিদানন্দরসধর্মী। কিন্তু রসচর্চার আধার যে রামকৃষ্ণবিগ্রহ তার সসীম অবয়বের মধ্যে ভূমি ও জুয়ার, রূপ ও অরূপের, সীমা ও অসীমের যুগপৎ অবস্থিতি অতুলনীয় মাধুর্যরস সৃষ্টি করত। এই অকৃতপূর্ব সমন্বিত ভাবগুচ্ছ বিচিত্রধারায় বিচ্ছুরিত হত যখন শিল্পী একা অবতীর্ণ হতেন রসমঞ্চে। আবার দৃষ্টপটের কি অভাবনীয় পরিবর্তনই না ঘটত যখন ভক্তদর্শকবৃন্দের একাংশ বা অধিকাংশ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য নাট্য-সঙ্গীতে যোগ দিতেন। দৃষ্টপটের ভাববাঞ্ছনা সম্পূর্ণ ভিন্ন রস-মাধুর্যের সৃষ্টি করত যখন তিনি জনসঙ্গে থেকেও সম্পূর্ণ ভাবভোলা হয়ে নর্তনে-কীর্তনে মেতে উঠতেন।

ভীতগবানের ভাবোদ্বীপক কীর্তিকখনই কীর্তন। সম্যক তাল প্রযুক্ত, বিবিধ রাগাদিতে গীত, বিচিত্র ভাবনৃত সংযুক্ত নামগুণকীর্তন যে রসমাধুর্য পরিবেশন করে সে লব্ধে নারদপঞ্চরাজে ২৫ ব্যাসদেব বলেছেন,

স্বয়ং তালমানক সতানং ধ্রুয়শ্চতম্।

বীণামৃদঙ্গমুরজযুক্তং ধ্বনিসমধিতম্।

রাগিণীযুক্তরাগেণ সময়োক্তেন স্তব্ধরম্।

মাধুর্যং যুচ্ছনাব্যুক্তং মনসো হর্ষকারণম্।

বিচিত্রং নৃত্যকচিরং রূপবেশমহত্তমম্।

লোকানুরাগবীজক নাট্যোপযুক্তহস্তকম্।

গীত-নৃত্য-বাঞ্চে ভাব প্রযত হয়। ভাবহন্তী দেহমনকে তোলপাড় করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “যে তোলপাড়। সে অবস্থায় আগে যেমন ব্যথা, পরে

২৪ কথাবৃত্ত ২।১৭।১

২৫ শ্রীনারদপঞ্চরাজ, প্রথমরাজ, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২-৪

তেমনি গভীর আনন্দ।" শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সামান্য উদ্দীপনে ভাবান্ধি ধপ করে জলে উঠত। অস্থানিত কণ্ঠে মধুর সঙ্গীতের ভাবতরঙ্গ তুলেছেন নরেন্দ্রনাথ। সঙ্গে খোলকরতাল বাজে। নরেন্দ্রাঙ্গি ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বেড়ে বেড়ে নৃত্য করছেন, কীর্তন গাইছেন, 'প্রেম্যানন্দ রসে হও রে চিরমগন।' আবার গাইছেন, "সত্য শিব সুন্দররূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে। নিরখি নিরখি অহুদিন মোরা ভুবির রূপসাগরে।" ভাবাবেগে নরেন্দ্র নিজহাতে খোল ধরেন, মত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গান ধরেন, "আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম।" যেন স্বর্গীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে। "চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত-গ্রহদল, ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।" শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধাপেধাপেউঠে উঠে যায়। ভগবদ্ভাবে সুরভিত পরিবেশের মধ্যে ভাবোন্মত্ত ঠাকুর নরেন্দ্রকে অনেকক্ষণ ধরে বার বার আলিঙ্গন দান করেন। তিনি বলেন, "তুমি আজ আমার যে আনন্দ দিলে!" প্রত্যক্ষদর্শী-'শ্রীম' লিখেছেন, "আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। রাত প্রায় আটটা। তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়। একাকী বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন।... যাকে যাকে যার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন।"২৬ রসসন্তোগে কখনও ভগবান হন ফুল, ভক্ত হয় ভ্রমর। আবার কখনও ভগবানই হন অলি, ভক্ত হয় ফুল। কখনও বা "আপন মাধুর্য হরে আপনার মন, আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয় পদকর্তাদের গান শুনেছিলেন, কখনও তাদেরও গান শুনিয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নবুড় আচার্য, মনোহর সাই, রাজনারায়ণ, বৈকবরণ, বনোয়ারী দাস, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, সহচরী প্রভৃতি। রাজাগানে কথকতার কীর্তনে ব্যবহৃত রাগরাগিণী সম্বন্ধে ঐংস্থ্য ও অভিজ্ঞতা শ্রীরামকৃষ্ণকে রাগসঙ্গীতে নিপুণ করে তুলেছিল। অসাধারণ একটি ঘটনা-চিহ্ন সংক্টিষ্টাকারে তুলে ধরা যাক। পদকর্তা, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও সারক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত শোনার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার রাজিবাস পর্বত করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের আসরে নীলকণ্ঠ গানের পর গান গাইছেন। প্রেমোন্মত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করছেন। নীলকণ্ঠ গাইছেন, "শ্রীগৌরানন্দসুন্দর, নবনটবর, তপতকাকনকার।" ভাবসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ 'প্রেমের বস্ত্রেভেসে যায়' ধুরো ধরে নীলকণ্ঠ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে অপূর্ব নৃত্য করতে থাকেন। "সে

অপূর্ব নৃত্য বঁহার। দেখিয়াছেন তাঁহার। কখনই ভুলিবেন না।” ভাব ও
 রূপের একত্র সার্থক সমন্বয় এবং প্রাণবান নৃত্যছন্দ সকলকে বিমুগ্ধ করে রাখে।
 নর্তকলোকে স্বর্গের শোভা অহুমান ক’রে ভক্তগণ আনন্দাধিষ্ট। এবার গান
 ধরেন, ‘বাহের হরি বলতে নয়ন করে, তারা ছুতাই এসেছে রে।’ এবং
 নীলকণ্ঠাধি ভক্তদের সঙ্গে ঐশ্বর্য নৃত্যে যেতে ওঠেন। মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ
 আখর বা ‘কথার তান’ জুড়ে দেন : ‘রাধার প্রেমে মাতোয়ারা তারা, তারা
 ছুতাই এসেছে রে।’ সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী নীলকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গীতনে সজ্জিত অংশ
 গ্রহণ শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পনৈপুণ্যের একটি উজ্জল প্রমাণ। ভাবগ্রাহী ভক্তনীলকণ্ঠ
 শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পান “সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ”। শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণসের
 রসিক। আসন্ন সমাগনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে উপস্থিত সকলকে
 বলেন, “আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি—এদের আবার আমি গান
 শোনাচ্ছি।”^{২৭}

ভজনে-কীর্তনে, নৃত্যে-নাট্যে শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রেম। তিনি
 বলতেন, “ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা, প্রেমের সুরা। মানব-
 জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার।”^{২৮} তগবদ্-
 ভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে সাধারণ মানুষ মাতাল বলে ঠাউরেছে।
 মত্ত শুক আত্মারাম শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের বাণীতে বলেন, “সুরাপান করিনে
 আমি সুরা খাই জয়কালী বলে। মন-মাতালে মাতাল করে, মদমাতালে
 মাতাল বলে।” তাঁবের সুরায় শ্রীরামকৃষ্ণ হাসেন কাদেন নাচেন গান।
 কখনো প্রেমিক ভক্তভাব আরোপ ক’রে নিজেকে মনে করেন নর্তকী, আর
 ভগবানের সম্মুখে সখীভাবে দাসীভাবে নৃত্যগীত করেন। প্রকৃতপক্ষে নিজের
 মাধুর্য আবাদন করবার জন্য তিনি দুটি হন, একাধারে রসওভক্ত-রসিক, পদ্ম
 ও ভক্ত-অলি, ভগবান ও তাঁর ভক্ত। সেকারণে তাঁর নর্তন-কীর্তন,
 কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী সব কিছুই মধ্য-দ্বিমে লীলানিশ্চলী আনন্দধারা করে
 পড়ে অজস্রধারণার।

কীর্তনগানের মূল উৎস সম্ভবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ‘কীর্তিগাথা’ গান।^{২৯}
 নরোত্তমদ্বালের অত্মদ্বারে কীর্তনগানের প্রসার হয়েছিল, আভিজাত্য লাভ

২৭ কথাবৃত্ত ৪।২২।৫

২৮ ঐ ৫।১।১

২৯ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান, পৃঃ ৮৫

করেছিল। বাঙালীর গানের বৈশিষ্ট্য অহুয়ারী কীর্তনেও সঙ্গীত ও কাব্যের,
হুঁর ও বাণীর মধ্যে শিবশক্তির মিলন ঘটেছে। ঐতিহ্যের ভার শ্রীরামকৃষ্ণের
কর্মসূচীর মধ্যে দেখা যায়,

“অস্তরঙ্গসনে লীলারস আশ্বাদন।

বহিরঙ্গ লৈল্য হরিনাম সংকীর্তন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনের মধ্যে লীলারস কিরূপে আশ্বাদন করতেন তার একটি
ঘনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কন করেছেন অক্ষয়কুমার সেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অহুয়াগিগণ
শ্রীরামকৃষ্ণের অয়োৎসব পালনের অন্য সমবেত হয়েছেন। উৎসবপ্রাপ্ত
অনিন্দ-মুখর।

“খোল-করতাল-সহ কীর্তনের গান।

সংসারী শ্রীপ্রভুর উঠিল তুফান।

লীলারসাস্বাদে প্রেমে অস্তর বিহ্বল।

কীর্তনে আখর যোগ করেন কেবল।

আখরের কি মাধুরী নহে কহিবার।

ক্রমশঃ আবেগ অঙ্গে প্রভাবে বাহার।

* *

সংক্রামক সেই শক্তি বড়ই প্রখর।

সকলে আকৃষ্ট হয় কাছে রয়ে যারা।

আবেগের পরে মহা সমাধি গভীর।

অদ্বৈতপ্রত্যক্ষাদি সহ ইন্দ্রিয়াদি স্থির।

এখন শ্রীঅঙ্গে কিবা মাধুরী উদয়।

উপলব্ধি দরশনে বলিবার নয়। ৩০

‘প্রেমের পরমসার মহাভাব।’ মহাভাবে অশ্রু, কণ্ঠ, বেদ, পুলকাদি
আটপ্রকারের সাত্বিকভাব প্রকটিত হ’তে দেখে শাস্ত্রজ্ঞ সাধকগণ স্তম্ভিত হন।
কিন্তু দুর্বোধ্য ও অবিখ্যাত মনে হয় গভীর ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের দৈহিক
পরিবর্তনাদি। প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্র (পরে স্বামী সারদানন্দ) লিখেছেন
পানিহাটি উৎসবে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর লম্বকে, ‘তাঁহার উন্নতবস্তু প্রতিদিন যেমন
দেখিয়াছি তদনুসারে অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ভার লম্ব বলিয়া প্রতীত
হইতেছিল, ভ্রামর্য উজ্জল হইয়া সৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল, ভাবপ্রবীণ

৩০ অক্ষয়কুমার সেন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পঞ্চম সং, পৃঃ ৫২০

মুখবল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুর্পার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল... উজ্জল গৈরিকবর্ণের পরিবেশে গরদখানি ঐ অপূর্ব অলকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাহাকে অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম করাইতেছিল।"৩১ প্রত্যক্ষদর্শী গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, "তাহার যে কি বর্ণ তাহা এত দেখেও স্থির করিতে পারি নাই। নানা সময়ে নানা বর্ণ দেখিয়াছি। পেনেটির পাটে অনেকরকম বর্ণ দেখিয়াছি। তাহার পর জানি না তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি।"৩২ বিশেষ বিশেষ রসোচ্ছ্বাস ক্ষুরিত হত তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮কালীপূজার সন্ধ্যা। উপস্থিত ভক্তগণ শ্রীমৎকুরের ভাড়া-বাড়ীতে রামকৃষ্ণ-কালীজ্ঞানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলে "দ্বিব্যভাবে ভাবিত ঠাকুর অমনি ঐ প্রসন্নবদনা ও বরাভয়করা হইয়া এক অপূর্ব জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন।"৩৩ আবার তত্ত্বপ্রধান রামচন্দ্র দত্তের দৃষ্টিতে, "এবার একে তিন,—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অর্থাৎ—তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব! তাঁহার ভাব এই যে, একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। গৌরাঙ্গ অবতারে তিনাধারে তাঁহার বিকাশ ছিল।"৩৪ এই জিহবার মহামিলন-রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ বিচিত্রভাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন বিভিন্ন সাধকের কাছে।

১. রামকৃষ্ণজীবনধারাতে নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব। ভাবের ঘোরে তিনি হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান। ঘনীভূত ভাবের পরিণতি মহাভাব, সর্বশেষে প্রেম। 'প্রেমাকিগজীর' শ্রীরামকৃষ্ণ উর্জিতা প্রেমোচ্ছ্বাসে কীর্তন করতেন, ভাবনৃত্য করতেন, আবার কখনও বা ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হতেন।

প্রাচীন আচার্যগণের মতে "নৃত্যশিল্পী হলেন রসভাবের আধারমাত্র; তাঁর নিজের মনের মধ্যে ভাবও হবে না, রসও প্রত্যক্ষ হবে না। যদিও বা হয় তাহলে নৃত্য বা নাট্যকাব্যই সজ্জিত হয়ে বাবে, পণ্ড হয়ে বাবে; অন্ততঃ এদের হুচাক্ষু হানি হবে। অন্তর্গত নৃত্য, নৃত্য ও নাট্যের দর্শক সামাজিক ব্যক্তি

৩১ বামী সায়দানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৭৫

৩২ রামকৃষ্ণ প্রচারে ১৮৫১-১৮৮৭ তারিখে প্রদত্ত ভাব

৩৩ বৈকুণ্ঠনাথ সার্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাবৃত্ত, দ্বিতীয় সং, পৃ: ১৮৭

৩৪ গিরিশ রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ : ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩১

শিল্পীর অভিব্যক্তির থেকে ভাবগুলি আহরণ করে নিজের সম্মুখে রস নামক রূপান্তরিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ও আবাদন করে।”^{৩৫} এখানে পাকভক্তি-বিশিষ্ট মহান কীর্তনীর কল্প ভাবের আধার বা পাত্রমাত্র নন, অথবা রসের পরিবেশকমাত্রও নন। “কণ্ঠাবরোধ-রোমাঞ্চাক্রান্তিঃ পরম্পরং লপমানাঃ” কীর্তনীর নিজে রসাবাদন করেন, অপরকে রসাবাদনে সাহায্য করেন।

রবীন্দ্রনাথ নৃত্য সম্বন্ধে বলেছেন, “আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলাসিত হয় তখন জাগে নাচ।”^{৩৬} রূপকার হিসাবে নৃত্যশিল্পী অঙ্গের বিশেষ ভাব ও সৌন্দর্যকে বাইরের আচরণের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলমান শিল্পরূপ সৃষ্টি করে নৃত্য। অঙ্গের রস ও সৌন্দর্যের প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করে হৃৎ ও ছন্দের ব্যঞ্জনা। সেকারণে নর্তনে-কীর্তনে যে আনন্দবৃত্ত সৃষ্ট হয় তার রূপ ও রসের অঙ্গশ্র বৈচিত্র্য গণচেষ্টনাকে আকর্ষণ করে উদ্ভূত করে।

উচ্চকোটির ভাবশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ভাবরসের বিশ্লেষণ করে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, “যে ভাব যখন তাঁহার ভিতরে আসিত, তাহা তখন পুরোপুরি আসিত, তাহার ভিতর এতটুকু আর অস্ত্রভাব থাকিত না—এতটুকু ‘ভাবের ঘরে চুরি’ বা লোকদেখান ভাব থাকিত না। সে ভাবে তিনি তখন একেবারে অঙ্গপ্রাণিত, তন্নয় বা ডাইলুট হইয়া যাইতেন ;...ভিতরের প্রবল ভাবতরঙ্গ শরীরের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া শরীরটাকে যেন এককালে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত।”^{৩৭} এ কারণেই গিরিশচন্দ্রের ভাবার “একটা বৃদ্ধা মিনলে নাচিলে যে এত ভাল দেখায়, একথা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।” শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন-নর্তনের ভাব ও রূপে নিমজ্জিত হতেন, তন্নয় হয়ে যেতেন, কখনও বা ভেসে উঠে নাচ্যভাবসমৃদ্ধ কীর্তনগানে, নয়নাভিরাম লালিত্যগুণযুক্ত নৃত্যে মেতে উঠতেন, অনিন্দ্যস্বন্দর মাধুর্যে নিজেকে প্রকটিত করতেন।

কথা ও হৃদের চানাপড়েন কীর্তনগান। এই যুগলমিলনের সঙ্গে নৃত্যছন্দ

৩৫ অমিয়নাথ সার্যাল : প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতচিন্তা, বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থ, পৃ: ৪৩

৩৬ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় : ভারতের নৃত্যকলা, ১৬৭১ সাল, পৃ: ২৭২

৩৭ শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩০

শুরু হয়ে তাবৈশ্ববিক যথুতর ক'রে প্রকাশ করে। ভাবের গাঢ়তার কেউ বা বাহুসংজ্ঞা হারায়। ঐতিহ্যের ভাবতরঙ্গে শান্তিপুর ডুবেছিল, নদীয়া ভেসেছিল। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত কীর্তন-নর্তনের গণ-আবেদন হিন্দু বৈষ্ণব ব্যতিরিক্ত ব্রাহ্মণের এমন কি ঐষ্টিয়ানদেরও আকর্ষণ করেছিল। ১৮৭২ ঐষ্টাব্দের ২রা অগাষ্টের Statesman পত্রিকার প্রকাশিত একটি চিঠি তার প্রমাণ।

নৃত্যশিল্প সম্বন্ধে শিল্পীর আত্মসচেতনতা, নৃত্যের রূপবদ্ধ ও কল্পনা শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকে পুষ্টিলাভ করে। কীর্তনের সহচর ৩৮ নৃত্য কিন্তু তাৎপ্রধান। এর স্বতঃস্ফূর্ততা ও সক্রিয় প্রাণশক্তি শাস্ত্রীয় নৃত্যের অহুশাসনের দিকে মনোযোগী নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভায় কৃতী শিল্পীর ক্ষেত্রে আপাতবিরোধী এ দুটি বিবয়ের মধ্যেও দেখা যায় সুসামঞ্জস্য। কীর্তন-নর্তনের জয়জয়্যাট আসরে লকনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ত কীর্তনগানের ভাবের কলিত ও চাক্ষুষরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে। কীর্তন ও নৃত্যে নিরত শ্রীরামকৃষ্ণের দেহপল্লবের হিলোল, ভাবের স্পন্দন, মুখভাষার বিভা, অভঙ্গিমার হান ইত্যাদিতে যে নাট্যশক্তি বিস্মুরিত হ'ত, তা আধ্যাত্মিকভাবে বিমণ্ডিত হয়ে প্রোতা ও দর্শকদের অনাবাদিত রসসমুদ্র পরিবেশন করত।

অনন্ত গুণাধার শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনের আসরে যে স্বল্প-আলোড়নকারী ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করতেন তার মধ্যে বহুবিধ অসাধারণত্ব থাকলেও সাধারণত্বের লক্ষণগুলি ছিল সুস্পষ্ট। তিনি কীর্তনের আসরে যে সঙ্গীতমালা গাঁথতেন তাদের ভাবানুগ-স্বত্বের মধ্যে একটি অখণ্ডতা ও স্বাভাব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। তিনি নানা পর্বায় হতে চয়ন করতেন ভক্তি-স্বরভিত মালার ফুল। তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত কীর্তন গান যেন উন্মুক্ত করত একটি নাটকের ঘর, ঘটাত কত বিচিত্র দৃশ্য দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা, ক্রমে পৌছে দিত সুহৃৎ পরিণতির দিকে। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্টার, হরিশ, লাটু, হাকর, মণি মল্লিক

৩৮ ডঃ সুকুমার সেন প্রমাণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুতুলবাঁজি সহযোগে কৃষ্ণকাহিনী পদসীতির বই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অভিনীত হত। (ডঃ সুকুমার সেন: "নট নাট্য নাটক", ১৯৬৫)

প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত। জানপদী শশধর পণ্ডিতকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিষ্টকণ্ঠে সুঝিয়ে বলেন, “যারই নিত্য, তারই লীলা। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই লীলার অন্ত নানারূপ ধরিয়েছেন।” ভাবপ্রদীপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে মধুমাখা দিব্যকথার রাশ ঠেলে দেন অগ্ন্যাতা। উপলব্ধির রসকুণ্ড হতে উৎসারিত হয় কিরকণ্ঠের সংগীত। ঠাকুর প্রেমামনে প্রমত্ত। তাঁর গজবিনিমিতকণ্ঠে নিঃসৃত হয় সংগীতলহরী। রামপ্রসাদের ‘কে জানে কালী কেমন, বড়দর্শনে না পায় দর্শন’-গানটি দিয়ে আরম্ভ হয়। সে-ভাবেরই রেশ প্রকটিত হয় দ্বিতীয় গানে, “খা কি এমনি মায়ের মেয়ে। যার নাম অপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাটয়ে।” সেই ভাবটিরই বিস্তাররূপে উপস্থাপিত করেন তৃতীয় গান, “প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলই কেনো ডাকাতি।” এবারে কীর্তনের নাট্যাংশে নৃত্যের পরিবর্তন ঘটে। মা-নামের স্বধার মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে “আমি হুয়া পান করি না, হুয়া খাই অন্নকালী বলে”—কীর্তনটিতে, সেইমতে গায়কের দেহাঙ্গে গানের ভাবার্থ স্ফূর্তিত হয়। স্বভাবতই প্রব্র ওঠে, যে শ্রামা-হুয়া খেলে চতুর্ভুগ মিলে যার সেই হুয়া মাহুয খার না কেন? উত্তরের মধ্যে তিনি পরিবেশন করেন পঞ্চম গান, “শ্রামাধন কি সবাই পায়, অবোধ মনবোকে না একি দায়।” কমলাকান্তের এই গানের শেষে কিছুক্ষণের বিরতি পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবতত্ত্বয়তা কিছুটা তরল হয়। স্বরঝঙ্কার ও ভাবযুর্ছনায় পরি-স্রবণ সম্পৃক্ত। শশধর পণ্ডিত বিষয়ে বিমুগ্ধ। তাঁর আকাঙ্ক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরকণ্ঠের কীর্তন আরও শোনে। এদিকে সঙ্গীত-নিব্বার শ্রীরামকৃষ্ণ রাস্তা-বিহীন। এবার তিনি তুলে ধরেন শ্রামাশাধন ও তার বিয় সষকে একটি চিত্রধর্মী কীর্তন গান, “শ্রামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল” ইত্যাদি। কলুকের সুবাতাস হতে রক্ষা পাবার জন্য তিনি অগ্ন্যাতার শরণা-গতির নির্দেশ দেন দুটি কালীকীর্তনের মাধ্যমে—“এবার আমি ভালভেবেছি” এবং “অভরণে প্রাণ সঁপেছি।” দ্বিতীয় গানের “দুর্গানাম কিনে এনেছি” কলিটি শুনে পণ্ডিতের বুদ্ধির শান দেবার শিলা বিগলিত হয়ে অশ্রধারার করে পড়ে। উপস্থিত সকলের হৃদয়ে ভাবের বড় ওঠে। ভাবস্বধার টলটলায়মান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গীতি-আলেখ্য নিয়ে অগ্রসর হন। “কালীনাম করতক, হৃদয়ে রোপণ করেছি।” ‘দেহের মধ্যে ছদ্মন কুন্দন’-রঙ্গী ছাগল-গরু থেকে সব-রোপিত ডকটকে রক্ষা করতে হবে। এর অন্ত বাইরের কোন কিছুই আশ্রয় নিতে হবে না। তাঁর হুরেলা কণ্ঠে নির্দেশিত হয় সাধকের ইতিকর্তব্য। তিনি

গান করেন, “আপনাতে আপনি থেকে মন ঘেরো না কো কাক ধরে।” বিমুগ্ধ শ্রোতা পণ্ডিতের মনে গেঁথে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ গানের সুরে বলেন, “মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়।” পণ্ডিত বিচারমার্গী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য বিস্তার করেন একটি হুপ্রচলিত কীর্তন গানের মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণ গান করেন, “আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো।” গীতি-আলেখ্য শ্রোতাদের পৌছে দেয় কল্ললোকের অমরাবতীতে, শুদ্ধাভক্তির সরোবরের তীরে। এর জন্য ভিন্ন কোন সংলাপের প্রয়োজন হয় না। গানের সুসজ্জিত ভাবপুঞ্জ, কীর্তনীয়ার সুকণ্ঠে গীত সুর-তাল-সমন্বিত একাদশটি গান শ্রোতা ও দর্শকদের বিভিন্ন দৃষ্টপটের মধ্য দিয়ে শুদ্ধা ভক্তির বৃন্দাবনে পৌছে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের গাওয়া কীর্তনে উষ্মিত হয়ে উঠতেন, অপূর্ণের গীত কীর্তনেও বিম্বল হয়ে পড়তেন। দেহ রোমাঙ্কিত হত, প্রোক্ষণ করে পড়ে, মুখে দিব্য হাসির ছটা। বিশেষতঃ নরেন্দ্র প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ ও উচ্চকোটির সাধকের, কণ্ঠে গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রদীপ দগ্ধ করে জলে উঠত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে নরেন্দ্রের গান শুনে তাঁর ভিতর যিনি আছেন, “তিনি সাপের জ্বর ফোস করে যেন কণা ধরে স্থির হয়ে শুনেতে থাকেন।” একটি মধুর ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ তানপুরা সহযোগে গাইছেন,

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,

(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী।

(তুমি) নিত্যানন্দস্বরূপিণী।

প্রমুগ্ধ ভক্তগাকারা আধারপদ্মবাসিনী।

গান অগ্রসর হতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হন। ভাব ক্রমেই গভীরতর হয়। “গানের সুরে সুরে মন উর্ধ্বে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গেন্দ্রিয় নাই, মুখা-বয়ব অমাত্যবী ভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্ম্মরমূর্তির জায় নিঃশব্দ হইয়া নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন।” কিছুক্ষণ পরে সমাধি হতে ব্যুথিত হন। ভাবের প্রাবনের পুনরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে যেন ব্যর্থ হন। দেশকালের বোধ চলে যায়। ভাবের ঘোরে বলেন, “এখনও তোমাদের দেখছি,—কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন চিরকাল তোমরা বলে আছ; কখন এলেছ, কোথায় এলেছ এসব কিছু মনে নেই।” ভিন্ন আসরে উপস্থিত তক্তেরা আবার কখনও বা বিস্মিত হয়ে শুনেতেন, “মা গো, একটু দাঁড়া মা! তোরা তক্তদের সঙ্গে আমল করতে যে মা।”

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্রের কমলকুটারে কীর্তন-নর্তনে প্রমত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তিন অবস্থার মধ্যে বাঁচ খেলতে থাকেন। এর সঙ্গে তুলনীয় “তিনদশায় মহাপ্রভু রয়ে সর্বকাল। অস্তর্দশা বাহ্যদশা অর্ধবাহ্য আর।” অর্ধবাহ্যদশার সঙ্কীর্ণ ও মধুর ভাবনৃত। তাবের গভীরে অস্তর্দশা সমাধি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ। সেবক হৃদয় তাঁকে ধরে থাকেন। ঠাকুর নিশ্চল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কি না বইছে। মুখে দিব্য হাসি। ভগবানের চিহ্নানন্দরূপ দর্শন করছেন। সেই অপরূপ রূপ দর্শন করে তিনি বেন মহানন্দে ভাসছেন। হৃদয় কটোপ্রাকার এই দুর্লভ চিত্রটি সাদাকালোর রূপবন্ধনে ধরে রেখেছেন। ৩১

এই প্রসঙ্গে অরণ্যযোগ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনে যে ভাবোচ্ছ্বাসের উৎসব উপস্থিত সকলকে আলোড়িত করত তার একটি নির্ভর-যোগ্য বর্ণনা। প্রত্যক্ষদর্শী অশ্বিনীকুমার দত্ত একখণ্ড মধুর স্মৃতি উপহার দিয়েছেন। অশ্বিনীকুমার লিখেছেন, ‘কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কেশব! কিছু হবে কি?’ কেশবচন্দ্র সোৎসাহে উত্তর করেন, ‘হ্যাঁ, হবে বৈকি!’ এই ইঙ্গিতবাক্যে অশ্বিনীকুমার সন্দেহ করেন এঁরা সকলে বুঝি স্মরণে মত্ত হবেন। তাঁর আশঙ্কার ভেঙে যায়। পরমুহূর্তে দেখেন মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্য। তিনি লিখেছেন, “যেই কথা সেই কাজ। মুহূর্তের মধ্যে স্মার ভাক পড়িল। ঘন রোলে খোল-কর্ডাল বাজিল। হরিনামের গভীর ধনি আকাশ ভেদ করিয়া উর্ধ্বে উখিত হইল এবং সেই দুই প্রমত্ত ভক্তবীর হরিরসমধিরা পানে আশ্রয় হইয়া পরস্পরের হস্তধারণ করতঃ প্রেমকম্পিত পদক্ষেপে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।” সেই কীর্তনানন্দের রূপ চাক্ষুশদর্শনের অন্ত পাঠককে উপহার দিব এক গনি মনোজ্ঞ চিত্র; সেখানে শ্রীচৈতন্য ও ঈশামণি অত্যন্ত ভক্তদের সঙ্গে ভগবৎসঙ্কীর্ণের মাঝে ঐক্যভাব প্রমত্ত। এবং সমস্ব্যাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে ধর্ম-সম্বয়ের মূলভাবটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তৈলচিত্রখানিকে শ্রীরামকৃষ্ণ “হরেন্দের

৩১ এই শুক্লবর্ণ আলোকচিত্রটি ‘কমলকুটারে’ গৃহীত হয়েছিল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর। গভীর ভাবসমাধিতে নিমগ্ন চৈতন্যধারীর এই চিত্র ধর্মজগতে দুর্লভ একটি হলিল।

পট" বলে চিহ্নিত করেছিলেন।^{৪০} এই চিত্রপটের ভাব ও শিরসৌন্দর্যের তিনি প্রশংসা করেছিলেন। কেশবচন্দ্র ও ছবিখানি দেখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'Blessed is he who has conceived this idea.' (সেই পুরুষ যার হৃদয়ে এই ভাব জাগরিত হইয়াছে।) এই তৈলচিত্র থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নৃত্যরত মনোরম দৃশ্যটি ধারণা করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তন-নর্তনের উদ্দেশ্য ও গতিবিধি বিচিত্রভাবে স্মরিত হ'ত। একটি স্তম্ভের উদাহরণ পাঠকের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরা যেতে পারে। স্বরেন্দ্রনাথ দেবীভক্ত, ধর্ম-মোক্ষ দুয়েরই অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাভাজন। তার বাড়ীর দোতলার কীর্তনের আসর বসেছে। স্বকণ্ঠ জৈলোক্যনাথের সংগীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্তহরে বাঁধা হৃদয়বীণা স্বষ্কার দিয়ে ওঠে, ক্রমে ভাব উবেলিত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন,

ভাবাবেগে ওঠে বড় অঙ্গ-আন্দোলন।

লাগরে তরক যবে প্রবল পবন ॥

মনোহরা এক ছড়া কুসুমের হার।

স্বরেন্দ্র করিয়াছিল বতনে জোগাড় ॥

শিরীতে প্রভুর গলে পরাইলে পরে।

অমনি লইয়া মালা কেলিলেন ছুঁড়ে ॥

স্বরেন্দ্রের প্রাণে লাগে, নয়নে অশ্রু ঝরে। বিষম স্বরেন্দ্র পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসেন। সম্মুখে উপস্থিত রাম, মনোমোহন প্রভৃতিকে দেখে বলেন, "আমার রাগ হয়েছে; রাঢ় দেশের বামুন এসব জিনিসের মর্বাদা কি জানে। অনেক টাকা খরচ করে এই মালা; কোথেকে বললাম, সব মালা আর সকলের গলার দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ; ভগবান পরমার কেউ নয়; অহঙ্কারের কেউ নয়। আমি অহঙ্কারী, আমার পূজা কেন লবেন? আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই।"^{৪১} আকুল অশ্রুধারায় ভিজে তাঁর অহঙ্কারের চিপি নরম হয়, অগ্রগতির পথের বাধা দূর হয়। বাস্তব: অশ্রুধারায় বুক ভেসে যায়।

এদিকে কীর্তনীয়া নৃতন এক গান ধরেছেন, 'হৃদয় পরশবনি'।

^{৪০} চিত্রটি প্রভিবালী 'জগদ্বি' 'উষোদন' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় ও কয়েকটি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।

^{৪১} কথাসূত্র ৫।পরিঃ২২

প্রমোদিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাচছেন। হঠাৎ পরিত্যক্ত মনোরম মালাখানি গলায় ধারণ করেন। আপাদবিলম্বিত কুহুমহারে শ্রীরামকৃষ্ণের রূপমাধুরী শতগুণে বৃদ্ধি পায়। পুণ্ডিকার বলেন,

“নয়ন-বিনোদ দেখে কি লাভ্য খেলে।

শাস্তিময় কাস্তিছটা বদনমণ্ডলে।”

নেচে নেচে গান করেন আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ। মাঝে মাঝে জোগান ‘ভূষণ বাকি কি আছে রে। জগৎচক্র হার পরেছি।’ সুরেজ্ঞ আনন্দে বিভোর। দেখেন “প্রভুর গলায় মালা ছলিয়া ছলিয়া, হইতেছে আন্দোলিত পদ পরশিয়া।” সুরেজ্ঞের মনে ধারণা বহুমূল হয়, ভগবান দর্পহারী, কিন্তু কাঙালের অকিঞ্চনের ধন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শুভমনে ফুট ওঠে, তিনি নটবর শ্রীগোরাঙ্গের নগরসংকীর্তন দেখবেন। জগন্নাথ তাঁর কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে বাসগৃহের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখেন এক নয়নানন্দকর দৃশ্য। পঞ্চবটীর দিক হতে একটি বিরাট সংকীর্তনের দল বকুলতলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বকুলতলা হয়ে কালীবাড়ীর প্রধান রুটকের দিকে অগ্রসর হয়। মহাপ্রভু হরিপ্রসন্ন মাতোয়ারা, নিত্যানন্দ ও অষ্টৈতাচার্য ভাবে বিহ্বল। জনসমুদ্রের সর্বত্র আনন্দ ও উল্লাস পরিব্যাপ্ত। এই সংকীর্তন দলের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন বলরাম বসু ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলির মধ্যে একখানি ছিল লপাধর শ্রীগোরাঙ্গের নগরসংকীর্তনের ছবি। দু’রঙে ছাপান মনোহর ছবিখানি। ১৮৮৫ খ্রিঃ ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ এই চিত্রশটখানি দান করেছিলেন মাস্টারমশাইকে। বর্তমানে এই ছবিখানি কথাস্বত ভবনে (কলিকাতা-৬) সুরক্ষিত।

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলাতে মহাপ্রভু বলেছেন, “নাম সংকীর্তন হইতে সর্বানর্থনাশ। সর্বভুতৌদয় কৃপে পরম উল্লাস।” ভাবচক্ষে মহা-সংকীর্তন প্রত্যক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রেমামৃত আশ্বাদন করেছিলেন সে মহাসংকীর্তন বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে তাঁর নিজের জীবনে। তারে জয়কে লক্ষে করে তিনি শিহুগ্রামে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন, “ওদেশে যখন জয়ের বাড়ীতে ছিলাম তখন ভাববাজারে নিজে গেল। বুঝলুম গৌরানুভূত, গাঁয়ে ঢুকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম

গৌরাঙ্গ! এমন আকর্ষণ—সাতদিন সাতরাত লোকের ভীড়। কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক, গাছে লোক! নটবর গোবামীর বাড়ীতে ছিলুম, সেখানে রাতদিন ভীড়।...রব উঠে গেল—সাতবার মরে সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে। পাছে আমার সর্দিগরমি হয়, কদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত; সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খেল করতাল—তাকুটি, তাকুটি!... আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই বুঝলুম। হরিলীলার যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকি লেগে যায়।”^{৪২} শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ এই মনোহর সংকীর্ণনের বর্ণনা দিয়েছেন, “কীর্তনের আরম্ভ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুমুহ বাহুচৈতন্য হারাইতে লাগিলেন, কখনও ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অকভজী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেন সর্বাঙ্গ অস্থিহীন—ভাঁহার দেহসরসী যেন ভগবৎ-প্রেমানন্দ-মলয়ে তরঙ্গায়িত। আবার কখনও বা মহাতাবে সমাধিস্থ, নিম্পন্দ। হিরনেত্রে দরদরধারে প্রেমাক্ষ বহিতেছে। অমনি হৃদয় আসিয়া পশ্চাৎ হইতে অঙ্গ ধরিয়া কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতেছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে উন্মাদ নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন।...সকলেই চিত্তার্পিভের স্তায় একদৃষ্টে সেই আনন্দযুতি অবলোকন করিতেছেন।..দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্ত গেলেন। অমনি পুনরায় শম্ভু-কাসর ঘণ্টার রবে আনন্দের তরঙ্গ আরও ছত্কারের সহিত মাতিয়া উঠিল। কীর্তনের মধ্যস্থিত সহস্র সহস্র লোক সকলেই আনন্দহারী, প্রেমের বস্ত্রায় ভাসমান। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাপি কাহারও বাহুজ্ঞান নাই। পুনরায় রাজি আসিল এবং রাজি প্রভাত হইল।”^{৪৩} জীবনীকার রামচন্দ্র লিখেছেন, “এমন নৃত্য কেহ কখনও দেখে নাই, এসব কীর্তন কেহ শুনে নাই।”

এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার লিখেছেন,

অন্তপি শিহরে এই কীর্তনের কথা।

দেখাওনা বাহাদের, যনে আছে গাঁথা।

...

শরণে অপার সুখ, সমস্বরে কর।

আমরি আমরি কথা কহিবার নয়। (পৃ: ২৩২)

৪২ কথাসূত্র ৪১২০।২

৪৩ শুকদাস বর্মন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত, ১ম ভাগ, পৃ: ১৫৪-৬

মহাসংকীর্তনের ভাবৈবৰ্ণ 'ইয়ংবেলদের' দেখাবার জন্য ব্যগ্র হন শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। শ্রীরামকৃষ্ণের গলার ক্যান্সার রোগের সূচনা পরিস্ফুট। অনেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করে, তিনি সাবধানে থাকবেন, সমঝিবে চলবেন ইত্যাদি ভরসা দিয়ে নৌকায় করে পানিহাটির উৎসবে যান। সেদিন ঐশ্বর্য্য ভরা উয়োদয়ী। সেখানে চিড়ার মহোৎসব, আন্দলের মেলা, হরিনামের হাটবাজার। শ্রীরামকৃষ্ণ সদলবলে পানিহাটি পৌছান দুইপ্রহরে। মণিসেনের বাড়ীতে নাটমন্দির থেকে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নজরে পড়ে শিখাসুজ্ঞারী, তিলকচক্রাঙ্কিত, দীর্ঘমুগ্ধবপু গৌরবর্ণ এক পুরুষ; পরিধানে ধোপছুরন্ত রেলির উনপকাশের ধুতি, ট্যাঁকে একগোছা পয়সা, ভাবাবিষ্টের স্তায় অকৃতকী ও নৃত্যরত। শ্রীরামকৃষ্ণ মস্তব্য করেন "জং ধেনু"। এদিকে নকল ইঙ্গিত করে আসলের, ভেক স্বরণ করিয়ে দেয় সত্যবাক্যকে। শ্রীরামকৃষ্ণের পরিকরণ তাঁর মস্তব্যের তাৎপৰ্য্য অবধারণ করার পূর্বেই তিনি একলাফে অবতীর্ণ হন কীর্তনমলের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধিতে স্থির গভীর, তাঁর প্রসন্ন বদনে হাস্যদীপ্তি। কিঞ্চিৎ ভাবসম্বরণ হলে তিনি মধুর নৃত্যের ছন্দে দোলায়িত হন, উপস্থিত লোকের অন্তরে দোলের সৃষ্টি করেন। প্রত্যক্ষদর্শী শরণচন্দ্র বর্ণনা করেছেন, "তিনি কখনও অর্ধবাহুদশা লাভপূর্বক সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখনও সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবেগে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি ক্রতপদে তালে তালে কখনও অগ্রসরএবং কখনও পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'স্বপ্নময় সাগরে' মীনের স্তায় মহানন্দে সন্ডরণ ও ছুটছুটি করিতেছেন। প্রতি অন্তের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য্য মিশ্রিত উদ্যম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।...কিন্তু দিব্যতাবাবেগে আত্মহার হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে বেরূপ ক্রমধূর সৌন্দর্য্য ছুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছায়াপাতও আশাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোন্মাদে উৎফুল্লিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে তুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত, উহা বৃষি কঠিন জড়-উপাদানে নির্মিত নহে, বৃষি আনন্দসাগরে উত্তালভরম উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সমুৎপন্ন সকল পদার্থকে ভালাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির

অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাণীতে বুঝাইতে হইল না।” ৪৪ প্রায় আশ্বিনী পরে তিনি রাধবর্ণিতের বাটার দিকে অগ্রসর হন। পর্যায়ক্রমে অবস্জারের মধ্যে ভাসমান শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহে পরিবর্তনশীল ভাববিচ্ছুরণ দেখে দর্শকগণ অনন্তভূত রসাশ্বাস লাভ করেন।

কীর্তন নৃত্যে তাণ্ডব ও লান্তের সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যছন্দের মধ্যে পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠতা ও উদ্ভাসতার সঙ্গে কোমল করুণ রসের সমন্বয় খোল-করতালের তালে তালে মধুময় পরিমণ্ডল রচনা করে। প্রত্যক্ষদর্শী কথাস্বতকার মন্তব্য করেছেন, “পেনেটির মহোৎসবে সমবেত সহস্র নরনারী তা বিতেছে, এই মহাপ্রকৃষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগৌরানন্দের আবির্ভাব হইয়াছে। ছুই একজন তা বিতেছে, ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই গৌরানন্দ।” ৪৫

মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ভাসনৃত্যের যে ভাবরূপটি পুঁথিকারের চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়েছিল সেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেশরি-বিক্রম-নৃত্যে শিল্পীর আকুল গাত্র পুলকিত।

শিল্পীর ছন্দায়িত দেহভঙ্গিমার মধ্যে এক্য করেন পুঁথিকার :

নৃত্যে মোর শ্রীপ্রভুর কর,
আকর্ণ পুরিত টানে ষেইরূপ ধনুগুণে,
ধাহুকী ছাড়িতে বার শর।
বাঘ হস্ত প্রসারিত সরল শরের মত,
দক্ষিণ বুকের দিকে মোড়া,
ঠিক বেন আধাআধি গলা কিবা কণ্ঠাবধি,
বকে লগ্ন অঙ্গুলির গোড়া।
ধরে অঙ্গে মহাবল পদচাপে ধরাডল,
অবিকল হেলাহেলি করে।
কতু অঙ্গ এত চলে পড়ে বেন ভূমিতলে,
পড়ি পড়ি কিন্তু নাহি পড়ে ৪৬

৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ২৩, পৃ: ২৭৩-৭৫। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্নত ভাবনৃত্যটি একটি রেখাচিত্রে পরিণত করেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও বইয়ে ছবিটি ছাপা হয়েছে।

৪৫ কথাস্বত ৪।৩।১

৪৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ঐ, পৃ: ৫৭১

সংকীৰ্তনে গণমানসের সাধু্য বাংসার সংস্কৃতির এফটি বৈশিষ্ট্য।
 শ্রীৰামকৃষ্ণকৃত সংকীৰ্তনে ঐতিহাসিক সাধারণবৰ্ষ তো ছিল। সেই সঙ্গে ছিল
 শ্রীৰামকৃষ্ণের অভিনব, স্বকীয়তা, সর্বোপরি নিখুঁত উদ্দেশ্যতানতা।
 সংকীৰ্তনপ্রিয় রামচন্দ্র দত্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন স্বীয় ধারণা; ‘আমরা
 অনেক সংকীৰ্তন ও প্রেমিক তত্ত্ব দেখিয়াছি...অনেক লয়-মান-সংযুক্ত নৃত্যও
 দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সংকীৰ্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব
 ব্যতীত আর কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না।...হরিতত্ত্ব বাঁহারা,
 তাঁহারা সেই সংকীৰ্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেগে পুলকিত হইতেন।
 একথা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু বাঁহারা তমোগুণের আকর, ঈশ্বরের
 অস্তিত্ব জানিতেন না,...বাঁহারা ভাব ও প্রেমকে মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া
 ঘোষণা করিতেন, তাঁহারাও প্রেমে বিহ্বল হইয়া সংকীৰ্তনে নৃত্য
 করিয়াছেন।”^{৪৭} কীৰ্তনে বিশেষতঃ শ্রীৰামকৃষ্ণের কীৰ্তনে প্রধান উপজীব্য
 ভাব। ঈশ্বর অদভবী ও প্রবল বা স্বেচ্ছা অদভবী তাবের গভীরতার সঙ্গে
 প্রকটিত হত।

আধ্যাত্মতাবসম্পূর্ণ শ্রীৰামকৃষ্ণের সংকীৰ্তন ও নৃত্যের কল্যাণগ্রন্থ প্রভাব
 ছাড়াও নান্দনিক মূল্যবিচার করেছেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী। লিখেছেন
 বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, “চিরজীব শরীর একতারা বাদনে ‘নাচের আনন্দময়ীর
 ছেলে তোর। ঘুরে ফিরে’ গীতশ্রবণে ভারাবেশে গলিত কাকনবপু প্রভু
 ভক্তগণকে স্বর্গস্থ ভিতরণমানসে বামবাহ উত্তোলন ও দক্ষিণতুল্য বুকনে,
 বামপদ আগে ও দক্ষিণচরণ পিছে বাড়াইয়া এমন মধুর নৃত্য করেন, তাহা
 বর্ণনাতীত। আপনি মেতে জগৎ মাতার এই প্রথম দেখিলাম। এ নৃত্যদর্শনে
 ভক্তের তো কথাই নাই, দর্শকেরাও সংক্রামিত হইয়া নৃত্য করিতেছে বোধ
 হল। বেন সমগ্র ভবনটিই নাচিতেছে।”^{৪৮}

আধ্যাত্মিকতাবের সঞ্চরণ ও পরিপূষ্টিই শ্রীৰামকৃষ্ণের নৃত্য ও সংকীৰ্তনের
 মূল্য লক্ষ্য। সেইসঙ্গে নান্দনিক গুণবৃত্ত শিল্পাত্মকুতিও কিভাবে উদ্ভূত হ’ত
 সেটি বিশেষ লক্ষণীয়। মুক্ত প্রাঙ্গণে পাণিহাটিতে নৃত্যরত শ্রীৰামকৃষ্ণকে আমরা
 দেখেছি, মণিমল্লিকের বাড়ীর দোতালার নৃত্যকারী শিল্পীকে দেখেছি।
 গৃহাত্যন্তরে নৃত্যরত শ্রীৰামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন,

৪৭ শ্রীশ্রীৰামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ৬৯

৪৮ শ্রীশ্রীৰামকৃষ্ণ লীলাবৃত্ত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৬

“অপূর্ব নৃত্য! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ ধরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে;... আর ঠাকুর সেই উন্নত ধলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখনও ক্ষুণ্ণপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন আবার কখনও বা ঐরূপে পশ্চাতে হাটিয়া আসিতেছেন এবং ঐরূপে বেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেইদিকের লোকেরা মত্তমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াসগমনের জন্ত স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হস্তপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যোজ্জ্বলিত ক্রীড়া করিতেছে। এবং প্রতি অঙ্কে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের ভায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লক্ষন নাই, কুজুসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গ-বিকৃতি বা অঙ্গ-সংবন-রাহিত্য নাই;... নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্ত যেমন কখনও ধীরভাবে এবং কখনও ক্ষুণ্ণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর-ব্রহ্ম-রূপে নিমগ্ন হইয়া নিম্ন অস্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গ-সংস্থানে প্রকাশ করিতে-ছিলেন।”^{৪৯} শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চারিদিকে বিকীর্ণ হইছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের অস্তরের দীপ জলে উঠেছিল। ভাবোজ্জ্বল পরিবেশে যৌতাত ফুটি হয়েছিল।

নৃত্য-নাট্যে অসাধারণ প্রতিভাধর গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনৃত্য ও তার বিপুল প্রভাব সম্বন্ধে ‘নৃত্য’-গ্রন্থে লিখেছেন, “কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে গৌরাক্ষের নৃত্যদর্শনে উন্নত হইয়াছিলেন একথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমরা যে রামকৃষ্ণদেবের নৃত্য দেখিয়াছি। ‘নদে টলমল করে’ যুগ্মকালে গান হইতেছে, রামকৃষ্ণ নাচিতে-ছেন; যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন—আমরা দর্শন করিয়াছি, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাবপ্রবাহে পৃথিবী টলটলায়মান। কেবল নদে টলমল করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মান। যে সে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর শক্তি। সৌন্দর্য যে তাহার ভিত্তি।”^{৫০} শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যের সমাপ্তি ভক্তিরসমার্গে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যের অপরিমিত শক্তি ও অপার সৌন্দর্য সম্পর্কে নৃত্যকলাবিদ গিরিশচন্দ্রের মূল্যায়ন গভীর তাৎপর্ষপূর্ণ

৪৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ, পঞ্চমখণ্ড, পৃ: ৩১

৫০ গিরিশপ্রবাসলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৩য় ২৩, পৃ: ৮৫০

সংযোজন। কাব্য, ছন্দ ও নৃত্যের ত্রিবেণীসঙ্গমে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি সর্বাত্মক অর্থও পরমসত্তা বিচিত্রবৈভবে অভিব্যক্ত।

নৃত্যশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি বিষয়ে স্বকীয়তা বিশেষ লক্ষণীয়। নাতি-দীর্ঘ, কীণকায়, চোখ দুটি অধনিমীলিত, মুখমণ্ডলে সাত্ত্বিকভাবের বিভা, বেশটা পকাশের কাছাকাছি। কিন্তু নৃত্যরত শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দেহবল্লরীতে ক্ষুরিত পৌরুষদৃশ্য তেজ, প্রাণবন্ত শক্তির মাধুর্য দর্শকমাত্রকেই বিম্বিত করত। শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তন ও নৃত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন, “পরমহংস মশাই-এর কীর্তনের মধ্যে...ভাবের আধিক্য হওয়ায় তাঁহার অঙ্গসঞ্চালন হইত;...দেহ ভাবরাশির শক্তি ধারণ করিতে পারিত না বলিয়া, কখনো বা অঙ্গসঞ্চালন হইত, কখনো বা দেহ নিঃশব্দ হইয়া যাইত। সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে একপ্রকার আভা বাহিত হইত।...সাধারণ লোকের কীর্তন হইল ‘গতি’ হইতে ‘ভাব’ এ...পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল ‘ভাব’ হইতে ‘গতিতে’।...সাধারণ লোকের নৃত্য হইল ‘নরনৃত্য’ পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল ‘দেবনৃত্য’, বাহাকে চলিত কথায় বলে ‘শিবনৃত্য’।...এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই নিশ্চল ও বিভোব হইয়া যাইত; যেন সকলের মনকে তিনি একেবারে ভাবলোকে লইয়া যাইতেন।...সকলেই যেন নির্বাক, নিঃশব্দ পুতলিকার স্তায় স্থির হইয়া থাকিত, সকলেই অতিভূত ও তন্নয় হইয়া পড়িত, সকলেরই মন তখন উচ্চস্তরে চলিয়া যাইত।...পরমহংস মশাই যেন ভাবমূর্তি ধারণ করিতেন এবং স্বয়ং চাপক্সমাট ভাবমূর্তি লইয়া, সকলের ভিতর অল্পবিস্তর সেই ভাব উদ্বোধিত করিয়া দিতেন।...কীর্তনেও যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদাই অনুভব করিতাম।...একটি বিষয় আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতাম যে, কীর্তনকালে পরমহংস মশাই-এর পদসঞ্চালন প্রথম যে পরিধির ভিতর হইত, তাহার পর উহা এক ইঞ্চি আগেও যাইত না বা পিছনেও যাইত না, ঠিক যেন কাঁটার কাঁটার মাপ করিয়া তাঁহার পদসঞ্চালন হইত।”^{৫১} এসকল টেকনিকের বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ভাবের আত্মপ্রকাশের সামগ্রিক রূপ হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যকলা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, বলিষ্ঠ ও নব নব রসতরঙ্গে উৎপ্লাবিত।

সঙ্গীত নৃত্যনাট্য বিষয়ে রসজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণের অপর একটি বৈশিষ্ট্য সমকালীন

৫১ মহেন্দ্রনাথ দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অহুধ্যান, পৃ: ১১৪-১৬

ব্যক্তির এবং তৎপরবর্তীকালের রামকৃষ্ণজীবন অধ্যয়নকারীদের বিম্বিত করেছে। অনেকবারই লক্ষ্য করা গেছে দীর্ঘকাল নৃত্যগীত করে অপুরে প্রান্তরাস্ত্র বিশ্রামকাতর কিন্তু “ধৃত্যংসাহসমর্ষিত” শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকতর উল্লাসে সংগ্রসর বা সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেছেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমাহবিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বর্ধাধাই সিদ্ধান্ত করেছেন, “ভাগবতী তত্ত্ব ব্যতীত মানবদেহে এরূপ বস্ত্র ধারণে কদাচ সমর্থ হয় না।”

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের অপর একটি অতিমানবিক শক্তিও কম বিম্বিত করে না। স্বার্থ ভোগহুৎ-সুহানুভূত শ্রীরামকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ছিল। তাছাড়াও সাধারণ ভাবভূমি উত্তরণ করে তিনি উচ্চ-উচ্চতর পর্যায় হতে রূপরসাত্মক জগৎমালঞ্চ নব নব-ভাবে উপলব্ধি করতেন। সেই-সঙ্গে তাঁর সমগ্র মন একতানে একটি বিষয়কে গ্রহণ করে নির্ভার সঙ্গে তদন্তকূল অন্বেষণ করতে অভ্যস্ত ছিল। মনমুখের ঐক্যসিদ্ধির ফলেই উদ্দেশ্যের বিপরীত কোন কর্ম তিনি করতেন না বা করতে পারতেন না। সেইসঙ্গে ‘ভাবমুখে’ অবস্থিতি শিল্পী ও বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনালোককে একটি দুর্লভ অহুত্বভিতে অন্বেষণ করে রেখেছিল। লীলাঙ্গনকারের ভাষায় ভাবমুখে থাকার তাৎপর্য হচ্ছে: “বাহ! হইতে বতপ্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট আমিই তুমি, তাহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাহার কার্যই তোমার কার্য—এই ভাবটি ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ অহুত্ব করিয়া জীবন বাপন করা ও লোককল্যাণ সাধন করা।” শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর ও মনের এংসংল বৈশিষ্ট্য অহুত্বাবন করণে অহুত্বান করা যায় অধ্যাত্মশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক উপলব্ধি। তিনি বলেন: “আমার হেথিয়ে দিগেছে চিংসমুদ্র, অস্ত্র নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠল, আবার ঐতেই লয় হয়ে গেল।”^{৫২} এই জগৎ-মালঞ্চে রসাস্বাদনের অস্ত্র অবতীর্ণ শিল্পী তাঁর চূড়ান্ত অহুত্ব ভাষা করে সাদাসিধে ভাষায় বলেছেন, “যখন অস্ত্রমুখ সমাধিস্থ—তখনও দেখছি তিনি। আবার যখন বাইরের জগতে মন এল, তখনও দেখছি তিনি।”^{৫৩} তাছাড়াও তাঁর নিশ্চিত উপলব্ধির অন্তর্গত মৌল ভাব: “এক এক সময় ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি।”^{৫৪}

৫২ কথামৃত ১।১৩৬

৫৩ কথামৃত ৪।২০।৬

৫৪ কথামৃত ৫ পরিশিষ্ট

স্বপ্ন-অহুত্বিসম্পন্ন বিশ্বাসী শ্রীরামকৃষ্ণের আন্তর উপলব্ধির ঐশ্বর্যই চিত্র-কলায়, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাট্যে ফুরিত হয়েছিল। বিশ্বাস্য আর ছন্দে ছন্দায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের চলন-বলন ধরন-ধারণ অতি চারুদর্শন, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কাক ও চাক শিল্প নয়নানন্দকর, তাঁর বিবিধ বিচিত্র শিল্পচর্চা নন্দনতত্ত্বের অন্দরমহলে প্রবেশ করেও তাদের শাসনের উচ্চ প্রাকার অতিক্রম করেছে। সেকারণেই সর্বানন্দী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব শিল্পচর্চার দ্বারা ধোঁকার টাটি সংসারক্ষেত্রে ‘মজার কুঠি’তে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কল্পনা করতে পারি, মজার কুঠি এই সংসারক্ষেত্রে “রামকৃষ্ণদেব এদিক ওদিক হেলিয়া ছলিয়া আবার কখনও বা তালে তালে করতালি দিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছেন।...আবার কখনও ‘লক্ষ্মে স্বপ্নে কল্পে ধরা’ উদ্ভাসনৃত্য, যেন সেই নবীর মত কোমল দেখে লিংহের বল। গানের ভাব অল্পবারী ভাল ও লম্ব তরঙ্গ, ভাল ও লম্বের তরঙ্গের সঙ্গে শরীরের তরঙ্গ, তাহার সহিত সমস্ত ভক্তবর্গের মনে ভাবতরঙ্গ যেন ভগবৎপ্রেমের বস্তা। ঘর ঘর পৃথী বায়ু আশাশ সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সেই প্রেমপ্রবাহে স্পন্দিত ও আত্মহারা।”^{৫৫}

এই প্রেমহিম্নোলে শোভমান ভাবোন্মাদসম্পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে দেখে, “ডুবলো নয়ন কিরে না এলো। গৌর রূপমাগরে সীতার ভূলে, তলিয়ে গেল আমার মন।” শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ষড়ির প্রজ্ঞা ও শিল্পীর স্ফুর্জিত্ব মিলিত হয়েছে, দেবত্ব ও মহত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, “ঠাকুর নিজে একজন কত বড় আর্টিস্ট ছিলেন।” “সর্ববিচার সহায় যুগাবতার” শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্রয় করে গণজীবনের দিকেদিকে নবোন্মেষ ঘটেছিল, এখনও ঘটে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে “ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিজ্ঞা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।” তারতবর্ষের চিত্রাচারিত লোকশিল্পের বাহন কীর্তন, নর্তন নাট্য, মূর্তিগড়ন ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় এই সুকুমার শিল্পগুলি সার্থক মর্যাদায় উজ্জ্বল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবহেলিত শিল্পিগণ সহায়ত্ব ও অল্পপ্রেরণা লাভ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। এই বাস্তব মূল্যায়নেও শ্রীরামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর সর্বশিল্পী-সমাদৃত শিল্পধনমূর্তি। নান্দনিক তত্ত্বের বাণকাঠিতে তিনি শিশু মোংসাট, কিন্তু সাংগ্ৰিকদৃষ্টিতে তিনি সন্নিধানসম্মত সাগরের আনন্দফোটোবাজ।

৫৫ গুরুদাস বর্মন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, পৃ: ২৪৫-৪৬

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসম্বন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধ তথা সর্বধর্মসম্বন্ধ তাবটি ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বন্ধ। ‘সম্বন্ধ’ শব্দটি শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তীগণের মনগড়া কিছু নয়, তিনি নিজেই শব্দটি ব্যবহার করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের পিতাকে বলছেন, ‘যে সম্বন্ধ করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে, আমি কিন্তু দেখি সব এক।’^১ আবার তিনি ঈশান মুখোপাধ্যায়কে বলছেন, ‘আর সেই সম্বন্ধের কথা? সব মত দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়।’^২ প্রকৃতপক্ষে সম্বন্ধের ভাবাদর্শ তাঁর জীবন ও বাণীতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বলতেন, ‘একঘেয়ে হোস্ নি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়’, ‘আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব।’^৩

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি সুন্দর তৈলচিত্র। ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র জনৈক সুন্দর শিল্পীকে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসম্বন্ধের তাবটি ছবিতে তুলে ধরেন। ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন পথ দিয়ে সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন। গম্ভ্যস্থান এক, শুধু পথ আলাদা। তৈলচিত্রটি নন্দ বসুর বাড়ীতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন, “...ওর ভিতর সবই আছে।—ইদানীং ভাব।”^৪

ধর্মসম্বন্ধ-তাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্যে একটা আকস্মিক সংযোজন নয়। সম্বন্ধের ভাবাদর্শ তাঁর জীবনে অগ্ৰস্র। তাঁর বলদ বরদ জীবনরসে পরিপুষ্ট। ‘তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেননি; সম্বন্ধিভাই তাঁর ভাব।’^৫ সকল মত-পথের সঙ্গে অবিরোধে অবস্থিত তাঁর যে সর্বাবগাহী ভাবাদর্শ তা সার্বভৌম; সেই কারণে তিনি ‘সম্বন্ধাচার্য’। তাঁর জীবনে সকল ধর্মের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত, সেই কারণে তিনি ‘সর্বধর্মস্বরূপ’। মানবকল্যাণে

১ কথামৃত ৪/১৫/১

২ ঐ ৫/৮/১

৩ ঐ ৩/১৮/২

৪ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ২/৩৮

নিম্নোক্ত সকল ভাবের মিলনসাগর তাঁর চরিত্র, সেই কারণে তিনি ‘সর্বভাব-
স্বরূপ’। ৫ তাঁর জীবন ও বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেখানে মন মূখ এক। লাল-
কিত পাড় ধুতি, বনাতের কোট বা মোলস্কিনের চাদর, মোজা ও কালো বার্নিশ
করা চটিজুতা, কখনও বা কানচাকা টুপি ও গলাবন্ধ পরিহিত ‘পরমহংস’ দেখে
অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবান ব্যক্তিমাত্রই তাঁর পুতুলসজ্জা করে
দেখেছেন তাঁর মধ্যে কখনও ভাবের ঘবে চুরি ছিল না। তাঁর প্রচারিত
বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তাঁর জীবন। তাঁর জীবনব্যুৎপত্তি কখনই কোন
বিরোধ বাসা বাঁধতে পারেনি, সর্বভাবসমমিত সুসংহত তাঁর জীবন ও বাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের
এই সময়-ভাবটি সুন্দর ছুটিয়ে তুলেছেন : ‘বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা’। ৬ অধ্যাত্মজগতের সেরা ভাবদর্শগুলি
‘সূত্রে মণিগণা ইব’ একত্রে গেঁথে শ্রীরামকৃষ্ণ সময়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ মালাধারি
আপন গলায় পরেছেন। অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি মহামিলনের প্রতীক।
তাঁর জীবন মিলনের পীঠস্থান। তাঁর বাণীতে ধ্বনিত মিলনের স্বর। সেই
কারণে তাঁর জীবন ও বাণী এত মধুরময়, সকল দেশের সকল কালের মানুষকে
এত আকৃষ্ট করে। ভাস্কর মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছেন, ‘এই যে ইনি (পরম-
হংসদেব) যা বলেন, তা অত অস্তরে লাগে কেন? এর সব ধর্ম দেখা আছে,
হিঁদু মুসলমান খৃষ্টান শাক্ত ধৈর্যব এসব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর
নানা ফুলে বলে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকুটি বেশ হয়।’ ৭

‘ধর্মসম্বন্ধ’ কথাটির দু’টি পক্ষ। ধর্ম কাকে বলে—এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন
দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিতেছেন। শাস্ত্র-শরিয়তে
পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা। কণাদ বলেন, ‘যতোহি ভূতাদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ
স ধর্মঃ’। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধন, সর্বোপরি জিতাপ হতে নিঃশ্রেয়স
অর্থাৎ মুক্তির পথ নির্দেশ করে ধর্ম। জৈমিনি বলেন, ‘চৌদানাঙ্গগোহর্যো
ধর্মঃ’। অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচার পালন ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হতে
নিবৃত্তিই ধর্ম, যা আচরিত হলে মানুষের হৃদয়ে আভাবিকভাবে উন্নত

৫ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘সম্বন্ধার্থ’, ‘সর্বধর্মস্বরূপ’, আর স্বামী
অতেনন্দ লিখেছেন, ‘সর্বভাবস্বরূপ’।

৬ উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৪২

৭ কথাবৃত্ত ৪১২৮১

জীবনযাপনের জন্য প্রেরণা, হেয়-উপাস্থে বোধ ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা জাগে। আবার পতঞ্জলি বলেন, পাঁচটি যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এবং পাঁচটি নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই দশটির পালনই ধর্ম। আবার ধর্মবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, ধর্ম জগৎসংসারকে ধারণ করে আছে। মহাত্মারত্নকার বলেন, ‘ধারণাকর্ম ইত্যাহঃ ধর্মো বিদ্বতাঃ প্রজ্ঞাঃ’। কল্যাণাকাজী মাহুর্ষ ধর্ম-পথ অবলম্বন করে চলে, কারণ সে জানে ‘ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ’। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে ধর্মসম্বন্ধে যে সংজ্ঞাগুলি পাওয়া যায় তাদের সবগুলিকে উপযুক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আবার ধর্ম সম্বন্ধে মাহুর্ষের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিতও হয়েছে। বর্তমানের *Encyclopaedia Britannica* একটি সর্বজন-গ্রন্থ সংজ্ঞা দিয়েছেন, ‘Religion is man’s relation to that which he regards as holy’ অর্থাৎ মাহুর্ষ যা পবিত্র মনে করে, তার সঙ্গে মাহুর্ষের সম্পর্কই হচ্ছে ধর্ম। মহানুহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের মতে ধর্ম হচ্ছে শ্রীতোক্ত ‘সাত্বিক স্থখলাভের সর্বস্বানবসাধারণ উপায়’।^৮

দ্বিতীয়তঃ সমস্বয় শব্দটির অর্থ কি? তর্কের কূটজালের মধ্যে না প্রবেশ করেও বলা যেতে পারে সমস্বয় দ্বারা বোঝায় সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, অবিরোধ, মিলন, ধারাবাহিক কার্যকারণ সম্বন্ধ। সেই সঙ্গে বোঝা দরকার যে সমস্বয় মানে সমীকরণ, সদৃশীকরণ বা একজাতীয়করণ নয়। বৈজ্ঞানিক ধর্মসকলের বিবাদ-বিসংবাদ, বিশেষ-বিভেদ দূর করে সূত্র সামঞ্জস্য বিধান করাই ধর্মসমস্বয়ের লক্ষ্য।

এত রকমের ধর্মমত কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছেন, ‘কি জানো, কচি-ভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম, নানা মত করেছেন—অধিকারী বিশেষের জন্য। ...মা ছেলেদের জন্য বাড়ীতে মাছ এনেছেন। সেই মাছে ঝোল, অখল, ভাজা আবার পোলাও, করলেন। সকলের পেটে কিছু পোলাও সয় না; তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন,—তারা পেটরোগা। আবার কারু সাধ অখল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা—আবার অধিকারী ভেদ।’^৯ এক এক জাতীয় কচি-বুড়ি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট মাহুর্ষ এক একটি দার্শনিক মতবাদ, এক একটি সাধনপদ্ধতি এবং সাধনাসমূহ এক এক প্রকার আচার অনুষ্ঠান আশ্রয় করেছে। স্থান কাল ভেদে এই বৈজ্ঞান্য

৮ ‘পরমহংসদেবের ধর্মসমস্বয়ের একদিক’, উদ্বোধন, ৩১৬২

৯ কথাসূত্র ৩১৫

বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। কলে দৃষ্টি হয়েছে অগংখা মতবাদ, অগণিত সাধনপদ্ধতি, বহুধা বিচিত্র বিধিনিষেধ, আচার-অহুষ্ঠান এবং এদের রক্ষণাবেক্ষণ পুষ্টিসাধনের জন্য গড়ে উঠেছে নানা ধর্মসম্প্রদায়; গড়ে উঠেছে মন্দির-মসজিদ-গীর্জা; দৃষ্টি হয়েছে পাত্রী-পুৰোহিত-মোক্তা সম্প্রদায়; লেখা হয়েছে শাস্ত্র-শরিয়ৎ-ক্রিপচারস্। মতবাদের অর্নেক্য ও আচারবিচারের বৈষম্যের সঙ্গে অধিকারভোগের আকাঙ্ক্ষা ধর্মসেবীদের প্রায়ই অধর্মের পথে প্ররোচিত করেছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মনেতাদের উদ্দানিতে সাধারণ মানুষ ভুলে বসে, ‘...সমগ্র ধর্মভাব অপরোক্ষাভূ-ভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেব-বিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র—সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র; তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে’।^{১০} ধর্ম-চেতনার উন্মেষের সহায়ক মাত্র যাবতীয় শাস্ত্র-শরিয়ৎ, মন্দির-গীর্জা, আচার-অহুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ। এদের বৈষম্য থেকে কালে উপস্থিত হয়েছে বিরোধ, অর্নেক্য থেকে মলিনতা, লব্ধীর্নতা থেকে দলাদলি। শব্দন উচুতে ওড়ে, মন পড়ে থাকে ভাগাড়ে। তেমনি স্বার্থাশ্রয়ী ধর্মধর্মীদের মুখে মহান্ তত্ত্বকথা আর আচরণে বিভেদ-বঞ্চনা, মারামারি, হানাহানি! স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় তাঁর প্রথম ভাবণেই বলেছিলেন, ‘সাম্প্রদায়িকতা, গোড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই হৃদয়ের পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সন্ত্যাতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হত্যাশায় মগ্ন করিয়াছে। এইসকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।’^{১১} মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতা, গোড়ামি, ধর্মোন্মত্ততা প্রভৃতি পিশাচদের দূর করে হৃদয়বেদীতে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম-সমস্বরের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মধর্মসম্বন্ধ সাধন করেছিলেন, আবার ধর্মে ধর্মে যে বিরোধ তার নিষ্পত্তি করে সর্বধর্মসম্বন্ধ করেছিলেন। সেই সময় হিন্দুধর্ম অস্ত্রবিরোধে শতধা-বিভক্ত। হিন্দুসমাজ ভোগাধিকারভারতম্যে দুর্বল পক্ষ। সন্তোষবাদ ও নিগুণবাদ, বৈতবাদ ও অবৈতবাদ, স্বর্গবাদ ও মোক্ষবাদ, ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদ, রূপবাদ ও পুরুষকারবাদ—সে সময়ে বিবর্তমান এই বাদসকলের

১০ বাণী ও রচনা, ১/২৪

১১ ঐ ১/১০

সংঘাতে সনাতন হিন্দুধর্ম জর্জরিত। সনাতন হিন্দুধর্মের ভিতরের বিরোধ ও বৈষম্যের গভীর অরণ্য ভেদ করে অগ্রসর হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললেন, 'যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাক্ষাৎ আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, বলা যায়না।' ১২ 'কালীই ব্রহ্ম, কালীই নিষ্ঠুর্ণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিণী'। তিনি দেখালেন, 'বৈত নিশিষ্টা বৈত ও অবৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়।...উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ।' ১৩ শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস।—তবে একজন বলছে 'জল', আর একজন 'জলের খানিকটা চাপ'।" ১৪

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মবৃক্ষের তলায় বাস করতেন। তিনি বহুরূপী ঈশ্বরতত্ত্বের নানা বর্ণ বৈচিত্র্য তো বটেই আবার বর্ণশূন্যতাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সামগ্রিকভাবে অসুস্থ করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চরম সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। আর্থ ঋষিদের উচ্চারিত 'একং সন্ধিত্বা বহুধা বদন্তি', 'স্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ঋ কুমার উত বা কুমারী' ইত্যাদি বেদমন্ত্রের সত্যতা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে পুনঃপ্রমাণিত হয়—শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্' পুনরায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়। তাঁর বৈচিত্র্যময় সাধনজীবনের দ্বারা হিন্দুধর্মের যাবতীয় অন্তর্বিবোধের অবসান হয়। হিন্দুধর্মসংহতিতে তাঁর অসুন্নীয় ভূমিকা সথেষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন :

'...আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সত্য-বিবর্তমান, আপাতদৃষ্টে বহুবিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসম্মূল সম্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিহীন ও বিদেশীর স্বগাংগাদ হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মধণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈনিক অরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতনধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোক-হিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান অবতীর্ণ

১২ কথামৃত ২।২।৫

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ ২।২১

১৪ কথামৃত ৪।২৪।৮

হইয়াছেন।' ১৫ শ্রীমদ্রুক্মণের সাধনজীবনের নিখাস উদ্ঘাটিত করে স্বামী বিবেকানন্দ লিখলেন : 'বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিরন্তরের মূর্তিপূজা ও আত্মবল্লিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে।' ১৬ সনাতন হিন্দুধর্মের এই গভীর অখণ্ড ব্যাপক ও সর্বজনীন অচ্ছেদ্য অখণ্ড রূপ ভুলে ধরেন শ্রীমদ্রুক্মণ এবং আপাতদৃষ্টিতে বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুধর্মের সমন্বিত অখণ্ড ভাবাদর্শ প্রচার করেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই ভাবাদর্শ ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ উজ্জ্বল করে বহুধা-বিভক্ত ভারতবর্ষের সংহতি সাধনে সাহায্য করে। এই দুর্লভ কাজে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা আদিগুরু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তুলনীয়। ১৭

শ্রীমদ্রুক্মণ ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর অধিকাংশের ধর্ম—হিন্দুধর্মকে সুসংহত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেই কাজ করেন। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিবর্তমান ধর্মমতগুলির মধ্যেও তিনি একটি স্তূপ সমন্বয় সাধন করেছিলেন। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মমত ও তাদের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলি দীর্ঘকাল ধরে ঈর্ষা, অহুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষের তুহানলে দগ্ধ—সহাতুভূতির অভাবে একে অপরের উপর খড়গহস্ত। সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় সংগঠনের অত্যাচার-উৎপীড়নে সমাজদেহ দীর্ণ, গৌরবাহিত মানবসভ্যতার কিরীট ধূলার অবলুপ্তি, ধর্ম বৈষম্য-ব্যাধিতে পীড়িত সমাজদেহ পঙ্ক। শ্রীমদ্রুক্মণ দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে সাধন ভজন করে আবিষ্কার করলেন বৈষম্য-ব্যাধির নিরাকরণের তত্ত্ব। উন্মোচিত হ'ল মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন দিগন্ত।

ধর্মে ধর্মে বৈষম্যব্যাধিটি প্রাচীন, ব্যাধি-নিরাময়ের প্রচেষ্টাও প্রাচীন। দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ, শাস্ত্র-শরিয়তের প্রমাণপত্র, ধর্মমতের তুলনামূলক বিচার, রাজনৈতিক বলপ্রয়োগ, সামাজিক চাপ ইত্যাদি নানা উপায়ে বৈষম্যব্যাধি নিরাময়ের চেষ্টা হয়েছে। অবতারপুরুষ, পরমেশ্বর, প্রেরিতপুরুষ—এঁরা নিজেদের জীবনদান করে বিরোধ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। যাবতীয়

১৫ স্বামী বিবেকানন্দ : হিন্দুধর্ম ও শ্রীমদ্রুক্মণ

১৬ বাণী ও রচনা, ১১৩

১৭ K. M. Panikkar : The Determining Periods of Indian History, p. 58

প্রচেষ্টা ও তার বিফলতার কারণ বিশ্লেষণ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : “আমরা দেখিতে পাই, ‘সকল ধর্মই সত্য’—একথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানব স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইউরোপে চীনে জাপানে তিব্বতে এবং সর্বশেষ আমেরিকায় একটি সর্ববাদিসম্মত ধর্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্মকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সবগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ তাহারা কোন কার্যকর প্রণালী অবলম্বন করে নাই।” ১৮ শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রেমসূত্রের তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই তত্ত্বটিকে বাস্তবে রূপদানের কার্যকর কর্মপ্রণালীও দেখিয়েছিলেন। তান্ত্রিক অহুত্বতির স্বর্ণকে তিনি বাস্তবের খাদ মিশিরে দৃঢ় ও উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্রাকারে সমাধান দিয়েছিলেন, ‘যত মত তত পথ।’ ১৯ বিশ্বের বুধমণ্ডলী এই সমাধান-সূত্রকে স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু কেউ কেউ এর যৌক্তিকতা, বাধার্থ্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। জনৈক প্রতিষ্ঠিত বাঙালী বিদ্বান্ লিখেছেন : ‘ধর্মসম্বন্ধে কথাটা অর্বাচীন যুগের বিকৃত মস্তিষ্কের একটা খিচুড়ি। ধর্মের সম্বন্ধ হয় না, ধর্ম বৈচিত্র্যময়।’ জনৈক ভারত-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ‘যত মত তত পথ’-নীতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে সম্ব্যব করেছেন : “‘যত মত তত পথ’—সম্বয়ের এই যে মূলমন্ত্র, কার্যক্ষেত্রে ইহা যদি সম্ভবপরও হয় তাহা হইলেও ইহার পরিণাম খুব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।” অল্পত্র তিনি আবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন : “এই সব কথা চিন্তা করলে ‘যত মত তত পথ’ এই সূত্রটির প্রকৃত অর্থ কি তা নির্ণয় করা কঠিন হয়, সন্দেহ জন্মে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ‘মত’ কোন অংশটুকু ?” অপদ্রপক্ষে বিশ্ব-বরণ্য শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : ‘শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে সর্বমতের সম্বন্ধ হইয়াছে।’ ২০ বিদ্বৎ সাহিত্যিক রোমঁ। রোলঁ। ‘রামকৃষ্ণ-জীবনী’র ভূমিকায় লিখেছেন, ‘And it is because Ramakrishna more fully than any other man not only conceived, but realised in himself the

১৮ বাণী ও রচনা, ৩।১৫২

১৯ কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এটি শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি নয়। এ ধারণা ভুল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণউপদেশ’, এবং লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব ও গুরুভাব (উত্তরার্থ) দ্রষ্টব্য।

২০ উদ্বোধন, ১৩৫২, জ্যৈষ্ঠ

total unity of this river of God, open to all rivers and all streams, that I have given him my love.' উপনিষদের যৎ পশ্চসি তদ্বদ—যা দেখেছেন তাই বলুন—এই নীতিতে গড়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। তিনি যা দেখেছেন জেনেছেন প্রত্যক্ষ অমুভব করেছেন তাই তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ভিত্তিক সামগ্রিক অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিশ্ববাসী, জানিয়েছেন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবি। ২১

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসম্বন্ধ-মতবাদ যা বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করেছে তার প্রকৃত রূপ ও তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধর্মসম্বন্ধের বহুবিধ আকার কল্পনা করা যেতে পারে; সংহতি সামঞ্জস্য সমীকরণ বিভিন্ন স্তরে হতে পারে। আবার ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সমন্বয়-তত্ত্বের প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হতে পারে।

অলৌচ্য বিষয়ের বোধসৌকর্যের জন্য প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মকে চারটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত: প্রত্যেক ধর্মমতের মধ্যে রয়েছে দার্শনিক ভাগ বা ধর্মের মূলতত্ত্ব, যা ধর্মের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যকে আয়ত্ত করার উপায় নির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত: পৌরাণিক ভাগ যা সেই দর্শনের তুল্যরূপ প্রকটিত করে। তৃতীয়ত: ধর্মের অধিকতর তুল্যভাগ অর্থাৎ বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানাদি। চতুর্থত: ও প্রধান হচ্ছে ওস্তাদত্ব অর্থাৎ ধর্মের তত্ত্ব বোধে বোধ করা, অপরোক্ষানুভব করা। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিভেদ বিষয় সংঘর্ষ দূর করে বিভিন্ন ধর্মসেবীদের প্রেম-মৈত্রীর রাশিবিহনে বাধার জন্য উপরোক্ত এক বা একাধিক স্তরে চেষ্টা করা হয়েছে। এই সকল প্রচেষ্টার স্বরূপ-নিরূপণ এবং তার পটভূমিকাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুসৃত সর্বধর্মসম্বন্ধের তাৎপর্য ধৈর্যসহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

(১) বিভিন্ন ধর্মের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের জীবন ও বাণীতে অপর ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা দেখা যায়। বিভিন্ন শাস্ত্র-শরিয়তে পরধর্মসহিষ্ণুতার হিতোপদেশ পাওয়া যায়। তৎসঙ্গেও ধর্মসম্প্রদায়গুলি বারংবার ধর্মের দোহাই দিয়ে হিংসা-বৈষম্যের বিববাশ্প ছড়ায়, মানুষকে উদ্ব্যস্ত করে, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন বিপদস্ত করে। সম্প্রদায়কর্তারা গোঁড়ামির তাড়নায় দাবী করে, 'অন্ত ধর্মের মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ সত্য আমাদের ধর্মেই।

২১ Arnold Toynbee's Introduction to 'Sri Ramakrishna and His Unique Message'

আমাদের ধর্মই মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণ করতে সমর্থ।' আত্যন্তিক-কল্যাণ-বিধানে তৎপর অত্যাংশহী স্বেচ্ছাধর্মধর্মজীর্ণ ছিল বলে কোশলে হিঁদেন কাঙ্ক্ষের স্বেচ্ছাদের ধর্মাস্ত্রিত করতে থাকে, অপর সকল ধর্মমত দাবিয়ে নিজেদের ধর্মমতের আধিপত্য বিস্তারের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। জেহাদ, জুসেড, ধর্মের লড়াই ধর্মের বেদীতে অধর্মের পিঁপড়াকে প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মধর্মজীর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক চাপের সৃষ্টি করে অপরের ধর্মমত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নাশ করে। এইভাবে সকল ধর্মমতকে 'একজাতীয়করণের' দ্বারা ধর্মের বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা অনেকে অনেকবার করেছে। একটি ধর্মমতের অপর সকলের উপর বিজয়লাভ তথা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, এর প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে মানবসমাজ বারংবার অস্থির হয়ে পড়েছে।

প্রাচুর্য ধর্মে ধর্মে বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বন্দ্ব-কোলাহলের পটভূমিকাতে শুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : 'যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও এর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া! এ বুদ্ধি নাই যে ঐকে কৃষ্ণ বলছে, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আত্মশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়! এক রাম তাঁর হাজার নাম। বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম।...তাই দলাদলি, মনাস্তর, ঝগড়া; ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি; এসব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে, আস্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করবে।' ২২ ধর্মে ধর্মে বিরোধের মূলে স্বসংস্কার, অজ্ঞানতা, মূঢ়তা, ধর্মোন্নততা। ধর্মের গোড়াদের লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি বলি সকলেই তাঁকে ভাকছে। ষোড়শবীর দরকার নাই।...তবে এই বলা যে মতুষ্যের বুদ্ধি (dogmatism) ভাল নয়; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছি নে এ ভাব ভাল'। ২৩

(২) বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক পাঠ ও আলোচনা করে 'বাদে বাদে জায়তে শুদ্ধবোধঃ' নীতি অনুসারে কোন কোন ধর্মমতের বিভিন্ন ধর্মের সারাংশ সম্বলন করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মব্রহ্ম হতে নিজের পছন্দমত ফল তুলে

২২ কথাবৃত্ত ২।১৩৩

২৩ ঐ ২।১৫।১

ধর্মসম্বন্ধের মাল। গের্বেছেন, মানবসমাজকে সর্ববাদিসম্মত নূতন ধর্মমত উপহার দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রচেষ্টা স্মরণ করা যেতে পারে। উদারজন্মের আকবর প্রধান ধর্মমতগুলির সারভাগ একত্র করে 'দীন-ই-এলাহি' নামে নূতন ধর্মমত চালু করেন। মোহাম্মদ দারাসিকোহ কারদী ভাবার 'মজম-উ-ল-বহরেন' (দুই লাগরের মিলন) রচনা করে শরণীয় হয়ে আছেন। ইদানীং কালে হানমোহন রায় বিচার বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেন, প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মমতের লক্ষ্য 'একেশ্বরবাদ'। তাঁর ধর্মসমীকরণ প্রচেষ্টার কলঙ্করূপ ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ও খ্রীষ্টধর্মের চরনের সমন্বয় বলা যেতে পারে। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টান, ইসলাম ও চীনদেশীয় ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার জন্য 'শ্লোকসংগ্রহ' প্রকাশ করেন। ২৪

এ-ধরনের সমন্বয় প্রচেষ্টা কৃত্রিমতা দোষে দুই। ২৫ এ-ধরনের নূতন ধর্মমতের পশ্চাতে আচার-অহুষ্ঠান রীতি-নীতি বিশ্বাসের ধারাবাহিকতা না থাকায় মানুষ তৃপ্তিস্নাত করে না, নূতন ধর্মমতের প্রতি ধর্মসিঁপাহুগণ আকৃষ্ট হয় না। অপরপক্ষে নূতন ধর্মমতের প্রচার ও পুষ্টিসাধনের জন্য প্রয়োজন সম্প্রদায়ের এবং সম্প্রদায় গড়ে উঠলেই গোঁড়ামি, সন্ধীর্ণতা প্রভৃতি দোষগুলি বাসা বাঁধতে থাকে। এইভাবে লক্ষ্যের সমন্বয় ধর্মবিরোধের স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না।

(৩) প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মমতের মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে দুর্লভ রত্ন। নানাবিধ আচার অহুষ্ঠান সংস্কার বিশ্বাসের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, শাস্ত্র-শরিয়ৎ, মন্দির-মসজিদ, অবতার-পন্নগধর, পুরোহিত-মোক্তা প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত সেই দুর্লভ রত্ন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বিভিন্ন ধর্মমতের রত্নপেটিকার মধ্যে লুকানো রত্নের দিকে দৃষ্টি দিতে পারলেই বিরোধ-বিশেষ হ্রাসের সম্ভাবনা। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সময়ে সুরক্ষিত রত্নভাণ্ডার অহুসন্ধান করে তিনটি প্রধান সূত্র পাওয়া যায়; সেগুলির সাহায্যে ধর্মমতগুলির বৈষম্য দূর করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ধর্মগ্রন্থ ও সাধকদের জীবন ও বাণী থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সকল ধর্মের উপাস্তের মধ্যে রয়েছে একত্ব। তত্ত্ব বা সত্য একই—

২৪ J. N. Farquhar : Modern Religious Movements in India, p. 46

২৫ Rev. Frederic A. Wilmot : Prabuddha Bharata, 1935, Jan.

বিভিন্ন তার নাম। শ্রীমামকক বলেন, 'ঈশ্বর এক কিন্তু ভাবে বহু।' হাছ এক কিন্তু ঝালে, বোলে, অথলে প্রভৃতি নানা রকমে যেমন তাকে আবাদ করা যায়; সেই রকম ভগবান এক হইলেও সাধকগণ তাঁকে বিভিন্ন রকমে উপভোগ ক'রে থাকেন।' ২৬ যে নামেই ডাকা যাক আন্তরিক হলে ভগবান শোনেন। শ্রীমামকক বলেন, "তিনি যে অন্তর্ধামী, অন্তরের চান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে; বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা এই সব শব্দ বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হৃদ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে। যারা 'বা' কি 'পা' পূর্বস্ত বলতে পারে বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন? বাবা জানেন যে ওরা আমাদেরই ডাকছে, তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।" ২৭

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধর্মে উপাস্তকে লাভ করার জন্য যে সকল পথ নির্দিষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে অর্নেকের নিষেধ। পথ অনেক, কিন্তু পথ-বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে ঐক্য। শ্রীমামকক বলেন, 'এই কালীবাড়ীতে আসতে হলে কেউ নোকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেটে আসে। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সন্তিদানশলাভ হয়ে থাকে। নদী সব নানা দিক দ্বিগে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক। সকল ধর্মই সত্য।' ২৮ এর সঙ্গে তুলনীয় পুস্তকগুলির উক্তি: 'কতীনং বৈচিত্র্যাদৃষ্ণুতিল নানাপথজ্ঞবাং নৃণামেকো গম্যামসিপয়সামর্গব ইব'। কোন কোন উন্নাসিক ধর্মসেবী বলেন, মত পথের এই যে ঐক্য এটা আংশিক সত্য। তাঁরা বলেন, নানান পথ দিয়ে কালীবাড়ী পৌছান যায় বটে, কিন্তু প্রাক্রণের কটক থেকে মন্দিরে যাবার একটিই পথ। যেমন ভক্তি কর্ম যোগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে অগ্রসর হলেও সাধক একমাত্র জীবন্তঈশ্বাকাসাংকারের দ্বারা ভববন্ধন ততে মুক্তি লাভ করতে পারে।

তৃতীয়তঃ প্রকৃত ধর্ম একটিই। ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন একই ধর্ম নানান ধর্মমতের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'দেশ-কাল-পাজ্ঞেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছে।' ২৯ স্বামী বিবেকানন্দও বলেন যে, তিনি শ্রীমামককদেবের নিকট শিখেছিলেন, 'জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর-বিরোধী নহে। এগুলি এক

২৬ স্বরেশচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীমামকদেবের উপদেশ, নং ৬০৫

২৭ কথাস্বত ৫/২/১১

২৮ শ্রীশ্রীমামককখাসার (পঞ্চম সংস্করণ), পৃ: ৪৮০-৮১

২৯ কথাস্বত ২/১৫/১১

সনাতন ধৰ্মেই বিভিন্ন ভাবমাত্র। এক সনাতন ধৰ্ম চিরকাল ধৰিয়া বহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আৰু এই ধৰ্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে।’ ৩০ সুতৰাং ধৰ্মে ধৰ্মে যে বিভেদ এটা বাহ্যিক, প্ৰকৃতপক্ষে সকল ধৰ্মেৰ মধ্য রয়েছে একটি আন্তৰ্য এক্য।

ধৰ্ম একটিই। আমাৰ ধৰ্মই অপৰ সকলোৰ ধৰ্মেৰ আকাৰে বিবৰ্তিত বা ৰূপান্তৰিত হয়েছে। সকল ধৰ্মই আমাৰ ধৰ্মেৰ ৰূপভেদমাত্র, এই দৃষ্টিতে স্বধৰ্মাছুষ্ঠান কৰলেও ধৰ্মেৰ বিৰোধ শাস্ত হতে পারে। শ্ৰীৰামকৃষ্ণও বলতেন, ‘আপন ইষ্টমূৰ্ত্তিৰ উপৰ বিশেষ নিষ্ঠা ৰাখিবে, কিন্তু অজ্ঞান মূৰ্ত্তিও সেই ইষ্টমূৰ্ত্তিৰ ভিন্ন ৰূপ ভাবিবে ও প্ৰজ্ঞা কৰিবে। স্বেচ্ছাৰ্ব সৰ্বতোভাবে পৰিত্যাগ কৰিবে।’ ৩১

উপাস্ত দেবতাসকলোৰ বিভিন্ন নাম ৰূপ উপাধিৰ মধ্য এক অদ্বিতীয় পৰম-দেবতা বিৰাজমান, উপাসনা-আৰাধনাৰ বিভিন্ন ধাৰা একই উদ্দেশ্যমুখীন, বিভিন্ন পুৰাণ আখ্যায়িকা একই পৰম সত্যোৰ মহিমা খ্যাপন কৰছে ইত্যাদি ধাৰণা প্ৰথমসহিষ্ণুতা, অপৰ ধৰ্মেৰ প্ৰতি প্ৰজ্ঞা সহানুভূতি ও উদারতা শিক্ষা দেয়। প্ৰকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধৰ্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একই মূল ভাসকে প্ৰকাশ কৰেছে। শ্ৰীশ্ৰীমা তাঁৰ অনন্তকৰণীয় ভাষায় বলেছেন, ‘ব্ৰহ্ম সকল বস্তুতে আছেন। তবে কি জান? সাধুপুৰুষেৰা সব আসেন মাছুষকে পথ দেখাতে, এক এক জন এক এক বকমেৰ বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদেৰ সকলোৰ কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা কালো লাল নানা বকমেৰ পাখী এসে বসে হৰেক বকমেৰ বোল বলেছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল-গুলিকেই আমাৰ পাখীৰ বোল বলি—একটিই পাখীৰ বোল আৰু অন্তগুলি পাখীৰ বোল নয়—এৰূপ বলি না।’ ৩২ এইভাবে বিভিন্ন ধৰ্মমতেৰ মনো হুসামঞ্জস্য এক্য হুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেও ধৰ্মসম্প্ৰদায়গুলিৰ মধ্য বিশেষ যেন দূৰ হতে চায় না। শ্ৰীৰামকৃষ্ণেৰ উদাহৰণটো ধৰা যাক। তিনি বলতেন, “একটা পুত্ৰে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুৱা এক ঘাট থেকে জল নিজে কলনী কৰে, বলেছে ‘জল’। মুসলমানেৱা আৰু এক ঘাটে জল নিজে চামড়ায় ভোলে কৰে—তাৱা বলেছে ‘পানী’। খ্ৰীষ্টানেৱা আৰু এক ঘাটে জল নিজে—তাৱা বলেছে

৩০ বাণী ও বচন, ১ম সং. ৮।৪০২

৩১ শ্ৰীশ্ৰীৰামকৃষ্ণদেবেৰ উপদেশ, নং ৩২৬

৩২ শ্ৰীশ্ৰীমাৰেৰ কথা, ১ম ভাগ, ১০-ব সং, পৃ: ৪৭

(১৪৫)

স্বাক্ষৰ—১০

‘ওয়াটার’। যদি কেউ বলে, ‘না এ জিনিসটা জল নয়, পানী ; কি পানী নয়, ওয়াটার ; কি ওয়াটার নয়, জল’ তাহলে হাসির কথা হয়।” ৩৩ হাসির কথা হলেও দীর্ঘকালের কুসংস্কার হেতে চায় না, বিষেষের বীজ সংজে মরে না। ফলে ভুলক্রমেও যদি মুসলমান হিন্দুর ঘাটে নামে বা খ্রীষ্টান হিন্দুর জলের কলসী ছুঁয়ে কেলে ধর্মধর্মীদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়।

সাম্প্রদায়িক ধর্মমতগুলি প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি-কোশলে মানুষকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে বেঁধে রাখে। সাম্প্রদায়িকতার উদ্বেজনায় মানুষ নীচতা ক্রুরতা উন্নততা প্রভৃতির বিববাংশ উদ্গিরণ করে। সর্বনাশ বিববাংশ হতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হলে শুধু বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ঐক্য অহংসন্ধান, বা উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতার উপদেশ সমস্তার সমাধান দিতে পারে না। পরমভ্রমসহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নয়, প্রবোজন পরমতকে আত্মীয়বোধে দেখা, প্রেম-প্রীতি-প্রকার দৃষ্টিতে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, “Not only toleration, for so-called toleration is often blasphemy, and I do not believe in it. I believe in acceptance. Why should I tolerate? Toleration means that I think that you are wrong and I am just allowing you to live. Is it not a blasphemy to think that you and I are allowing others to live? I accept all religions that were in the past and worship with them all.” ৩৪

(৪) শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমতের সোপান দিয়ে তত্ত্বাহুত্বের শীর্ষে আরোহণ করে খিভেদের প্রাচীর তেঁকে দেন। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্বাস তুলে ধরেন হৃদয়ের একটি উপহার সাহায্যে, ‘সকলেই আপনার জমি প্রাচীর দিয়া ভাগ করিয়া লয় ; কিন্তু আকাশকে কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না। এক অখণ্ড আকাশ সকলের উপর বিস্তার করিতেছে। মহত্মা অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে, জ্ঞান হইলে সকল ধর্মের উপর এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বিবাজিত দেখে।’ ৩৫

৩৩ কথাবৃত্ত ২/১৩৩

৩৪ Swami Vidyatmananda (Ed.): What Religion is in the words of Swami Vivekananda, First Indian Ed. (1972), p. 24

৩৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, নং ২৭

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সর্বধর্মসম্বন্ধের সাধনা করেছিলেন তার দুটি বৈশিষ্ট্য :

প্রথমত: তিনি দেখেছিলেন, ‘যারা ঈশ্বরানুপ্রাণী—কেবল সাধন ভজন নিয়ে থাকে, তাদের ভিতর কোন দলাদলি থাকে না। যেমন পুষ্করিণী বা গেড়ে ভোবায় দল জন্মায়, নদীতে কখনও জন্মায় না।’ ‘যতক্ষণ ঈশ্বর থেকে দূরে ততক্ষণ বিচার কোলাহল। তাঁর কাছে গেলে তিনি কি স্পষ্ট বুঝতে পারবে।’ ৩৬ তিনি বুঝেছিলেন দর্শনতত্ত্বের কোলাহল, স্মৃতিশাস্ত্রের বাক-নৈপুণ্য, পুরাণকাহিনীর মনোহারিত্ব বা অহুষ্ঠানের আড়ম্বর—এসকলের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধের সূত্র পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন ধর্মের মতার্থ সামঞ্জস্য হতে পারে একমাত্র তত্ত্বাত্মত্বের পর্দায়। স্বামী বিবেকানন্দ একটি উপমা সাহায্য বলেছেন, “যদি ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ এবং আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ ধরিয়া সেই কেন্দ্রেই দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রে পৌঁছিব এবং যে-কেন্দ্রে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌঁছিয়া আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু যে পর্যন্ত না সেখানে পৌঁছাই, সে পর্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে।” ৩৭ শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসম্বন্ধসাধনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেমন প্রত্যেক মতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করিয়া লম্বান অহুসরণে নিজ জীবনে উহাদের প্রত্যেকের সাধনা করিয়া উক্তমত-নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়া ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে ভাবে পূর্বের কোন আচার্যই ঐ সত্য উপলব্ধি করেন নাই। ৩৮ শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সাধনপথ ধরে লক্ষ্যে পৌঁছে সাধাবস্তুর ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন; সেই সঙ্গে বিভিন্ন সাধনপথ অহুসরণ করে তাদের উপযোগিতা প্রমাণ করেছিলেন। তিনিই বিভিন্ন ধর্মমতের মতার্থ মর্মাদা দান করেছিলেন। এইভাবে ‘যোগবুদ্ধি ও সাধাবগবুদ্ধি’ উভয়-সহায়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ‘সর্ব ধর্ম’ সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র। ৩৯ তিনি যুক্তি বিচার ও তত্ত্বাত্মত্বের মিলিত আলোকে সর্বধর্মসম্বন্ধের অজ্ঞাত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

সত্যবতই প্রায় উঠতে পারে, সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

৩৬ শব্দভূষণ ঘোষ : শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃ: ৩৬১

৩৭ বাণী ও রচনা, ৩১৬০

৩৮ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুতাব, উত্তরার্ধ, পৃ: ২০০-০১

৩৯ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকতাব, পৃ: ৪০৪

আওতার বাস করছে এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে ঘেঁষ-বিষেঁষে মেতে উঠছে তাদের জন্য শ্রীমামরুফ-প্রদর্শিত সম্বন্ধ-সূত্র কি ভাবে প্রযোজ্য? শ্রীমামরুফ বলেন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্মাস্থান করা। স্বধর্মাস্থান করেও কি ভাবে অপর সকল ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা সম্ভব সে সম্বন্ধে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলতেন, ‘ও কি হীন বুদ্ধি তোরা? জানবি যে তোরা ইষ্টই কালী, কৃষ্ণ, গৌর সব হয়েছন। তা বলে কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজতে বলছি, তা নয়। তবে ঘেঁষবুদ্ধিটা ত্যাগ করবি। তোরা ইষ্টই কৃষ্ণ হয়েছন, গৌর হয়েছন—এই জ্ঞানটা ভিতরে ঠিক রাখবি।’ দেখ না, গেরস্তের বৌ স্বস্তরবাড়ী গিয়ে স্বস্তর, শান্তডী, ননদ, দেওর, ভাস্কর সকলকে যথাযোগ্য মাত্রা ভক্তি ও সেবা করে—কিন্তু মনের সকল কথা খুলে বলা আর শোয়া কেবল এক স্বামীর সঙ্গেই করে। সে জানে যে, স্বামীর জন্যই স্বস্তর শান্তডী প্রভৃতি তার আপনার। সেই বকম নিজের ইষ্টকে ঐ স্বামীর মতন জানবি। আর তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হতেই তাঁর অন্য সকল রূপের সহিত সম্বন্ধ, তাঁদের সব প্রজ্ঞা ভক্তি করা—এইটে জানবি। ঐরূপ জেনে ঘেঁষবুদ্ধিটা ত্যাগ করে দিবি।’ ৪০ ইষ্টনিষ্ঠা তথা স্বধর্মনিষ্ঠার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে বসবাস করতে হবে। সহৃদয় আচরণের মধ্য দিয়ে অপর ধর্মের মানুষকে আত্মীয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে। সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে বৃহৎ এক ধর্মপরিবার—এই বোধে সক্রিয় সহাবস্থান ও সহৃদয় লেনদেনের মধ্য দিয়ে ধর্মসম্বন্ধের চর্চা করতে হবে। শ্রীমামরুফ বলতেন, “যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিষেঁষভাব আর রাখবে না। ‘ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান’ এই বলে নাক সিঁটকে দৃঢ়তা করো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে—যতদূর পার। আর ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দ ভোগ করবে। ‘জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না’।” ৪১ অপর ধর্মের প্রতি প্রজ্ঞা, অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রীতি সহানুভূতিই ধর্মসম্বন্ধ-চর্চার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে বিভিন্ন ধর্মগুলি একটি

৪০. লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ ৪৪

৪১. কথাবৃত্ত ১।১২।২

অপরটির সম্পূর্ণ, একটি অপরটির বিরোধী নয়। এই ভাবটি ধরে 'প্রত্যেক ধর্মই অগ্রান্ত ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত হইবে।' ৪২ স্বধর্মনিষ্ঠার গভীরতা ঐকান্তিকতার সঙ্গে পরধর্মসেবীদের প্রতি শ্রীতি ভালবাসার সার্থক সমবায়ের উপর ধর্মসম্বন্ধের সাক্ষ্য নির্ভর করছে।

ধর্মের প্রাণ প্রত্যাহুভূতি এবং বোধে বোধ অর্থাৎ তত্ত্বাহুভূতিই শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সম্বয়সৌধের ছাদ—নানা মতের সাধনা সেই সৌধের সোপান। বিভিন্ন ধর্মের মণো সামঞ্জস্য তথা ঐক্য সম্ভব একমাত্র তত্ত্বাহুভূতির পর্যায়ে। কোন কোন তাত্ত্বিক জটিল প্রশ্ন তুলেছেন,—যেহেতু লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষাপুঙ্কবের তত্ত্বাহুভূতির আকার এক হতে পারে না, সুতরাং ঐক্য সম্ভব নয়। অষ্টৈতপন্থী জ্ঞানমার্গী বলেন, প্রত্যেক ধর্মসাধনার চূড়ান্ত পরিণতি জীবব্রহ্মৈক্য-বোধরূপ অষ্টৈতাহুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা, ...জানবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।' এই মতে ঐক্য সম্ভব একমাত্র অষ্টৈতাহুভূতির পর্যায়ে। ৪৩ কিন্তু ধর্মসাধনার শেষ ধাপ অষ্টৈতাহুভূতি, এই সিদ্ধান্ত অনেক ধর্মাবলম্বী মানেন না। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসম্বয়-পরিকল্পনায় কি এঁদের স্থান নেই? তাছাড়া এঁদের বাদ দিলে সর্বধর্মসম্বয়-পরিকল্পনাই যে ব্যর্থ হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বভাব-অবগাহী উদার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্বয়চার্চ্য শ্রীরামকৃষ্ণের বোধ হয় অভিপ্রেত নয়। তাঁর

৪২ বাণী ও রচনা, ১৮৩৪

৪৩ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বোস : সর্বধর্মসম্বয়ের প্রকৃত পথ কি? উদ্বোধন, ৩২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা :

“নানা পথ থাকিলেও একটি সাধারণ পথও আছে। অগ্র সকল পথ পরিণামে একই পথে মিলিত হয়। সেইটিই সাধারণ পথ। ইহাই সেই অষ্টৈত পথ। ...এই অষ্টৈত পথে আকৃষ্ট হইবার জন্য বহু পথ আছে। সেই সমস্ত পথের সঙ্গে অগ্র উপায়গুলি মিশিয়া যে বহুপথের কল্পনা করা যায়, সেই সকল উপ-পথকে লক্ষ্য করিয়াই 'যত মত তত পথ' বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই উপপথের পর যে পথ তাহা একই পথ, তাহা সেই জীবব্রহ্মৈক্যবোধরূপ একটি স্বাভাবিক পথ, তাহাই অষ্টৈতবাদীর পথ।”

জীবনীতে দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন সাধনপথে ‘ভাবসাধনার পরাকাষ্ঠার উপনীত’ হবার পর খ্রীষ্টীয়গণনার ইঙ্গিতে ‘সর্বভাবাতীত বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অষ্টৈতত্ত্বসাধনে’ প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমন্বয়পন্থ দিয়েছিলেন, ‘যত মত তত পথ’। অপর, কুপথ, বিপথ পরিত্যাগ করে মাহুতকে তার সহজ আভাবিক পথ বেছে নিতে হবে। যদি আন্তরিক হয়, প্রত্যেক পথই পৌঁছে দেবে তত্ত্বাহুত্বের রাজ্যে, তা সেই অহুত্বের আকার যাই হোক না কেন। ঈশ্বরাহু-ত্ব, ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরকুপালাভ এই ভাবটিকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন ধর্মের একই প্রাণ-মন্দাকিনী বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত। সাধারণভাবে এই ঈশ্বরাহুত্ব তথা তত্ত্বাহুত্বের পর্দায়ই সকল ধর্মের সমন্বয় এবং বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের অবসান সম্ভব। ধর্মসেবীমাত্রই ভগবানের ভক্ত। সকল ভক্তের এক জাত। ভক্ত ভক্ত বিরোধ অস্বাভাবিক, অবাস্তব। এই দৃষ্টিতে সামাজিক ভাব-বিরোধের অবসান করা দরকার। উদারদৃষ্টি খ্রীস্টীয়কাল বলতেন, ‘সব মতই পথ। মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়।’ ‘তাই প্রথমে একটা ধর্ম আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বরলাভ হলে সেই ব্যক্তি সব ধর্মপথ দিয়ে আনাগোনা করতে পারে; যখন হিন্দুদের ভিতর থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু; যখন মুসলমানের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে মনে করে মুসলমান; আবার যখন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে ভাবে ইনি বুঝি খ্রীষ্টান।’ ৪৪ অপরপক্ষে মতলববাজ সম্প্রদায়কর্তাদের লক্ষ্য করে বলতেন, ‘জালায়া পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে মরছে—মর জালায়া—ডুব দেয় না।’ ৪৫

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, ‘অভেদজ্ঞান পূর্ণজ্ঞান না হলে হয় না’ এবং অষ্টৈতত্ত্বই সকল ধর্মসাধনের পরাকাষ্ঠা। কলত, চূড়ান্ত ও স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন অষ্টৈতত্ত্বাহুত্বতে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অষ্টৈতত্ত্ব সর্বধর্মমত গ্রাহ্য নয় স্তরায় অষ্টৈতত্ত্বাহুত্বের স্তরে সকল ধর্মের মিলন সর্ববাদিসম্মত কার্যকর আদর্শ হতে পারে না। ঈশ্বরলাভ তথা তত্ত্বাহুত্বের পর্দায় (তত্ত্বাহুত্বের আকার যাই হোক) সকল ধর্মের মিলন সম্ভব। খ্রীস্টীয়কালের সর্বাকসম্মত সর্বধর্মসমন্বয় একটি বাস্তব সর্বজন-সমাদৃত কার্যকর আদর্শ। এরূপ সমন্বয় Pan Islam-এর মত ‘একধর্মী-করণ’ মতবাদ নয়, নববিধানের মত ত্যাগ্যগ্রাহ্য বিশ্লেষণাত্মক বিচারের দ্বারা সমীকরণ নয়, বা দার্শনিক হেন্সেলের dialectic synthesis নয়, সর্বশাস্ত্রবীকৃত

৪৪ কথাস্বত ২/১৫/১৩ ও ৫। পরিশিষ্ট পৃ: ১২

৪৫ ঐ ৪/২০/৫

প্রত্যেক সাধনভঙ্গনের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্বন্ধ। এই ধর্মবিরোধ নিশ্চিন্তির স্বরূপ একটি ভাবগত তত্ত্বমাত্র নয়, বাস্তবে স্থপরীক্ষিত একটি কার্যকর পদ। শ্রীমাম-
কৃষ্ণের সম্বন্ধ-আদর্শের বৈশিষ্ট্য ;—কাউকেই নিজের ধর্ম ছাড়তে হ'ব না, অপর
প্রচলিত বা অস্তিত্ব কোন ধর্মমত গ্রহণ করতে হবে না। যে যেখানে আছে
সে সেখানে থেকেই অগ্রসর হবে নতুন লক্ষ্যের দিকে। অভিব্যক্তিভিত্তিক
এই সম্বন্ধের আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম।
ইতিবাচক এই আদর্শটির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে শ্রীমামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যে,
'আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি।...হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান—
নানা পথ দিয়ে এক জায়গাতেই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে,
আন্তরিক তাঁকে ভাকলে, ভগবান লাভ হবে।' ৪৬ সার্বভৌমিক এই সর্বধর্ম-
সম্বন্ধের নীতি অহুযায়ী প্রত্যেক ধর্মসেবীকে জো সো করে ধর্মের লক্ষ্য ঈশ্বরানু-
ভূতির দিকে আন্তরিকভাবে অগ্রসর হতে হবে। অপর সকল ধর্মের আচার্য
ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর নিয়ে বাড়া-
বাড়ি না করে ধর্মমতের মিলনকেন্দ্রে ঈশ্বরানুভূতির দিকে ব্যাকুলভাবে এগিয়ে
যেতে হবে। ব্যবহারিক জীবনে অপর ধর্মাবলম্বীদের আত্মীয়জ্ঞানে গ্রহণ
করতে হবে। সাধকের বহিজীবন ও আন্তরজীবনের সম্বন্ধ কি ভাবে করতে
হবে তার নির্দেশও দিয়েছেন শ্রীমামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন, "রাখাল যখন গরু
চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। আবার
যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক হয়ে যায়। নিজের
ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে'।" ৪৭ একই মানব-সমাজের অল্প বিভিন্ন
ধর্মসম্প্রদায়ের মাহুত। তাদের ধর্মমত ভিন্ন হলেও তাদের মিলনে সত্যসত্যই
কোন বাধা নেই।

শ্রীমামকৃষ্ণ-উপলব্ধ সার্বভৌমিক সর্বধর্মসম্বন্ধ-সিদ্ধান্তটি স্বামী বিবেকানন্দ
জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা পুনঃ প্রমাণিত করেছেন। জগতে
প্রচলিত যাবতীয় ধর্মসাধনার পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে
মাহুতের প্রকৃতি অহুযায়ী মাহুতকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। ভাব-
প্রবণ, বিচারনৈমিত্ত, কর্মপটু ও ধ্যাননিষ্ঠ,—এই চার প্রকার মাহুতের চাহিদা। পূরণের
জন্য সৃষ্টি হয়েছে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ। জগতের

৪৬ কথাসূত্র ৪।২২।৪

৪৭ ঐ ১।১২।২

বিভিন্ন ধর্মমত চারটি যোগের এক বা ততোধিক যোগ (অর্থাৎ উপায়) ধরে মিলিত হয়েছে ঐক্যবিন্দু ঈশ্বরদর্শন তথা তত্ত্বাত্মভূতিতে। ধর্মবিজ্ঞানের আদর্শ ও উপায় নির্দেশ করে স্বামীজী লিখেছেন, "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this Divine within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, or worship, or psychic control or philosophy—by one, or more, or all of these—and be free." ৪৮ ধর্মবিজ্ঞানের নীতি ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন যে জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের সম্বন্ধে চরিত্র গঠন করাই বর্তমান যুগের আদর্শ। যেমন স্বস্থ খাদ্য (balanced diet) স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণে সাহায্য করে তেমনি মানব-প্রকৃতির মূল চারটি উপাদানের স্বস্থ বিকাশের দ্বারা মানুষ দৃঢ় পদক্ষেপে ধর্মজীবনের মূল লক্ষ্য—তত্ত্বাত্মভূতির দিকে অগ্রসর হতে পারে; সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের সঙ্গীর্ণগতি সহজে অতিক্রম করে ধর্মসম্বন্ধের কেন্দ্রবিন্দু-অভিমুখীন জীবন গড়ে তুলতে পারে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বাত্মভূতি-কেন্দ্রিক ধর্মই বর্তমানের চাহিদা। বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, 'We want...a religion which is the basis of all special religions, a religion which can include them all, and one which harmonizes with science, philosophy and metaphysics.' ৪৯ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠক যাত্রাই জানেন যে স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-ভিত্তিক ধর্মসম্বন্ধ বা স্বামী অভেদানন্দের বৈজ্ঞানিক ধর্মের উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

এইসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বগ্রাহী উদ্ধার ধর্মমতের দ্বারা শুধুমাত্র যে বিবদমান ধর্মসম্প্রদায়সকলের বিরোধ নিঃশেষে ভগ্ন হতে পারে তাই নয়, এই সম্বন্ধ-নীতির ভিত্তিতে জগতের মানুষের জীবন-সমস্যার সামগ্রিক-ভাবে সমাধান সম্ভব, পৃথিবীতে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মিলন ও শান্তি স্থাপন সম্ভব। সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের কোলাহলে বিরক্ত হয়ে মানুষ কখনও কখনও 'ঢাকী শুক ঢাক' বিসর্জন দেবার চেষ্টা করেছে। বৃহস্পতি-চার্য্য-বার্কসের

৪৮ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I (1963), p. 257

৪৯ Prabuddha Bharata, 1900, Vol. V, p. 102

চেনা-চামুণ্ডার ধর্ম 'শোবিতের দীর্ঘশাস', 'আম জনতার আকিঙ' ইত্যাদি অভিযোগ তুলে ধর্মবর্জনের জন্ত ঢেঁড়া দিয়েছে। ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্রমাজেই জানেন মাহুকের মনের চিরন্তন গভীর বুড়ুকা মিটাতে একমাত্র সক্ষম ধর্ম, মাহুকের লুপ্তপ্রায় গুপ্ত মংসকে সার্থকভাবে প্রবুদ্ধ করতে সমর্থ একমাত্র ধর্ম, বিশ্ব-শান্তির মূল নিধান একমাত্র ধর্ম। এষ ধর্ম: সনাতনঃ। এই ধর্মকে অবলম্বন করে, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসম্বন্ধের মৌলিক আদর্শ অহুসরণ করেই ব্যক্তি-সত্তার জাগৃতি, সমষ্টি-মাহুকের সমৃদ্ধি তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সর্বভাবস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক অবদান সর্বধর্মসম্বন্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে ইনি আমাদের মতের লোক।' ৫০ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজে এই ভাবাদর্শের বিশাল ভূমিকা। প্রশ্ন করা যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কি? তিনি কি যথার্থই সর্বধর্মসম্বন্ধের একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন? তাঁকে এই সকল জটিল প্রশ্ন করলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, 'অত সব জানিনি বাপু। আমি খাই দাঁই থাকি মায়ের নাম করি।' অহুসরণ প্রশ্ন করা হয়েছিল শ্রীমাকে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'দেখ বাবা, তিনি যে সম্বন্ধভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবেই বিভোর থাকতেন। জীঠানেরা, মুসলমানেরা, বৈষ্ণবেরা যে যেভাবে তাঁকে ভজনা করে বস্তুলাভ করে, তিনি সেই সেই ভাবে সাধনা করে নানা লীলা আশ্বাসন করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোন হুঁশ থাকত না।...সর্বধর্মসম্বন্ধ ভাবটি যা বললে, ওটিও ঠিক। অন্তান্তবাবে একটা ভাবকেই বড় করায় অস্ত সব ভাব চাপা পড়েছিল।' ৫১ জগজ্জননীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ধর্মসম্বন্ধের সাধনা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হয়েছিল; সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সম্বন্ধ-ভাবাদর্শ এত সৌন্দর্য মাধুর্য স্ফটি করেছে। তিনি নিজস্বমুখেও বলেছেন, '...তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাতাবে ও নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার জন্ত তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতার। কৃপাময়ী মা-ও তখন তাঁহার ঐ ভাব

৫০ কথাস্থত ৪।২.৭৩

৫১ শ্রী গভীরানন্দ : শ্রী সারদাদেবী, পৃ: ৫৮৫

দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়া এবং আমার-
ছাড়া করা হইয়া লইয়া সেই ভাবে দেখা দিতেন। এইরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের
সাধন করা হইয়াছিল।'৫২

এটা স্বাক্ষর করিয়া যুগ, সত্য যুগ। যুগকর্তার ইচ্ছিতে স্বামী বিবেকানন্দ সকল
ধর্মমতের সকল পথের মাঝখানে সমবেত করে নিজে পুন্যোগামী হয়ে চলেছেন।
বিভিন্ন জন বহন করছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের পতাকা। প্রত্যেকটি পতাকার উপর
লেখা রয়েছে, 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মত-
বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'৫৩ আর শাস্তগতি জনসমূহ থেকে উদ্ভূত হচ্ছে
এক অশ্রুতপূর্ব মহামিলনের ঐক্যতান। স্বরসম্বন্ধের মধ্যে চেনা যায় প্রত্যেকটি
স্বরের স্বাভাব্য ও বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি স্বরের মূলগত ঐক্যমূলে আবিষ্কার
করে স্বরসম্বন্ধ করেছেন ওস্তাদ স্বরশিল্পী। ফলে বৈচিত্র্যের পাশাপাশি ঐক্য
অগূর্ব এক স্বরলোক সৃষ্টি করেছে। প্রগতিশীল নির্দলীয় এই দলটি সার্বভৌম
সর্বধর্মসম্বন্ধভিত্তিক মানবসমাজকে স্বাগত জানাচ্ছে।

৫২ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃ: ২৮০-৮১

৫৩ চিকাগো ধর্মমহাসভার স্বামী বিবেকানন্দের শেষ বাণী

‘স্বপ্নের পট’

শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে নন্দ বহুর বাড়ীতে ঈশ্বরীর ছবি দেখতে গিয়েছিলেন। দোতলায় হলঘরের চারিদিকের দেওয়ালে চাকানো বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি। ঈশ্বরীয় মূর্তিসকল দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ে একটি নূতন ধরনের তৈলচিত্রের উপর। তিনি সহাস্তে বলে উঠেন, “ও যে স্বপ্নের পট।”

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রসন্নের পিতা। তিনি মুগ্ধ হেসে বলেন, আপনিও ওর ভিতর আছেন।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) —“ওই একরকম, ওর ভিতর সবই আছে—ইদানীং তাব।”

‘স্বপ্নের পট’ আধুনিক, ওর ভিতর “সবই আছে”—সকল প্রকার ভাবের সমন্বয় ঘটেছে। পটখানি সত্যসত্যই অসামান্য; তাব-গাছীর্ষে ও ভাবের প্রকাশ-ব্যঞ্জনায় অতুলনীর, অমিতীর। পটখানি পটুয়ার শিল্পনৈপুণ্যে বিস্তৃত হয়েছে প্রধান সকল ধর্মভাবের সমাবেশ। চিত্রপটে ধর্ম ধর্মে বিরোধের নিষ্পত্তি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অনৈক্য ও ঘন্সের অবলান হৃষ্টভাবে বিঘোষিত, নিবিড় ঐক্যের আকর্ষণে অতীতের অশ্ললবর্ণাক্ত বিচ্ছেদের বাঁধগুলি বিধ্বস্ত। শান্তি-সৌন্দর্য-সংবলিত চিত্রপটে প্রীতি শান্তি সজাব অপরাধভাবে উচ্ছল। এখানে তাবসম্বন্ধের রহস্যময় অপারূত করাই পটুয়ার প্রধান লক্ষ্য। সমন্বয়-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আচার্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সমন্বয়মূলক অহংসন্ধানে নিরত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—একজন গুরু, অপবজন শিষ্যের ভূমিকার অবতীর্ণ। উত্তম গুরু শ্রদ্ধাবান শিষ্যের সান্নিধ্যে তুলে ধরেছেন সমন্বয়ের রাশীবন্ধনে হৃৎসংবন্ধ ভাববাজের এক অপূর্ব হৃদয় দৃষ্ট। পটের ভিতর পট, যেন পটনাট্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র দুক, তাঁদের দৃষ্ট মর্ত্যলোকে আবির্ভূত এক স্বর্গলোকের দৃষ্টকাব্য। চমৎকার চিত্র-পরিচালনা, গভীরতাবভোতক তাব ব্যঞ্জন। ধর্মজগতের অতীত বিবাদেব ইতিবৃত্ত ও বর্তমানেব বিজ্ঞাতিকর সমস্তার আদিকে মহান্ ভবিষ্যতেব আভাস রঙবিচিত্রার আলোকে উচ্ছল হয়ে আছে। শিল্পীর হৃদয়িকল্পনা, গভীর দৃষ্টভঙ্গী ও বলিষ্ঠ বোখা ও রঙ-ব্যবহার পটটিকে বাউন্স অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে

ভুলেছে। আবার পটনাটোর প্রধান দুই নায়ক, ত্রিপুরার ও কেশবচন্দ্রের প্রশংসায় শীলমোহরযুক্ত এই চিত্রপট ভাববস্তুর প্রামাণিকতায় অবিসংবাদিত-ভাবে ঐতিহাসিক-গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্রপটের ভাববস্তুর যথার্থ রসায়নের জন্ত প্রয়োজন ইতিহাসের কয়েকটি অংশের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। মুসলমান রাজত্বকালে কয়েকশত বছরের শাসন ও শোষণে ভারতবর্ষ পূর্ণদুঃস্থ, সে সময়ে সোনার ভারতবর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ। ভারতবাসী ইংরেজের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। বলদর্পী বিদেশী রাজত্বের আশ্রয়পুষ্ট ঐতিহ্য ব্যাপক-ভাবে ভারতবাসীর ধর্মাস্তরকরণে নিযুক্ত হয়। ১

এদিকে বিবিধ ঐতিহাসিক উপাদানের সংঘাতে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয় নতুন প্রাণশক্তির আগরণ। দেশী-বিদেশী পণ্ডিতগণের চর্চা ও চর্চায় ভারতীয় সংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় ধনরত্ন পুনরাবিষ্কৃত হয়। অতীতের গৌরব দেশবাসীকে সচেতন ও মহান ভবিষ্যতের রূপায়ণে প্রবুদ্ধ করে। নবজাগৃতির শিহরণ ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর ধর্মজীবনে বিপুল আলোড়ন তোলে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন। চৌদ্দ বছর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলন বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। কেশবচন্দ্র সেনের যোগদানে আন্দোলন জনপ্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী হয়, কিন্তু ভাবগত অনৈক্যে বিধা-বিভক্ত হয়। ১৮৬৮ খ্রীঃ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়; আদি সমাজের পুরোধায় থাকেন দেবেন্দ্রনাথ। কয়েক বছর পরে সমাজের বিধিভঙ্গের অভিযোগে নেতা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সৃষ্টি করেন 'নববিধান'।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আৰ্যসমাজ মুসলিম ও ঐতিহ্যের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে কণ্ঠে দাঁড়ায়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা গোলাম আহমদ-

- ১ ১৮৬৬ খ্রীঃ এই বৎসরে কেশবচন্দ্রের ত্যাগ হ'তে জানা যায় ১,৫৪,০০০ জন ভারতবাসী ঐতিহ্য গ্রহণ করেছে। তার জন্ত ৫১৯ জন বিদেশী পাত্রী নিযুক্ত ও তাদের সেবাস্বার্থে জন্ত বার্ষিক ব্যয় ২,৫০,০০০ পাউণ্ড। ১৮৭৬-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাত্যে কাশিক দুর্ভিক্ষের সময় দুঃস্থদের মধ্যে অন্নের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্য বিতরণ করা হয়। ব্যাপক ধর্মাস্তর ঘটে। ক্রমে ধর্মাস্তরের প্রাবল উত্তর-ভারতকেও গ্রাস করে।

সংগঠিত সদর অজ্জয়ান-ই-আহমদীর মুসলিম ধর্ম সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে বঙ্গপত্রিকার হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে গড়ে উঠে থিয়োসফি আন্দোলন, চার বছর পরে মূল কার্যালয় ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত হয়। এই আন্দোলনের অঙ্গতম ফলশ্রুতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে দেশবাসীর সচেতনতা। ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ধর্মভাবের প্রাবল্য নূতন যুগের সূচনা করে এবং ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেন নবজাগৃতির প্রাণ-উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন ঘটে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের পুত্র-সান্নিধ্যে অভিভূত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিলিপিকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, “ইংরাজী-পড়া কেশবচন্দ্র সেন-আদি পণ্ডিতেরাও ঠাকুরকে দেখে অবাক হয়েছেন। কি আশ্চর্য! নিরক্ষর ব্যক্তি এসব কথা কিরূপে বলছেন? এ যে ঠিক যীশুখ্রীষ্টের মত কথা! সেই গ্রাম্য-ভাষা! সেই গল্প ক’রে বুঝান—যাতে পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যীশু Father Father করতে করতে পাগল হয়েছিলেন, ইনি মা মা করে পাগল! শুধু জ্ঞানের অক্ষর ভাঙার নহে—ঈশ্বরপ্রেম ‘কলসে কলসে ঢালে তবু না স্ফূর্ত’। ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ইহারও অলঙ্কার বিশ্বাস, পাহাড়ের মত অটল বিশ্বাস। তাই কথাগুলির এত জোর!... কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন, এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন করে হ’ল! কি আশ্চর্য! কোনরূপ বিবেচ্যভাব নাই, সব ধর্মাবলম্বীদের আদর করেন—কাহারও সহিত ঝগড়া নাই।” ২

প্রায় পাঁচ বছর পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি রবিবারে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-বার্ষিক-উৎসবে ঘোষণা করেন তাঁর মানসপুত্র ‘নববিধানের’ জন্ম। তিনি আবেগময়ী ভাষায় বলেন, “...অগ্নিকার দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? পৃথিবী বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ‘আজ তুমি নূতন কাপড় পরিয়াছ কেন?’ বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, ‘পৃথিবী, তুমি, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজগর্ভে ধর্মের শিশু গঠিত হইতেছিল। বহুকালের প্রসবযন্ত্রণার পর... এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদায় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর অন্তরে বেদ-বেদান্ত পুরাণ তত্ত্ব বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিয়াছে।...ঈশা, যুধা, খ্রীষ্টচন্দ্র, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মোহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদ্বিগকে সঙ্গে

২ ভক্তমঙ্গলী, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ: ৪২-৫০

লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের একটি ভাই জন্মিয়াছে তনিয়া, তাঁহাদের কত আশ্বাস!...পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে, শিশু সকলকে আপনার ভিতর এক করিয়া লইয়াছেন। শিশু জন্মিবামাত্র অল্পক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। সে কি সামান্য শিশু! সেই শিশুর জন্ম হইল, আর দুই ধর্ম থাকিতে পারে না, দুই বিধান থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম এক হইল, সকল বিধান এক বিধানান্ত-গত হইল।...নববিধান শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্ত জন্মিয়াছেন।...নূতন বিধান, নূতন শিশু সকলের ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন।” ৩

পরের বছর ২২শে জানুয়ারি কেশবচন্দ্র কলিকাতা টাউন হলে একটি ভাষণে বলেন, “নববিধানের এই রূপ। যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রবিধান ও সকল আশুপুরুষের সম্বন্ধ নববিধান। এটা বিচ্ছিন্ন একটি মতবাদ নয়। নববিধান একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যা সকল ধর্মকে গ্রহণিত করেছে, প্রকাশ করেছে ও সমন্বিত করেছে।...নববিধান মূল্যবান কর্তব্য, যাতে যুগযুগান্তরের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মণিমুক্তা নিবদ্ধ।...এভাবে আমরা নূতন মাহুত সৃষ্টি করব, সেই মাহুতের ইচ্ছাশক্তি হবে ভগবান যীশু, মস্তিষ্ক সক্রিয়, হৃদয় শ্রীচৈতন্য, আত্মা হিন্দু ঋষি এবং দক্ষিণ হস্ত জনসেবী হাওয়ার্ড।” ৪ নববিধানের ভাবদর্শনের বাস্তব রূপায়ণের জন্য নূতন পতাকা ও প্রতীক তৈরী হয়, নব-সংহিতা রচিত হয়; ‘নিশান-বরণ ও আরাট্রিক’, ‘হোমাহুষ্ঠান’, ‘ঈশ্বরের ব্যাপ্তিকালে জলাভিষেক অহুষ্ঠান’, ‘দোষস্বীকার-বিধির প্রবর্তন’ প্রভৃতি সংযুক্ত হয়; নূতন ভাব জনপ্রিয় করার জন্য নগরসকীর্তন প্রবর্তিত হয়, কয়েকবার ‘নববৃন্দাবন’ নাটক মঞ্চস্থ হয়, ‘নবনৃত্য’ অনুষ্ঠিত হয়।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীগণ বিশ্বাস করতেন যে, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশে নববিধানের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে নববিধান যে-রূপ ধারণ করে তা বিশ্লেষণ করে ইতিহাস-বেত্তা লিখেছেন, “Thus the thing is coming to this that the New Dispensation is tending to become a stereotyped creed like Mahomedanism, with the New Samhita

৩ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়: ‘আচার্য কেশবচন্দ্র’, শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃ: ১৫৬-৬৮

৪ Keshub Chunder Sen: Lectures in India, Navavidhan Publication Committee, পৃ: ৪৫২-৫৩

as an infallible book like the Koran, and with Mr. Sen as the central figure and Minister, like Mahomed the Prophet.”* সাধারণ মাহুবেৰ কাছে নববিধানের যে ভাবমূৰ্ত্তি প্রকটিত হয় তার চিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীশ্রীৰামকৃষ্ণ পুঁথিকার :

কেমন নুতন ধৰ্ম কেশবের গড়া ।
ঠিক যেন বিবিধ কুসুমের বাঁধা তোড়া ॥
নববিধানের কথা তোড়া তুলনায় ।
সকল ধৰ্মের কিছু কিছু আছে তার ॥
মহাভাব গৌরাক্ষের প্রেমসম্বিত ।
কৃষ্ণের একটি জ্ঞান গীতার কথিত ॥
সহিস্কৃতা ক্রাইষ্টের নির্ভরতা বল ।
অপার করুণারাজি তার সমুজ্বল ॥
বালাভাব শ্রীশ্রীভূর পরা যত্নে রাখা ।
সন্তানের সমতুল্য বা বলিয়া ডাকা ॥
অন্ত অন্ত স্থানে যাহা বুকিল হৃদয় ।
সইল তাহার কিছু করিয়া আদর ॥
আগাগোড়া বাদ দিয়া কণাংশ লইয়া ।
নববিধানের দেহ দিল লাজাইয়া ॥ (পৃ: ৩৫৮)

নববিধান বৈচিত্র্যের সমাবেশে আপাতমনোহর হলেও ধৰ্ম্মজুগাঙ্গী মাজাই অসুস্থত্ব করেন “নববিধানের গাছে ফল নাহি ফলে ॥ ফল-ফলা অসম্ভব স্পষ্ট দেখা যায় । তোড়াতে ফুলের খেলা গাছ কোথা তার ॥”

অনেকেই মনে করেন কেশবচন্দ্রের উপর শ্রীৰামকৃষ্ণের গভীর প্রভাবের আংশিক প্রতিফলন নববিধানের রূপ ধারণ করেছে। ‘বেদব্যাস’ (মাঘ ১২২৪) লেখেন, “পরমহংসদেবের আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর হৃদয়ে যুগান্তের উপস্থিতি হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে ‘নববিধান’ প্রসব হয়।” ‘ভক্তমঞ্জরী’ (দ্বিতীয় ভাগ, ২য় ও ৬য় সংখ্যা, পৃ: ২০) লেখেন, “কেশববাবু যে পরমহংসদেবের ভাব লইয়া নিজের অবস্থা ও বর্তমান ইউরোপীয় ভাবে রঞ্জিত করিয়া

* Shibnath Sastri: History of the Brahmo Samaj, Vol. II, P. 106

নববিধানের নাম দিয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ যাহা তিনি নববিধানে নূতন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কিছুই নূতন নহে। যাহাকে নূতন বলিয়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃতিবহু মাত্র।” এবিষয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাংশসকল গ্রন্থের সামগ্রিক অভিমত বিশেষ লক্ষণীয়। “দেখা যায়, একপক্ষে তিনি (কেশবচন্দ্র) ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্মমূর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন...যেখানে বলিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।...অপরপক্ষে তিনি ঠাকুরের ‘সর্ব ধর্ম সত্য যত মত তত পথ’ রূপ বাক্য সম্যক লইতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ ত্যাগপূর্বক ‘নববিধান’ আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মসম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাতিকে ঐরূপ আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।” ৬ (দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ৪৩৭)

আমরা দেখতে পাই, আলোচ্য চিত্রপটখানির উক্তোক্তার ধারণাও ছিল অসূক্ষ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্বে কেশবের প্রচারের ফলে দক্ষিণেশ্বরে লোকের ভিত্তি হ’তে থাকে। সেই সঙ্গে আসে অগ্রসারী ভক্তগণ। ক্রমে ক্রমে আসেন রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, বাখালচন্দ্র ঘোষ, স্বরেশচন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে স্বরেশচন্দ্র মিত্র থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্ততম রসদ্বার ব’লে চিহ্নিত করেছিলেন ও স্নেহভরে ‘স্বরেন্দ্র’ বা ‘স্বরেন্দ্রর’ ব’লে ডাকতেন— তিনি ছিলেন সরল বিশ্বাসী ও বিশেষ উৎসাহী। তাঁর আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি যা সত্য ব’লে বিশ্বাস করতেন তা সর্বসমক্ষে প্রচার করতে দেরি বা বিধা করতেন না। অত্যাগতদের মত রাম, স্বরেশ ও মনোমোহন শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসম্বন্ধের ভাবাদর্শে উৎসাহিত হন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের জীবন ও

৬ বিদেশী ছদ্মনাম বিখ্যাত রামকৃষ্ণ-জীবনী-লেখকের মতও অসুধাবনবোধ্য। রোম’ রোল’ লিখেছেন, “The essential ideas were already formed when he met Ramakrishna for the first time (p. 169).” অপরপক্ষে ইন্দীনাংকালে ঈশারউত্ত লিখেছেন, “The New Dispensation was fundamentally a presentation of Ramakrishna’s teachings—as far as Keshab was able to understand them. ...he regarded Ramakrishna as a living embodiment of his creed.” (p. 165)

বাণীতে শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের নিকট সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বধর্মসম্বন্ধের ভাবাদর্শ চিত্রপটে চিত্রায়ণ করায় আকাজকা হর স্বরেশচন্দ্রের। স্বরেশ, রামচন্দ্র ও মনোমোহন একই পল্লীতে বাস করতেন। স্বরেশ তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে চিত্রপটের পরিকল্পনা করেন। জনৈক গুপী চিত্রশিল্পী সেই স্বরেশের পরিকল্পনাটিকে রূপদান করেন একটি তৈলচিত্রের মাধ্যমে। পরিকল্পনাকারীদের অন্ততম রামচন্দ্র লিখেছেন, “এই চিত্রখানি প্রস্তুত করিবার দুইটি ভাব ছিল। প্রথম, এই ভাবটি পরমহংসদেবের নিজের সাধনার কলস্বরূপ এবং দ্বিতীয়, উহা কেশববাবু পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়াছেন।” ৭ রামচন্দ্র অন্তত লেখেন, “সেই ছবিতে পরমহংসদেবকে সর্বধর্মসম্বন্ধের স্তররূপে এবং কেশববাবুকে শিষ্টস্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল।” ৮ ‘জন্মভূমি’ পত্রিকাও লেখে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সারকথা এবং কেশবচন্দ্রের ঐ ভাবগ্রহণ জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যই চিত্রপটের পরিকল্পনা। ৯ স্বরেশচন্দ্র তৈলচিত্রখানি কেশবচন্দ্রকে দেখতে পাঠান। কেশবচন্দ্র তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেন একখানি চিঠিতে। তিনি লেখেন, “Blessed is he who has conceived this idea.” ১০ উৎসাহিত স্বরেশচন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তৈলচিত্রখানি দেখিয়ে আনেন। চিত্রপট সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অবিস্ময় প্রতিক্রিয়া লিখিত নাই, কিন্তু চিত্রের ভাব তাঁর অহুমোদন লাভ করে, সন্দেহ নাই। স্বরেশচন্দ্র তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানার দেওয়ালে পটখানি টাঙিয়ে রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাড়ীতে বসে পটখানি দেখেন, পূর্বে না হলেও।

অন্ততঃ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর।

শ্রীরামকৃষ্ণ তৈলচিত্রখানিকে বলতেন ‘স্বরেশের পট’; রামদত্ত প্রভৃতি কয়েকজনের মতে ছবির বিষয়বস্তু ‘কেশবের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ’, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথায়তকারের মতে ‘নববিধানের ছবি’, সাধারণ লোক ছবিটির নামকরণ করে ‘সর্বধর্মসম্বন্ধ’। ১১ আর নববিধান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে-

- ৭ রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃ: ১৪০
- ৮ তত্ত্বমঙ্গলী, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১২২৩ সাল, প্রাবণ
- ৯ জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
- ১০ জীবনবৃত্তান্ত, পৃ: ১৪০; তত্ত্বমঙ্গলী দাবী করেন ঐ চিঠিখানি স্বরেশবাবুর কাছে সংরক্ষিত ছিল।
- ১১ জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ: ২২

(১৬১)

ছবিটির নাম দেওয়া যেতে পারে 'নববৃন্দাবন মেলা'। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে চিরঞ্জীব শর্মা-প্রণীত নববৃন্দাবন নাটকের শেষ দৃশ্বে দেখা যায় যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধুর মিলন। সেখানে নববিধানের বিজয় নিশান উড়িয়ে সব ধর্মের মাহাত্ম্য একত্রে গাইছে :

জয় দয়াময় দয়াময় দয়াময়
জয় প্রভু পরব্রহ্ম হরি লীলারসময়।
জয় মা আনন্দময়ী জগতজননীর জয়।
আজ নববৃন্দাবনে, লয়ে যত ভক্তগণে
করিলেন প্রেমময় সর্বধর্মসম্বরণ।
জনক নারদ ঈশা যোগী যাজ্ঞবল্ক্য মূশা ;
শিব শাক্য মহম্মদ জীব শ্রীগৌরাক্ষের জয়।
যত শাস্ত্র যত ধর্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম,
সকলেরই এক মর্ম, একেতে হইল লয় ॥

মূল তৈলচিত্রখানি ৪২" X ৩০" ক্যানভাসের উপর আঁকা। বর্তমানে চিত্রপটের সম্মুখভাগ কাঁচে ঢাকা এবং প্রায় ৩" কাঠের ফ্রেমে বাঁধান। ১২ এই তৈলচিত্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 'Unity and the Minister', Supplementary copy, 'প্রতিবাসী' (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১৯, বৈশাখ), 'জন্মভূমি' (২১ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩২০, বৈশাখ) ইত্যাদি। আর জনপ্রিয়তার জন্ত তৈলচিত্রের অনুলিপি বিভিন্ন বাড়ীতে ঠাই পায়, যেমন কেশব-অহুয়ানী নন্দ বহু ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অহুয়ানী মনোমোহন মিত্রের বাড়ীতে।

তৈলচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি, তাঁর ১৮৮১ খ্রিঃ ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল কটোগ্রাফার স্টুডিওতে তোলা আলোকচিত্রের প্রায় অনুলিপি। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, চিত্রে কেশবচন্দ্র যে প্রতীকচিহ্নটি ধরে আছেন সেটি কেশবচন্দ্র ১৮৮১ খ্রিঃ জাহ্নয়ারিতে ব্রাহ্ম উৎসবের দিনে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন ১৩ এবং পরবৎসর জাহ্নয়ারিতে সেটি নিয়ে নগরকীর্তন

১২ মূল তৈলচিত্রখানি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে স্মরণার্থের মধ্যম ও বয়সে বড় ভাই মহেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র উমাশঙ্করনাথ মিত্রের নিকট। প্রায় ৪০ বছর পূর্বে জনৈক চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তৈলচিত্রখানি স্বেচ্ছায় তৈরি করা হয়।

১৩ J. N. Farquhar: Modern Religious Movements in India, p. 56.

করেছিলেন। অল্পমান হয়, তৈলচিত্রের রচনাকাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হ'তে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে।

স্বদেশ পেশাবার শিল্পীর মূল্যায়ন চিত্রপটে স্পষ্ট। ঋক্বেদের অর্ডার মাস্কি চিত্রপট আঁকা হলেও শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য ও নৈপুণ্য ভাবসম্মেলন ও প্রকাশব্যঞ্জনার প্রকট। কবি ভাবপ্রকাশের জন্ত ব্যবহার করেন ভাষা, চিত্রশিল্পী অল্পভূতি প্রকাশ করেন বর্ণিকার সাহায্যে। চিত্র, চিত্রোপকরণ ও চিত্রকরের ভাবের সাম্যে চিত্রপট সার্থক হয়, আবার চিত্রকর ও চিত্রকরটার সহ-মর্মিতার চিত্রপটের ভাববস্তু হয় প্রাণবন্ত। আলোচ্য চিত্রপট এই বিচারের মাপকাঠিতে স্প্রশংসিত।

পটভূমিকায় নীলাকাশের চক্ৰাতপ সবুজ বনানীর শীর্ষরেখা স্পর্শ করেছে যেন। সম্মুখে বামদিকে একটি গীর্জা, মধ্যে একটি মসজিদ, ডাইনে একটি শৈব মন্দির। ১৪ মসজিদ ও মন্দিরের মধ্যে নীলাকাশে ভাসছে একটি শব্দচিহ্ন, নীচে তাকিয়ে দেখেছে বিচিত্র একদল মানুষের জমায়েত। পটভূমিকা ইঙ্গিত করছে মন্দির-মসজিদ, শাস্ত্র-শরিয়ৎ, আচার-অহুষ্ঠান ইত্যাদি ধর্মজীবনে প্রয়োজনীয় হলেও গোণ। ধর্মজীবনের লক্ষ্য তত্ত্বের অপরোক্ষভূতি। উপর্যুক্ত আঙ্গিকের পটভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন অপরোক্ষভূতিসম্পন্ন মহা-মানবগণ, যারা ধর্মতত্ত্ব বোধে বোধ করেছেন।

ভাববস্তুর বিচারে দৃষ্টপট দুভাগে বিভক্ত—দৃক ও দৃশ্য। বাস্তবসত্ত্বক আীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র এখানে দৃকস্বরূপ এবং প্রাতিভাসিক ভাববাজ্যের আনন্দঘন একটি প্রকাশ এখানে দৃশ্য। বাস্তব ও প্রাতিভাসিক সত্তার মধ্যে পার্থক্য দেখাবার জন্ত শিল্পী শুধুমাত্র আীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের গলায় মালা দেননি, ভাববাজ্যের সকল মূর্তির গলায় ঝিয়েছেন। ঘড়ির টাওয়ার শোভিত এ্যাংলিকান চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে কেশবচন্দ্র ও আীরামকৃষ্ণ। যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত কেশবচন্দ্রের জীবন ও সেই কারণে পঞ্চাশ-ভূমি গীর্জার সম্মুখে কেশবচন্দ্রের প্রতি আীরামকৃষ্ণের উপদেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রুতি, পাঞ্জাবী ও চান্দর পরে কেশবচন্দ্র সর্ববাসে দাঁড়িয়ে। তাঁর তানহাতে একটি পতাকাবাহী দণ্ড, সবুজরঙের পতাকা দণ্ডে জড়ানো, আর দণ্ডের উপর

১৪ আমকৃষ্ণ বেলাত হঠ হতে প্রকাশিত Memoirs of Ramakrishna গ্রন্থে সংযুক্ত এই ছবিতে একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। শৈব মন্দিরের স্থানে দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির।

একটি প্রতীক। অর্ধচন্দ্রের উপর একটি ত্রিশূল, বামে একটি ক্রুশ ও ডাইনে একটি পাশা। অর্ধচন্দ্রের নীচে নক্সা করা পাদপীঠ, তাতে লেখা ‘হর্নোমৈব কেবলম্’। নববিধান আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিতাবে যুক্ত ধর্মসম্মতদের এই প্রতীক ১৫ খ্রীঃ দ্বিঃ কেশবচন্দ্র ঐক্যমিষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ঐরামকৃষ্ণের দিকে। ঐরামকৃষ্ণের পরনে সবুজ বনাতের কোট, লাগপেড়ে যুতি, যুতির আঁচল বাঁম কাঁধে ঝুলছে। বেকস ফটোগ্রাফার স্টুডিওতে তোলা আলোকচিত্রের সঙ্গে এই ছবির গভীর সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য যথেষ্ট। পার্থক্য হাত দুটির বিস্তার। আলোকচিত্রে ঐরামকৃষ্ণের ডান হাত একটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত, আর বাঁ হাত বুকের নীচে ভাঁজ করা। তৈলচিত্রে ঐরামকৃষ্ণ বাঁ হাতে সম্মুখের একটি দৃষ্ট নির্দেশ করছেন, ডান হাত বুকের নীচে বিস্তৃত কিন্তু তাঁর হাতের আঙ্গুল নির্দেশ করছে প্রান্তর দৃষ্ট। আলোকচিত্রে ঐরামকৃষ্ণের পায়ে চটিজুতা, এখানে খালি পা। তা ছাড়াও এখানে ঐরামকৃষ্ণের মুখারবিন্দে যে দিব্যজ্যোতির আভাস, আলোকচিত্রে তার অভাব। ঐরামকৃষ্ণের চক্ষে ভাবের নেশা, তিনি যেন ভাবমুখে কেশবচন্দ্রকে উপদেশ দিচ্ছেন।

ঐরামকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসরণ করলে চোখে পড়ে ভাবরাজ্যের একটি মনোরম দৃষ্ট। মন্দির ও মসজিদের মধ্যের ভূখণ্ডে প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন যীশুখ্রীষ্ট ও ঐর্চৈতন্ত। তাঁরা প্রেমভরে অর্চৈতন্ত হয়ে নৃত্য করছেন, চারিদিকে ছিটিয়ে দিয়েছেন আনন্দের কাগ। তাঁদের ঘিরে আছেন বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধক ও সিদ্ধ ভক্তগণ। খ্রীষ্ট ও চৈতন্তের ডাইনে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভূমি মসজিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন

১৫ স্বপ্নেন্দ্রনাথ সর্বধর্মসম্মতদের ভাব নিয়ে এই প্রতীক-যন্ত্রটি তৈরী করেন। কেশবচন্দ্র ঐ যন্ত্রটি নিয়ে একবার নগরকীর্তনে বের হন। (পরম-হংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃ: ১৪০; জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) সম্ভবতঃ সেই দিনটি ছিল সোমবার, ১৮৮২ খ্রি: ২৩শে জানুয়ারি। কেশবচন্দ্রের সমাধি-স্থানের উপর স্থাপিত নববিধানের প্রতীকে দেখা যায় অর্ধচন্দ্র, ত্রিশূল, ক্রুশ ও বৈদিক ঔকারের সম্মিশ্র। (P. O. Mazoomdar: The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, p. 324) আবার তৈলচিত্রের প্রায় অনুরূপ প্রতীক-যন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় ঐরামকৃষ্ণের মহাসমাধির অন্ততঃ আলোকচিত্রে। সেখানে শুধু বলরাম বহু প্রতীক যন্ত্রটি ধরে আছেন।

বৈষ্ণবাচার্য, তাঁর হাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, হাতে লাল রঙের ত্রিকোণ পতাকা ; তারপর দাঁড়িয়ে একজন তারিকাচার্য, তাঁর মস্তাকর্ষ, মাথায় জটাভূট, হাতে ত্রিশূল। চোগাচাপকানধারী পাগড়ি-দাড়ি-শোভিত তৃতীয় ব্যক্তি সিংহ সস্ত্রদ্বারের নেতা। হাতে হাও-বাঁধা সবুজ ত্রিকোণ পতাকা, চুড়ায় প্রতীক পাঞ্জা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একজন এ্যাংলিক্যান চার্চের পাদরী হাতে ক্রুশের প্রতীক ; পিছনে দাঁড়িয়ে একজন কনফুশিয়াস-ধর্মাবলম্বী চৈনিক, তাঁর মাথায় চারদিক চাঁচা—মধ্যে ঝুলছে মোটা বেগী ; তাঁর সম্মুখে দাড়ি ও পাগড়ি-শোভিত জর্নেক মোজা—হাতে দণ্ড, হাওর চুড়াতে অর্ধচন্দ্র। মোজা-সাহেব ও যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে জর্নেক বোঁদ। এই সাতজন দাঁড়িয়ে অবাক বিশ্বের যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীচৈতন্তের বৈতন্য উপভোগ করছেন। শ্রীচৈতন্তের বামে অর্থাৎ হিন্দু মন্দিরের সম্মুখে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সস্ত্রদ্বারের দশজন ভগবদ্ভক্ত। শ্রীচৈতন্তের বামে একজন গুজরাতি ও একজন মাদোয়াড়ী ভক্ত। সম্মুখভাগে দুইজন খোল বাজাচ্ছে, একজন বাজাচ্ছে রামশিঙা অপর একজন একজোড়া বড় থলনী। নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় এদের দেখা যাচ্ছে। তাঁদের পাশে একজন শৈব ও একজন তারিক ও অপর দুজন রামাইত সস্ত্রদ্বারের ভক্ত তালে তালে নৃত্য করছেন। কল্পনা করা যেতে পারে তাঁদের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বধর্মসম্বরের ঐক্যতান। ঐক্যতানে প্রত্যেক স্বরের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট অথচ সব কিছু মিলে সৃষ্টি করেছে স্বরলোকের অতুলনীয় সুরবাঞ্ছনা। এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিভিন্ন ধর্ম ও সস্ত্রদ্বারের প্রতীকচিহ্নগুলি মালাশোভিত, কারণ প্রতীকগুলি প্রবর্তকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ অঙ্গাঙ্গী।

ভাববাহ্যের দৃষ্টটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কৃত হবে একটি গভীর ভাব। মোটামুটিভাবে, নৃত্যরত শ্রীচৈতন্তের তানদিকের ব্যক্তিদের সমাবেশ বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় এবং বাসনিকের ব্যক্তিদের মিলন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সস্ত্রদ্বারের সমন্বয় সূচনা করছে। ১৬ একদিকে সাম্প্রদায়িক ধর্মে নিষ্ঠা, অন্যদিকে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের উদারতা ও বিশ্ববাসীর সঙ্গে আত্মীয়তা এই দুই-ই শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ শিক্ষা। একদিকে স্বধর্মের মাধ্যমে কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে ধর্মসমন্বয়ের

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১৮৮০) : ‘কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ সকল ধর্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব শাক্ত শৈব ইত্যাদি সকল সস্ত্রদ্বারের সমন্বয়।’ এই প্রসঙ্গে তত্ত্বমগ্নী, চতুর্ভুজ, একাদশ শংখা ব্রতব্য।

ভাবাদর্শে সঙ্গীর্ণতার বন্ধনমোচন—এই দুইটি ভাবের মিলন ঘটেছে চিত্রপটে।
 স্বধর্মে নিষ্ঠা ও পরধর্মের প্রতি শ্রীতি ও আত্মীয়তা—এই আপাতবিরোধী
 ভাবদ্বয়ের সূত্র সমাধান করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সাধনার কলশ্রুতিস্বরূপ
 স্বধর্ম-নদী ও সর্বধর্মের মোহনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নূতন ভারতবর্ষের তপোবন।
 সেই তপোবনের কলপতি যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ, শিক্ষার্থী তাপসগণের প্রতিনিধি
 কেশবচন্দ্র। এই তপোবনে শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে গড়ে উঠবে নূতন ভারতের সমাজ,
 এখানকার ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে স্থায়ী বিশ্বশান্তি।

‘স্বরেক্ষের পট’ সেই তপোবনের প্রতিচ্ছায়া। পটের অলোকসুন্দর
 লালিত্য সর্বপ্রকার সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের ছোঁতক, পটের বর্ণালির আভা উজ্জল
 ভবিষ্যতের আহ্বায়ক। ফারুকুহার মনে করেন এই অলোকসামান্য
 চিত্রপটখানি ‘সামগ্রিক পুনর্মিলনের’ অষ্টাশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যোগ্য উৎসর্গ। ১৭
 আমাদেরও মনে হয়, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশলি ‘স্বরেক্ষের
 পট’। সেই কারণেও ‘স্বরেক্ষের পট’ শুধুমাত্র অসামান্য নয়, অদ্বিতীয়।

১৭ J. N. Farquhar: Modern Religious Movement In
 India (1915) p. 199, “It seems to me that nothing could be
 more fitting than to dedicate this interesting piece of theological
 art to the versatile author of Re-union All Round.”

শ্রীমদ্ভক্তের কালীপূজা

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কালীময়, তাঁর সাধনকালে জগজ্জননী মাকালীর সঙ্গে নিত্য বোঝাপড়া, সাধনোত্তরকালে মাকালীর সঙ্গে নিত্য লীলা-বিলাস। শ্রীরামকৃষ্ণ ‘মাকালীর অবতারা’^১ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবরূপে কালী, আত্মশক্তি, অনন্তরূপিণী। তিনিই ‘আত্মারামের আত্মা কালী’। তিনিই ত্রিগুণধারিণী জগদ্ধাত্রী। “বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার অসংখ্য পুত্রকন্যাগণকে জ্ঞানভক্তি দ্বিবার জন্ত অবতীর্ণ।”^২

জগজ্জননী মাকালীই মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভক্তদের কল্যাণের জন্ত এসেছেন। মানুষের সাজে, মানুষের মাঝে এসেছেন, তাঁকে চেনা কঠিন। ‘মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা-ভুজা, বোগ-শোক, কখনও বা ভয়—ঠিক মানুষের মত।’ অপর দশজনের মত তাঁর শরীর আধি-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, ব্যাধির প্রাবল্যে তাঁর স্থায় শরীর নীর্ণ দীর্ণ হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা যায়। রোগ ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করে। চিকিৎসায় বিশেষ সফল পাওয়া যায় না, উপরন্তু আগস্ট মাসে তাঁর কণ্ঠতালু হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ ভক্তগণকে ভাবিত করে। ভক্তগণ যুক্তিবিচার করে প্রস্তাব করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের হুচিকিৎসার জন্ত তাঁকে কলকাতায় নেওয়া ব্যবহার। বালকবতাব শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কলকাতায় বাস করতে রাজী হন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় চলে আসেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর। শনিবার সকাল বেলা। বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জি ষ্ট্রীটের স্বল্প-পরিসর বাড়ী ঠাকুরের পছন্দ হয় না। তিনি নিকটবর্তী বলরাম বস্ত্র বাড়ীতে গঠেন।

১ Sister Nivedita's letter dated 16.3.1899 to Miss McLeod :
“The Mother says that Sri Ramakrishna told her that Swami was...a direct incarnation of the National God and He Himself of Kali.”

২ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ : শ্রীরামকৃষ্ণজীবন। উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

ঠাকুরের কলকাতার অবস্থানের সংবাদ প্রচার হতেই বলরামভবনে যেন ভক্তের মেলা বসে যায়। ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ, গোপী-মোহন, ষারকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি ঠাকুরকে পরীক্ষা করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন, ব্যাধি দুর্বারোগ্য। ইংরাজ ডাক্তারও যোগমুক্তি সহজে সন্দেহ প্রকাশ করেন। নিরুপিত হয় ব্যাধি রোহিণী অর্থাৎ ক্যানসার।

ভক্তগণ নিকটবর্তী শ্রামপুতুর অঞ্চলে একটি পছন্দমত বাড়ীর সন্ধান করতে থাকেন। শ্রামপুতুর পল্লী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পরিচিত। এই পল্লীতে কাপ্তেন বা বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ ঘোষ, মাষ্টার বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তগণের বাস ছিল। ঠাকুর এই সব ভক্তের বাড়ীতে কয়েকবার গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। শ্রামপুতুর স্ট্রীটের উত্তর দিকে এই বাড়ী। তখনকার ঠিকানা ছিল ৫৫ নং শ্রামপুতুর স্ট্রীট। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাড়া-বাড়ীতে আসেন ২রা অক্টোবর, সন্ধ্যার পর। সেদিন ছিল শুক্রবার, ১৭ই আশ্বিন, ১২২২ সন। ৩ গঙ্গা থেকে বেশ কিছুটা দূর হলেও, বাড়ীখানি ঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পছন্দ হয়।

একখানি লম্বা ঘর—সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাবার পথ। প্রথমেই ‘বৈঠকখানা’ নামে পরিচিত সুপ্রশস্ত ঘরখানিতে ঢোকার দরজা। এই ঘরখানি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। বৈঠকখানার পশ্চিমে ছোট ছোট দুখানি

৩ এই তারিখ দুটি সুব্রহ্মনাথ চক্রবর্তীর লেখা “শ্রামপুতুর বাড়ীতে কালী-পূজা” প্রবন্ধ (উল্লেখন ৬১ বর্ষ ৬৩২ পৃঃ) হতে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ-যোগ্য যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ) বলেন, ঠাকুর দুর্গা-মহাষ্টমীর প্রায় একমাস পূর্বে শ্রামপুতুরে আসেন। লাট মহারাজের স্মৃতিকথা (পৃঃ ২৬৪) ও লীলাপ্রসঙ্গ (৫ম খণ্ড, ২২৬ পৃঃ) অত্সারে ঠাকুর বলরাম-ভবনে রাজ সাত দিন বাস করেন। সুব্রহ্মনাথ চক্রবর্তী বলেন, তিনি কথামতকারের দিনলিপি থেকে তারিখ দুটি পেয়েছেন।

৪ পরবর্তীকালে এই বাড়ীর অনেক পরিবর্তন ঘটে। ৫৫।এ ও ৫৫বি, দুটি প্রাঙ্গণে বিভক্ত হয়। মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু টিনের প্রাচীর। বর্তমানের ৫৫এ প্রাঙ্গণটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছিলেন। তিনি দোতলার যে হল ঘর-টিতে বাস করতেন সেটা বর্তমানে একাধিক কক্ষে বিভক্ত। দোতলার ওঠার একটি পৃথক সিঁড়িও তৈরী হয়েছে।

ঘর—একটি ভক্তদের জন্ত, অপরটি শ্রীমাতাঠাকুরানীর রাজিবাসের জন্ত।
বৈঠকখানা ঘরে যাবার পথে পূর্বদিকে ছাদে উঠার সিঁড়ি। ছাদে যাবার
দরজার পাশে চার বর্গহাত পরিমাণ একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল।

শ্রামপুত্রের এই বাড়ী অবতারপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের আগন্তালীলাভূমি। এই
লীলাক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান দুই মাস নয় দিন মাত্র। তিনি কান্দিপুর উদ্ভানবাগীতে
ষণ্ম ১১ই ডিসেম্বর। এখানকার লীলাবাসের কত না আনন্দস্বত্বের সঙ্গে জড়িত।
দিনগুলি তত্ত্ব-ভাব-রসে জারিত। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানাত্মিনী ভাঃ
মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃপা করেন, বলেন, “(তুমি) শুধু—তুমি রসবে।” তাঁর
পুত্রকে ডেকে বলেন, “বাবা, আমি তোমার জন্ত এখানে এসেছি।” এখানেই
ভক্তপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোষাামী ঘোষণা করেন—ঢাকাতে অলৌকিকভাবে তাঁর
শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন। এখানেই ঐটান প্রভুদয়াল মিশ্র ঠাকুরের শরণাগতি নেন।
এখানেই কৃপাকাতর বিনোদিনী সাহেব লেজে ঠাকুরের দর্শনলাভে সন্মুখ হন।
এখানে কত কত নতুন ভক্ত উপস্থিত হন। অবতারের লীলাবিলাসের অমির
স্বভিতে পরিপূর্ণ এখানকার দিনগুলি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রামপুত্র বাড়ীতে এসেছিলেন কণ্ঠরোগের চিকিৎসার
জন্ত। তাঁর আগমনবাব্তা লোকমুখে রাষ্ট্র হয়। পরিচিত-অপরিচিত লোক
দলে দলে উপস্থিত হয়। তাঁর কাছে এলেই লোকের শান্তি ও আনন্দ।
আনন্দপুত্রের সান্নিধ্য, তাঁর কৃপালাভের জন্ত লোকের ভিড় লেগে যায়।
অহেতুককৃপাসিদ্ধ! তাঁর দয়ার ইয়ত্তা নাই—সর্বদাই তাঁর একমাত্র চেষ্টা কিসে
লোকের মঙ্গল হয়। মনে হয় শহরের লোকদের বিশেষভাবে কৃপা করার জন্তই
যেন তিনি কলকাতায় বাস করছেন। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্র-
লাল সরকার চিকিৎসা শুরু করেন। ব্যাধির স্থায়ী প্রশমন হয় না। ঠাকুরের
হঠাৎ শরীর শীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়। গলার কত হতে পুঁজ রক্ত করতে থাকে।
কিন্তু সে বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানপমাত্র নাই। তিনি অকাতরে কৃপা
বিতরণ করতে থাকেন। তিনি যে অবতার। অবতার ঈশ্বরের অজ্ঞপ্রদর্শিত।
অবতার আসেন তারণ করতে। তারণ করাই তাঁর অঙ্গপ্রহ। অঙ্গপ্রহ-বিতরণ
যেন তাঁর বিষয় এক দায়। “যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায়।”
—অবতারের এই আকৃতি চিকিৎসক বোঝে না, লেবকগণ মানতে চায় না।
কৃপাদাতা দয়াল ঠাকুরের কৃপাবিতরণ দেখে সবাই মুগ্ধ হয়।

যোগীর সেবাসুপ্রদর্শন জন্ত নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবকভক্ত এগিয়ে

আসেন। লাটু, গোপাল (ছোট), কালী, শশী, শরৎ প্রভৃতি কয়েকজন 'জীবনোৎসর্গ করিয়া সেবারত' আরম্ভ করেন। বোগীর পথ্য প্রস্তুত করার জন্য শ্রীমাতাঠাকুরানী হৃদয়েশ্বর থেকে আসেন, অসংখ্য অন্নবিধা অগ্রাহ্য করে ঠাকুরকে বোগমুক্ত করার আশায় বুক বেঁধে কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবার আত্ম-নিয়োগ করেন। হুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, হুই সেবায়ন্ত্রের বিধিব্যবস্থা হয়, কিন্তু ব্যাধির প্রাবল্যের ঝাপটা-হাওরাতে সেবক ও ভক্তদের আশাদীপ প্রায়ই কৈপে কৈপে উঠে।

শারদীয়া দুর্গোৎসবে বাংলাদেশ যেতে উঠেছে। কলকাতার পল্লীতে পল্লীতে আনন্দের ছড়াছড়ি। ভক্ত 'স্বরেন্দ্র' ঠাকুরের অল্পমতি নিয়ে প্রতিমার দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। মহাষ্টমীর রাতে সন্ধিপূজার সময় ঠাকুর হঠাৎ ভাবাবেগে দাঁড়িয়ে পড়েন। নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ, লাটু, নিরঞ্জন ও অন্ত ভক্তগণ ঠাকুরের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। ৫ ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়শরীরে জ্যোতির্বস্তু ধরে স্বরেন্দ্রের দুর্গামণ্ডপে উপস্থিত হন, স্বরেন্দ্র তাঁকে দুর্গাপ্রতিমার পাশে দেখতে পান। পূজামণ্ডপের পরিবেশ আনন্দঘন হয়ে উঠে। ভক্তগণ বিমোহিত হন।

ক্রমে আসে কোজাগরী পূর্ণিমা। আনন্দময় ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখেন, "চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াশা।" ভাব গভীর হলে সমাধিস্থ হন, আবার ভাবচক্ষে দেখেন, ভয়ঙ্কর কালকামিনী মূর্তি, যেন বলছে, 'লাগ্! লাগ্! লাগ্! তেল্‌কি লাগ্! সত্যিই যেন ভেলকি! শরীরে দুয়ারোগ্য ব্যাধি, অসহ্য যন্ত্রণা, রক্তক্ষরণে শরীর অতি ক্ষীণ জীর্ণ, দীর্ণ, কিন্তু দেহ-বোধ-বিবিক্ত যোগী পুরুষ সদাসর্বদা ঈশ্বররসে ভাসছেন, ডুবছেন। তিনি নিজমুখে বলেন, "কিন্তু দেখছি যে এটা আলাদা।...নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায়—চপর চপর করছে।" ৬ রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ সর্বদাই আনন্দে ভাসছেন, অল্পগ্রহ করে অপরকে আনন্দ দান করে আনন্দলাভ করছেন।

এগিয়ে আসে আখিন-অমাবস্তা। ৮জামাপূজার প্রস্তুতি চলতে থাকে ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে। ভক্ত দেবেশ্বনাথের অনেকদিনের বাসনা প্রতিমা গড়ে

৫ স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা, পৃ: ৭৬

৬ কথাবৃত্ত ৪।২২।২

শ্রামাপূজা করেন। নানা কারণে বাসনা পূর্ণ হয়নি। আবার অপূর্ণ বাসনার উদয় হয়। ভাবেন জগজ্জননীর আদরের সন্তান ঠাকুরের উপস্থিতিতে প্রতিমায় শ্রামাপূজা করতে পারলে জীবন সার্থক হয়। বিশেষ দিনে বিশেষতঃ কালী-পূজার দিনে ঠাকুর ভাবের ঘোরে ভাসতেন। ভাবের আধিক্যে বাধির বৃদ্ধি আশঙ্কা করে ভক্তগণ দেবেদ্বের প্রস্তাব নাকচ করেন।

ভাবগ্রাহী ভগবান। ভক্তের আর্তিতে তিনি সহজেই স্মৃড়া দেন। অচিন্ত্য উপায়ে ভক্তের শুদ্ধ বাসনা পূরণ করেন। শ্রামপুত্র বাটীতেও শ্রামাপূজার প্রভৃতি চলতে থাকে। প্রভৃতি চলে গোপনে। আদরিণী শ্রামা যাকে গোপনে ডাকতে হয়। গোপনে জানাতে হয় হৃদয়ের আকৃতি। প্রতিমাতে কি আর জগজ্জননীকে ধরা যায়? মাতৃসাধক গিয়েছেন:

“মায়ের মূর্তি গড়তে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।

মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে।”

আদরিণী শ্রামা মা ভাবেতে ধরা দেন। ভাবের মূর্তিতেই আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রামপুত্র বাটীতে শ্রামাপূজার প্রভৃতি চলেছিল। শ্রামাপূজার দিন বিশেষভাবে পূজাহুষ্ঠানের জন্ত ভাবের প্রতিমা তৈরী হচ্ছিল। শ্রামাপূজার পূর্বদিন উপস্থিত কয়েকজন ভক্তকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “পূজার উপকরণ সকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস—কাল কালীপূজা করিতে হইবে।” ৭ শ্রামাপূজা হবে, এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে যায়। সংবাদে ভক্তগণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। কিন্তু পূজার আয়োজন সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ না থাকায় ব্যবস্থাপকগণ নানা জল্পনা করতে থাকেন। কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। শেষকালে মুকুবি ভক্তগণ স্থির করেন, গন্ধপুল ধূপ-দীপ, ফলমূল ও মিষ্টান্ন জোগাড় করা যাক, ৮ পরে ঠাকুর যেমন নির্দেশ দেবেন তেমন করা যাবে। বীরভক্ত

৭ স্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৩৫১। স্বামী অভয়ানন্দ তাঁর “আমার জীবনকথা” গ্রন্থে (পৃ: ৭৭) লিখেছেন, “কাল মা কালীর পূজা করতে হবে। সংক্ষেপে পূজার উপকরণগুলি আয়োজন করে রাখিস।” শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার বলেন, কালীপূজা নিকটবর্তী হলে কোনও একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মাটারকে পূজার আয়োজন করতে বলেন।

৮ বৈষ্ণবানন্দ সান্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাস্মৃতি, পৃ: ২৮৭, “প্রাক্ত ভক্তগণকে কহিলেন, ...তোমরা ষাটিকতানে ঠাকুর পূজার আয়োজন কর।” এ ছাড়াও

কালীপদ ঘোষ পূজোপকরণ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিকটে ২০ নং শ্রামপুস্ত্র লেনে তাঁর বাড়ী। তাঁর কর্মতৎপরতা ভক্তমহলে সুবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জৈনক জীবনীকার লিখেছেন যে, শ্রামপুস্ত্রে ঠাকুরের অবস্থান-কালে “তিনি পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন!” ঠাকুর তাঁকে ডাকতেন ম্যানেজার। নরেন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন দানাকালী। তিনি পরম উৎসাহে শ্রামপুস্ত্রের আয়োজন করতে তৎপর হন।

এদিকে ঠাকুরের দেহের ব্যাধির বাড়াবাড়ি চলেছিল। শ্রামপুস্ত্রের পূর্বদিন ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র চিহ্নিত হয়ে ঔষধের পরিবর্তন করেন। তিনি এক দাগ নক্সভমিকা ঔষধ দেন। মনে হয় এই ঔষধসেবনে কোন উপকার হয় না। ২ কর্তৃপীড়ার বাড়াবাড়ি চলেছে, সেদিকে ঠাকুরের যেন কোন খেয়াল নাই। ‘হাড়মাসের খাঁচা’ শরীরের প্রতি তাঁর বরাবরই অবজ্ঞা। বিখ্যিত ভক্তসেবক নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। “ঠাকুরের মনের আনন্দ ও প্রেমমত্ততা কিছুমাত্র হ্রাস না পাইয়া বরং অধিকতর বলিয়া ভক্তগণের নিকট প্রতিভাত হইল।”

ক্রমে উপস্থিত হয় শ্রামপুস্ত্রের দিনটি। সেদিন ৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার। প্রাতঃকাল থেকেই চিন্তিত্ত্বদুঃখাতে মহানন্দে বিহার করতে থাকেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ঘিরে থাকে ভাবধন-ছাতি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মহেন্দ্র মাষ্টার সকালবেলাতে ঠনঠনের ৮/সিঙ্কে-শরী কালীমাতাকে ফুল ভাব চিনি সন্দেশ দিয়ে পূজা দিয়েছেন। স্নান করে পূজা দিয়েছেন। নয়পদে ঠাকুরের কাছে মাগের প্রসাদ এনে দিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিভাবে দাঁড়িয়ে সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঠাকুরের পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, কপালে চন্দনের ফোঁটা—মনোমোহন তাঁর মূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার রাসপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনে এনেছেন, ঠাকুর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে উপহার দেবেন।

চটিছুতা পায়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন, সঙ্গে মাষ্টার।

ঠাকুরের হৃৎপিণ্ড নির্দেশ না থাকায় এবং ঠাকুরের শরীরের অত্যধিক অস্থিতা বিবেচনা করে ভক্তগণ সংক্ষেপে পূজোপচার সংগ্রহ করেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

২ পরদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার রোগীর সমস্ত বিবরণ শুনে প্রতাপ-ডক্টরের ঐ ঔষধের সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

রামপ্রসাদের ভ্রামসঙ্গীত নিয়ে কথা হয়। তিনি রামপ্রসাদের চারটা গান বাছাই করেন। মাঠার বলেন যে ঐ ধরনের গানের ভাব ভক্তির সরকারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “আর ও গানটাও বেশ!—‘এ সংসার ধোঁকার টাটি।’ আর ‘এ সংসার মজার কুটি! ও তাই আনন্দ বাজারে লুটি।’” বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের মনোভাব হুস্পষ্ট এই গানের কলিতে। তাই এতে তাঁর আনন্দ।

হঠাৎ ঠাকুরের শরীরের মধ্যে চমক খেলে যায়। তিনি চটিজুতা ছেড়ে স্থিরভাবে দাঁড়ান। গভীর সমাধিতে স্থাপুৰ্ণ অবস্থান করেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি অতি কষ্টে তাব সংবরণ করেন।

দোতলার ‘বৈঠকখানা’ ঘরের পশ্চিমভাগে দেয়ালের পাশে একটি বিছানা পাতা। বিছানার উত্তরাংশে তাকিয়ার মত উঁচু পোছের একটি বালিশ।^{১০} অনেক সময় ঠাকুর তাতে হেলান দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে অর্থশাসিত অবস্থায় বিশ্রাম করতেন। সেদিন বেলা দশটা নাগাদ ঠাকুর বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে বসেছিলেন। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাঠার প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত চতুর্দিকে বসে ঠাকুরের অন্তত্বাণী আগ্রহভরে শোনেন। ঠাকুর এক সময়ে মাঠারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার বলে এস। পাকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো দেখি।”^{১১} ইতিমধ্যে মাঠার ও রাখাল ভিন্ন অপর সকলে অন্ত ঘরে চলে গিয়েছিলেন। মাঠার পাশের ঘরে গিয়ে ঠাকুরের আদেশ সকলকে জানান।

অন্তান্ত দিনের মত অপরাহ্ন প্রায় ছুটার সময় ভক্তার সরকার উপস্থিত হন। সঙ্গে বন্ধু নীলমণি সরকার। সে সময় ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত ছিলেন গিরিশচন্দ্র,

১০. মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের স্মৃতিকথা : উদ্বোধন, ৩৮ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

১১. গিরিশচন্দ্র ঘোষ “রামদাদা” প্রবন্ধে (তত্ত্বমঞ্জরী, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) লিখেছেন, “ঠাকুর শ্রীমান কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, ‘আজ কালীপূজার উপযোগী আয়োজন করিও।’ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মতে ঠাকুর ভ্রাম্যপূজার দিন ভক্তদের বলেছিলেন পূজার আয়োজন করতে। অহুমান হয় ঠাকুর পূজার পূর্ব দিন ও পূজার দিন একাধিকবার একাধিক ব্যক্তিক বলেছিলেন।

‘পাকাটি’র রহস্য জানা যায় না। অহুমান করা যেতে পারে কি যে ঠাকুর হোমের অন্ত প্রস্তুত হতে ইঙ্গিত করেছিলেন? হোমের বিবরণ অবশ্য কেউই বলেননি।

কালীপদ, মাষ্টারশাই, নিরঞ্জন, রাখাল, মণীন্দ্র, লাটু প্রভৃতি অনেকে। প্রারম্ভিক কথাবার্তার পর ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার গানের বই ছুটি ডাক্তার সরকারকে উপহার দেন। যদিও ডাক্তার সরকার মা কালীকে বলেছিলেন 'সাঁওতাল মণী', আশাসকীত তাঁর খুবই প্রিয়। তাঁর আকাজ্জা ভজন-কীর্তন শোনেন। ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার ও একজন ভক্ত ঠাকুরের নির্বাচিত চারটি গান পরিবেশন করেন :

(১) 'মন কর কি তবু তাঁরে, যেন উন্নত আধার ঘরে।'

(২) 'কে জানে কালী কেমন বড়দর্শনে না পায় দরশন।'

(৩) 'মন রে কৃষিকাজ জান না।'

(৪) 'আম্ন মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্লতকমূলে রে মন চারি ফল জুড়িয়ে পাবি।'১২

অতঃপর ডাক্তারের ইচ্ছা হয় 'বুদ্ধচরিতে'র গান শোনেন। ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ যৌথকণ্ঠে গান ধরেন, "আমার সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তাবের হার।" তারপর গান করেন, "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই" ইত্যাদি। বুদ্ধ-গীতের পর হয় গৌরাঙ্গ-গীতি : "আমায় ধর নিতাই, আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন;" "প্রাণভরে আম্ন হরি বলি, নেচে আম্ন জগাই-মাধাই" এবং "কিশোরীর প্রেম নিবি আম্ন, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।" যখন গায়কদ্বয় গাইতে থাকেন "প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ নাচায়," সে সময় লাটু, মণীন্দ্র এঁদের ভাবাবেশ হয়। তাঁরা বাহুজ্ঞান হারান। ক্রমে সকলে সহজ আত্মবিক হন। বেলা গড়িয়ে চলে। ডাক্তার ঔষধের বিধান করে বঙ্গুসহ ঠাকুরের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করেন।

দিনমণি অস্ত যায়, অমাবস্তার সন্ধ্যা নেমে আসে। নিবিড় আঁধারের মধ্যে একাকী মহাকালী মহাকালের সঙ্গে রমণ করেন। জগদম্বার বরপুত্র ঠাকুর আজ ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। তিনি অহর্নিশ মাকে দেখেছেন, তিনি একদণ্ডও মা ছাড়া থাকতে পারেন না, তিনি যে বালক। তত্পরি আজ বিশেষ দিন, তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না।

জামা মায়ের আরাধনার ব্যাপক আয়োজন করেছেন বিশ্বপ্রকৃতি।

১২ সেদিন সকাল ন'টার সময় ঠাকুর নিজে এই চারটি গান বাছাই করে-ছিলেন এবং বলেছিলেন, 'এই গান সব ডাক্তারের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে।' (কথাস্বত: ৫।২২।১ ও ৩।২২।২ দ্রষ্টব্য)

এদিকে ঘরে ঘরে দীপাবিভা। আলোর আলোয় ঘরদোর রাস্তা ঘাট। জ্যোতির্ময়ী স্ত্রী মায়ের অভ্যর্থনার জন্য দিগুণ আলোকসজ্জা, চতুর্দিকে আলোর স্নায়ুনাথারা, আনন্দের মুহূর্ত হাওয়া। ধরণী আজ উৎসব-চঞ্চল। আনন্দপিরাসী সন্তান মায়ের বরাহরূপটি দেখার জন্য ব্যাকুল। ঢাকটোলের বাজনার শব্দ পল্লী মুখবিত, দীপাবিভার আলোর আত্মসবজির ঝলকে শহরবাসী সচকিত। ভক্ত কালীপদের উজোগে স্ত্রীমণ্ডুর বাটীও দীপমালার ঝলসল করে। বাটীর ভিতরে পূজার প্রস্তুতি হতে থাকে।

রাত্রি প্রায় সাতটা। শীতের রাত। ঘোড়ার বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় উপবিষ্ট। কল্পনা করা যায় ঠাকুরের গায়ে সবুজ বনাতের কোট। পরনে লালপেড়ে শূতি। পায়ে গরম মোজা। গলায় গরম গলাবন্ধ। পূর্বাত্ত। পা মুড়িয়ে আসন করে বসে আছেন। শান্ত ধীর স্থির গম্ভীর। ভাব-প্রদীপ্ত, মূগ্ধ মুখমণ্ডল। অধরে হাসির রেশ। কপালে একটি চন্দনের ফোঁটা। উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি আনন্দ-পুরুষ ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের কাছ থেকে অন্য কোনরূপ নির্দেশ না পাওয়াতে পূজোপকরণগুলি ভূমি মার্জনা করে তাঁর সম্মুখে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পূজার আয়োজন সম্বন্ধে পুঁথিকার লিখেছেন,

হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিণী তাঁহার।
ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার ॥
ফুলকা ফুলকা লুচি হজির পায়ের।
নূতন খেজুর-গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিষপত্র গন্ধাজল ধূপদীপ ফুল ॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি জোগাড় করি ঘরে।
ভক্তকণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে ॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
হজির পায়ের আনে তাঁহার গৃহিণী ॥১৩

১৩ 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' (পৃ: ৪৮২) গ্রন্থে ব্রজচরী অক্ষরচৈতন্য লিখেছেন যে কালীপদ ঘোষের গৃহিণীর মাথা গরম ছিল, তাঁর পক্ষে এই কাজ সম্ভব ছিল না। কালীপদর কনিষ্ঠা ভগিনী মহাশারা হজির পায়ের ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, “একদিকে নানাবিধ ভোজসামগ্রী; প্রভু অন্ন আহাৰ করিতে পারিতেন না; তাঁহার অন্ত বার্নিও আছে। অপরদিকে তৃণাকার ফুল—রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক।”^{১৪} রামচন্দ্র বলেছেন, “তাঁহার (ঠাকুরের) দুই দিকে দুইটি বৃহৎ মোমের বাতি জালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দুই দিকে দুইটি বৃহৎ ধূপ হইতে বৃগন্ধ ধূম উদ্ভিত হইতেছিল, সে সময়ে তিনি কি অপূর্বভাবে শোভা পাইতেছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে বাক্য পরাজয় হইয়া যায়। অপূর্বরূপ বলিলে যত্বেপি কোন ভাব লাভ করা যায় তদ্বারা বুঝিয়া লউন।”^{১৫} ঠাকুরের আদেশে সেবক লাঠি ধূপ-ধূনা দিগেছিলেন। এ সকল প্রভুত্বিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কোনরূপ অসম্মতি জানালেন না। তখন অনেকেরই ধারণা হল যে, “তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীক স্বনে অগচ্ছিন্ন ও জগচ্ছক্তিরাশির পূজা করিবেন অথবা জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্তোক্ত আত্মপূজা করিবেন।” (লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ৩৩২)।

বৈঠকখানা ঘর আলোয় বললল করছে। ঘরের হাওয়া ধূপ-ধূনার সৌরভে আয়োদিত। পূর্বপশ্চিমে লম্বা ঘর ক্রমে উজ্জ্বল উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ। জিশ বা ততোধিক ভক্ত সেখানে উপস্থিত।^{১৬} কেউ বসেছে ঠাকুরের কাছে কেউ বা দূরে। মাষ্টার রাখাল প্রভৃতি কাছে বসেছেন। ২২র পশ্চিমপ্রান্তে বসেছেন রামচন্দ্র, তাঁর নিকটে গিরিশচন্দ্র। তাছাড়া সেখানে উপস্থিত দেবেন্দ্রনাথ, কালীপদ, শরৎ, শশী, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী, কালী (অভেদানন্দ), বৈকুণ্ঠ, অক্ষয় মাষ্টার, চুনীলাল। সম্ভবতঃ সেখানে উপস্থিত ছিলেন মণীন্দ্র (খোকা), মনোমোহন, বলরাম, প্রভৃতি। ঘরের বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে এতগুলি লোক সেখানে। সবাই অনিবেদন নয়নে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকেন, ঠাকুর কি করেন, কি বলেন জানবার জন্য সবাই উন্মূখ। “কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিছ তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আত্মদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা, কিছই না করিয়া পূর্বের দ্বায় নিষ্কিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।” (দিব্যভাব, ৩৩৩)। এক সময়ে মহেন্দ্রমাষ্টার দেখেন ঠাকুর ভক্তিতরে জগন্মাতাকে গন্ধপুষ্প নৈবেদ্য সবকিছু নিবেদন করলেন এবং মাষ্টারের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, “একটু

১৪ তত্ত্বমঙ্গলী, ৮ম বর্ষ, ২ম সংখ্যা, ‘রামদাদা’ প্রবন্ধ

১৫ রামচন্দ্রের বক্তব্যাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩৪০, বিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৩০৩

সবাই ধ্যান করো।” ১৭ ভক্তগণ ধ্যান করতে চেষ্টা করেন। কেউ নীরববর্ণী। ভাষা মাকে, কেউ বা জগন্নাথার বঙ্গপুত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহকে মানসপটে স্থাপন করেন। চতুর্দিক নীরব, নিথর। আনন্দের মৌতাতে সবাই যেন মগ্নেছে।

পিছনে রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বসেছিলেন। সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে গন্ধপুষ্পাদি সব জগন্নাথার উদ্দেশে নিবেদন করেছেন। তিনি বিন্ময়ে ভাবতে থাকেন, পরমহংসদেবের উদ্দেশ্য কি? পূজার আয়োজন করে এভাবে বসে আছেন কেন? একবার তাঁর মনে হয়, পরমহংসদেব কি পূজা করবেন? তত্ত্বদ্বয়ই কর্তব্য তাঁর পূজা করা। ভক্তগণ তাঁদের কর্তব্য বুঝতে পারছেন না। তিনি তাঁর ভাবনা নিরকণ্ঠে গিরিশচন্দ্রকে নিবেদন করেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশের ‘পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস’। রামচন্দ্রের কথা তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। গিরিশ উৎসাহিত হয়ে বলেন, “বলেন কি? আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন বলেই তিনি অপেক্ষা করছেন?” ১৮ ভাবের ইঙ্গিত ভাবুক গিরিশের মনে ভাবের তুফান তোলে। সেই সময়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর মনের ভাব বর্ণনা করেছেন, “আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটকট করিতেছে, প্রভুর সম্মুখে যাইবার মন্ত্র আমি অস্থির। রামদাদা আমার কি বলিলেন, আমার ঠিক স্মরণ নাই, আমার প্রকৃত অবস্থা তখন যেন নয়। কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে, রামদাদা যেন আমার উৎসাহ দিয়া বলিলেন, ‘যাও, যাওনা।’ রামদাদার কথায় আমার আর সঙ্কোচ রহিল না, ভক্তমণ্ডলী অভিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমাকে দেখিয়া বলিলেন—‘কি, কি, এসব আশ্রয় করিতে হয়। আমি অমনি ‘তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই’ বলিয়া দুহাতে ফুল লইয়া ‘জয় মা’ শব্দ করিয়া পাদপদ্মে দিলাম।” ১৯ গিরিশচন্দ্র তখন উল্লাসে অবীর, ভাবের উচ্ছ্বাসে প্রায় বেসামান। প্রাণের আবেগে তিনি:

১৭ স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা, (পৃ: ৭৮) : “ইতিমধ্যে তিনি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া পূজার ত্রব্যাদি নিজের মধ্যে বিবাজমানা জগন্নাথাকে নিবেদন করিলেন এবং সমবেত ভক্তগণকে ধ্যান করিতে বলিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সন্ন্যাস তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলায়তে লিখেছেন, “ঠাকুর ভাবতরে নিজ শিরে পুষ্প দিয়া কহিলেন—ভোমবা সব মা কালীর ধ্যান কর।”

১৮ রামচন্দ্রের লেখা পরমহংসদেবের জীবনকৃতান্ত ও বাসনস্তের বক্তৃতাবলী (প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

১৯ গিরিশচন্দ্রের ‘রামদাদা’ প্রবন্ধ : তত্ত্বমণ্ডলী, ৮ম বর্ষ, ১৩১১ সাল।

(১৭৭)

ঠাকুরের পাদপদ্মে বাবুবাৰ পুষ্পাঞ্জলি দেন। পুষ্পপাত্ৰ থেকে একগাছি মালা দিয়ে ঠাকুরের পাদপদ্ম সাজান। এদিকে ঠাকুরের মধ্যে দ্রুত দেখা দেয় বিচিত্র প্রতিক্ৰিয়া। ঠাকুরের লম্বা শরীৰে শিহরণ। তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হন। “তাহার মুখমণ্ডল জ্যোতিৰ্ময় এবং দিব্যহাস্তে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয়-মুদ্রা ধারণপূৰ্বক তাহাতে জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।” ঠাকুর শ্রীৰামকৃষ্ণ উত্তরাস্ত হয়ে উপবিষ্ট, নিম্পদ বাহুজ্ঞানশূন্য তাঁর শরীর। ভক্তগণ দেখেন, ‘ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতিৰ্ময়ী দেবীপ্রতিমা সহস্র। তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা।’ চৈতন্তবান নরদেহে চৈতন্তময়ীর আবির্ভাব, অপরূপ তাঁর রূপসৌন্দৰ্য। অবর্ণনীয় তাঁর দিব্যছোতনা। ‘সৌম্য হতে সৌম্যাতার’ আবির্ভাব দর্শন করে ভক্তহৃদয়ে ওঠে ভাবের উত্তাল তরঙ্গ। জনৈক উপস্থিত ভক্ত লিখেছেন, “কলতঃ প্রভুর এমন আনন্দঘনরূপ আমরা ইতি-পূৰ্বে দর্শন করি নাই। এ রূপ বর্ণনার অতীত, কেবল ধ্যানেরই উপভোগ্য।”২০

ভক্তগণ সম্মুখে দেখেন জীবন্ত স্তাম্যপ্রতিমা। কোন ভক্তের মানস-আরশিতে কিলিক দেয় অতীতের ঘটনা। ভক্ত মথুর চৰ্মচক্ষে দেখেছিলেন শ্রীৰামকৃষ্ণ-বিগ্রহে শিব ও কালী মূর্তির ক্রমসমুচ্চয়। মনে পড়ে ভাবস্থ ঠাকুর জগন্মাতার

গিরিশচন্দ্র আরও লিখেছেন, “সে দৃষ্ট যখন আমার শ্রবণ হয় রামদাকাকৈ মনে পড়ে, মনে হয় রামদাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।” লীলাপ্রসঙ্গ-কারের মতে ‘অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের’...আপনা হতে মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, ঠাকুর তাঁর শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমার জগদম্বার পূজা গ্রহণ করবার অন্তই পূজার আয়োজন।

গিরিশচন্দ্র ২৪।১০।১৮২৭ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের সভায় বলেছিলেন, “(ঠাকুর) আমাকে বলিলেন, আজ মার দিন এমনি করিয়া বসিতে হয়। আমার কি মনে হইল, আমি জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া সেই চন্দন ও ফুল তাহার চরণে দিলাম এবং উপস্থিত সকলেই সেইরূপ করিল।”, তত্ত্বমঞ্জরী, ১২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ১৬৮ অহুসারে ঠাকুর শ্রীৰামকৃষ্ণ বা আনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ, সে-সময়ে গিরিশচন্দ্র ‘জয় রামকৃষ্ণ’ বলে পুষ্পাদি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেন।

২০ শ্রীশ্রীৰামকৃষ্ণলীলাবৃত্ত, পৃঃ ১৮৮। ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যে, উপস্থিত ভক্তদের অনেকের ধারণা হয় যে, ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ দেখেই গিরিশচন্দ্র ফুল ও মালা ঠাকুরের শ্রীপদে অঞ্জলি দেন।

মকে কথা বলছেন, “তুমিই আছি, আমিই তুমি। তুমি খাও ; তুমি আমি খাও !” বনে পড়ে কয়েকদিন পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, “এর ভিতরে তিনিই আছেন। এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন।”^{২১} ভক্তদের কেউ কেউ নিশ্বাস করতেন, “এক রূপে শ্রামারূপ, অপরে গৌসাই”—একই কল্যাণীশক্তির দুটি ভিন্ন রূপ। প্রত্যেকে প্রতীত ব্যাপারটির সংঘটন দেখে ভক্তগণ বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়েন। পুঁথিকার লিখেছেন,

কেবা কালী কেবা শুভ না পারি বুঝিতে।

কালীতে কেবল তিনি মা-কালী তাহাতে ॥

দুর্লভ রূপ। ভক্তগণের প্রাণে উল্লাস। সমুখে জীবন্ত রামকৃষ্ণকালীবিগ্রহ। ভক্তগণ ইচ্ছামত যন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিগ্রহের পাদপদ্মে ফুলচন্দন অঞ্জলি দেন। মাটির গন্ধপুষ্প দেন। ভাববিহ্বল রাখাল পুষ্পবিষ দেন। রামচন্দ্র মূর্ত্যোত্তরে ফুল দেন, লাটু একটি ফুল দেন, অস্ত্রান্ত ভক্তেরা দেন। নিরঞ্জন পায় ফুল দিয়ে ‘ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী’ বলে শ্রীপাদপদ্মে মাখা রেখে প্রণাম করেন। কালীপ্রসাদ, অক্ষয় মাষ্টার, চুনীলাল প্রভৃতি ‘জয় মা কালী’ উচ্চারণ করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। চতুর্দিকে ‘জয় মা ! জয় মা !’ ধ্বনি।^{২২}

ভক্তগণ কৃতকৃতার্ঘ। কেউ স্তব করেন, কেউ স্তব করে স্তব করতে থাকেন। গিরিশচন্দ্র জলদগম্ভীর স্বরে স্তব করেন,

কে রে নিবিড়-নীল-কাদম্বিনী সুরসমাজে।

কে রে বক্তোৎপল-চরণযুগল হৃদ-উরলে বিরাজে ॥ ইত্যাদি

গিরিশ গান ধরেন,

“দীনতারিণী দুর্জিতহারিণী, সম্ভবজন্মমজ্জিগুণধারিণী।

স্বজন-পালন-নিধনকারিণী, সন্তোষা নিশ্চ'ণা সর্বরূপিণী।”

সবাই আনন্দে বিহ্বল, ভাবে মাতোয়ারা। কয়েকজন ভাবোচ্ছ্বাসে উর্ম্মবাহু হয়ে নৃত্য করতে থাকেন, কেউ বা করতালি দিয়ে নৃত্য করতে থাকেন।^{২৩}

২১ কথাযুত ২।৩।৪ এবং কথাযুত ৪।২৪।৩ দ্রষ্টব্য।

২২ ঘটনার উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা স্বতীকথা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র মহেন্দ্র গুপ্তের অভিমত যে, জয় মা ধ্বনির পর ঠাকুর বরাভয়করা মূর্তি ধারণ করে সমাধিস্থ হন। অপর অধিকাংশের মত—গিরিশের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেই ঠাকুর এইভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

২৩ রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩৪১

মনে হয় ‘বসেছে পাগলের মেলা’। অপরে কে কি বলে সেমিকে তাদের আক্ষেপ
নাই। ‘ভাবের জ্বায়ে ভাবুকনল প্রায় বেসামান্য।’ ‘মন মাতালে মাতাল করে,
মন মাতালে মাতাল বলে।’ বিহারী২৪ গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেন তাঁর
প্রাণের আকৃতি—

মনেরি বাসনা শ্রামা শবাসনা শোন মা বলি,
জদয়মাঝে উদয় হইও মা যখন হব অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে,
মিশাইয়ে ভক্তিচন্দন মা পক্ষে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥

মহেন্দ্রমাষ্টার অন্তরের সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে গান ধরেন,
‘সকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি’ ইত্যাদি।
ভক্তগণ পর পর কয়েকটি গানের মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত করেন ভাবের আবেগ।
সঙ্গীতভরক্কে সবাই যেন ভাসতে থাকেন। গান চলতে থাকে—
“তোমারি ককণায় মা সকলি হইতে পারে” ইত্যাদি।
“গো আনন্দময়ী হুয়ে মা আমার নিরানন্দ করে না” ইত্যাদি।
“নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি” ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে ঠাকুর ভাবসমায়ি হতে ব্যুথিত হন। ক্ষেমে তাঁর বাহ্যকৃতি
দেখা যায়। ঠাকুর একটি শ্রামাসঙ্গীতের করমাশ করেন, ভক্তগণ গান ধরেন,
“কখন কি রক্ষে থাক মা শ্রামা স্বধাতরঙ্গিনী।” তারপর ঠাকুরের আদেশে তাঁরা
গান করেন,

শিবসঙ্গে সদা রঞ্জে আনন্দে মগনা।
স্বধাপানে চল চল কিলে পড়ে না (মা) ॥

গানের লহরীতে ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। তিনি গভীরভাবস্থ হয়ে
পড়েন।

আবার ধীরে ধীরে ঠাকুরের বাহ্যকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। ভক্ত রামচন্দ্র

ভক্তমঞ্জরী, ত্রয়োদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : ‘সকলে জয় রামকৃষ্ণ হবে হাততালি
দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।’

২৪ বীরভূম জেলার ‘বাহিরী’ গ্রাম-নিবাসী বিহারী নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণ
স্বক দেবেশ্বনাথের পরিবারে থেকে চাকরী করতেন। তিনি ঠাকুরের
কৃপালাভ করেন। (ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমারের ‘মহাত্মা দেবেশ্বনাথ’ পৃ: ৬৯
জটব্য।)

বলেন, “প্রভুর ভাবাবলানপ্রায় বুঝিয়া আমি ভোজ্যপাতগুলি একে একে তাঁহার সম্মুখে ধরিতে লাগিলাম ; দয়াময় দয়া করিয়া দুই হস্ত দ্বারা তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । কর্ণের পীড়ার জন্য প্রভু আমার অন্ত কঠিন বস্তু ভক্ষণ করিতে পারিতেন না । অন্ত সে ব্যক্তি কোথায় গেল ! যে গলদেশে দিয়া ক্রমশে দুধ প্রবেশ করিত, সেই গলদেশে লুচি প্রত্ৰুতি চলিয়া গেল ! পরে স্নজ্জির পাত্র ধরিলাম । ২৫ তিনি তাহাও ক্রীতিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন । পরিশেষে তাহুলগুলি দুই হস্তে উত্তোলনপূর্বক বদনে প্রবিষ্ট করাইলেন ।” ২৬ তাহাও ভোজ্যপ্রভা গ্রহণ করে ঠাকুর পুনরায় “একেবারে তাহা বিত্তোর বাহ্যশূন্য হইলেন !” ২৭

পূর্বত ভক্তগণ যখন ঠাকুর শ্রীরাঘবকৃষ্ণকে নিয়ে মহানন্দে প্রমত্ত, সে সময়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কি করছিলেন, প্রসঙ্গ করা যেতে পারে । শ্রীমায়ের মুখে “না যার শ্রামপুত্র বাড়ীতে তিনি একাকী থাকতেন । ভব মুখজোদের একটি মেয়ে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ তাঁর কাছে থাকত । ২৮ অহুমান করা যেতে পারে দক্ষিণেশ্বরের মত এখানেও শ্রীমা দরজার ফাঁক দিয়ে আনন্দবিলাস যৎসামান্য দেখেছিলেন । তাঁর নিকটে ছিল গোলাপ-মা, ভক্ত কালীপদের স্ত্রী, বোন মহামায়া এবং সম্ভবতঃ ভব মুখজোদের মেয়েটি ।

ঠাকুর ক্রমে তাঁর সংবরণ করেন । ভক্তগণও ধীরে ধীরে স্নজ্জির হন । একে একে সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করে পাশের হলঘরে (ভক্তদের জন্য নির্দিষ্ট বৈঠকখানাতে) সমবেত হন । রাঘবকৃষ্ণ-কালীর মহাপ্রসাদ সকলে আনন্দে ভাগ বাটোয়ারা করে গ্রহণ করেন । “এই মহাপ্রসাদ লইয়া সেদিন যে কি আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অধিকার বহির্ভূত ।” স্বভাবকবি অক্ষয়কুমার একেছেন একটি মনোরম চিত্র । তিনি লিখেছেন,

আনন্দের স্রোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি ।

সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥২৯

শ্রীপদে অঞ্জলি দেয়া কৃষ্ণের হার ।

২৫ পুঁথিকারের মতে পাণ্ডে ছয়সের পরিমাণ পায়ের ছিল । ঠাকুর ভাবেতে প্রায় সবটুকুই গ্রহণ করেন ।

২৬ রাঘবকৃষ্ণ দস্তের বক্তৃতাবলী, ১ম ভাগ, পৃ: ৩৪১

২৭ কথাস্বত ৩২২।৩

২৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১১৭ । “আমার জীবনকথা” (পৃ: ৭১, ৭৬) । লেখক বলেন, গোলাপ-মা সেবকদের রাগাবাড়া করতেন ।

২৯ দানা-কালীর কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্র ঘোষের কাছে শোনা যায়

কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনায় ।

কেহ বা সঙ্কল্পহেতু বাধিল বসনে ।

কেহ বা গরবভরে পরে ছই কানে ।

কেহ বা চলিয়া পড়ে অপরের গায় ।

হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহার ॥

কি রঙ্গ হইল দৃষ্ট কার সাধ্য কয় ।

চক্ষে দেখা তবু তিল বর্ণিবার নয় ॥

রামকৃষ্ণ-কালী-পূজা ৩০ ও উৎসব সমাপ্ত হয়। তখন রাত প্রায় নয়টা। ঠাকুরের আদেশে ভক্তগণ দিমলা স্ট্রীটে ভক্ত 'সুরেন্দ্রের' বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। 'সুরেন্দ্র' ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নিজের বাড়ীতে প্রতিমায় শ্রামাপূজাব আয়োজন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের সকলের সেখানে নিমন্ত্রণ। ভক্ত ও সেবক সকলকেই ঠাকুর পাঠিয়ে দেন, শুধু ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে থাকেন সেবক লাটু।

অত্রতপূর্ব সেই শ্রামাপূজা দুঘণ্টার মধ্যেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু আনন্দোৎসবের দেশ চলতে থাকে। ভক্তগণ ঠাকুরের অলৌকিক রূপার বিষয় আলোচনা করতে করতে সুরেন্দ্রের বাড়ীর দিকে যান। কেউ ভাবেন ঠাকুরের জীঅঙ্ক থেকে ব্যাধি দূর হয়েছে। “ভক্তেরা করিলা মনে ব্যথা গেছে সেবে। আজি অঙ্গে বা কালীর আবেশের ভরে ॥” কেউ মনে করেন অবতারপুরুষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ব্যাধিরূপ ছলের আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ ভাবেন অবতারদেহে জগন্নাতার দিব্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার পর মাটির প্রতিমাতে আর জগন্নাতাকে দেখবার সার্থকতা কি? কেউ বা ভাবেন সেদিনকার প্রত্যক্ষ অহিঙ্সাতা অতুলনীয় সম্পদ। ৩১ প্রাণে প্রাণে অল্পভব কাহিনীর এক টুকরো। তিনি তখন বালক। ঠাকুর তার হাতে একটি সন্দেশ দেন। উঠে যাবার সময় বালক হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, সন্দেশ হাত থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায়। ভক্তেরা ছুটে এসে প্রসাদের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে নেন। বালক কেঁদে কেলে। ঠাকুরের আদেশে তাকে আরেকটি সন্দেশ দেওয়া হয়। তখন সে শান্ত হয়।

৩০ বৈকুণ্ঠনাথ সন্ন্যাস বর্ণিত, ঐ, পৃ: ১৮৭

৩১ আমার জীবনকথা, পৃ: ৭৮ : “সেই ঘটনার কথা আজও আমার মনে জাগরুক আছে। সেই অপূর্ব দৃষ্ট আমরা জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারিব না।”

করেন শুধু সাধিক পূজাই আসল পূজা। শুধু তাই আশ্রয় করে ভাবের পূজা করাই সাধকের কর্তব্য।

এদিকে শ্রামপুত্র বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবামৃত অযাচিতভাবে বিভূষণ করতে থাকেন। নিকটে সেবক লাটু। তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করেন সাধন-রাজ্যের গুহ্য তথ্য। সেবক লাটু স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, “...তিনি সকলকে হুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যেতে বললেন। হামার আর সেদিন যাওয়া হোলো না।...সে রাতে উনি হামাকে কতো কথা বলেছিলেন! সাকার ধ্যানের কথা বলতে বলতে নিরাকার-ধ্যানের কথাও হামার জানিয়ে দিলেন। সেদিন বলেছিলেন—‘ধোন কি এক রকম রে? এক রকম ধোন আছে, যেখানে নিজেকে ভাবতে হয় একটা মাছ আর ব্রহ্ম যেন অগাধ সমুদ্র—তাতে খেলে বেড়াচ্ছি, আর একরকম আছে, যেখানে নিজের শরীরকে ভাবতে হয় শরা আর মনবুদ্ধি হচ্ছে জল, সেই জলে সচ্চিদানন্দ-স্বর্ষের ছায়া পড়েছে। জাংটা এক রকম ধোনের কথা বলতো—জলে-জল, উপর-নীচে জল, তার ভিতরে যেন একটা ঘট রয়েছে—বাহিরে ভিতরে জল, আর একরকম আছে সেখানে সচ্চিদানন্দ-আকাশে পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে। এসব হচ্ছে জানীর ধোনের কথা। এসব ধোনে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন।’ ৩২

আম্বিনের অমানিশায় বাংলার গ্রাম শহর ‘কালী করালবক্তা’ স্তম্ভ-দর্শন-দশনোজ্জ্বল’র পূজা-আরাধনার যেতে উঠেছিল, সে সময় শ্রামপুত্র বাড়ীতে রামকৃষ্ণভক্তগণ ‘সদানন্দময়ী’ ‘মনোমোহিনী’ রামকৃষ্ণকালী পূজা করে ধর্ম-জগতের ইতিহাসে একটি নূতন ভাবদর্শন স্থাপন করলেন। ঈশ্বর-অবতারের দ্বিগুণেশ্বর-লীলাবিলাসে ভক্তগণ ‘আপন হতে আপন’ ভাবে পেয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিগ্রহ, জেনেছেন কালশক্তি কালীর প্রেষ্ঠ প্রকাশ রামকৃষ্ণ-অবতার, বুঝেছেন অবতার এসেছেন তারণ করতে। আবার ভাগ্যবান কোন কোন ভক্ত প্রাণে প্রাণে বুঝেছেন শ্রীরামকৃষ্ণই ভাবরূপে কালী, ৩৩ মহাকালী, কালনিয়ন্ত্রণকর্ত্রী ‘এই ভাবরূপ ও বাস্তবরূপের মাধুর্যমণ্ডিত সমন্বয় ঘটেছে রামকৃষ্ণকালী-বিগ্রহের মধ্যে। রামকৃষ্ণ-আধারে আধারবাসিনী কালীর আবির্ভাব অধ্যাত্মলীলাবিলাসে এক অভিনব ব্যঞ্জন। গভীর আনন্দে প্রেমে মাতোয়ারা ভক্তগণ জীবন্ত রামকৃষ্ণকালীকে তত্ত্বিত্বধা খাইয়ে...ভূষ্ট করেন, আপন মনে।’ ভক্তগণ

৩২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃ: ২৩৬-৩৭

৩৩ এর সম্বন্ধে বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীরা ভাবক্ষে

নিজেৰা কৃতকৰ্তাৰ্হ হন, ভবিষ্যতেৰ জন্ত উপহাৰ দিয়ে যান অভুলনীৰ বামৰু-
কালীমূৰ্তি—অবতাববৰিষ্ঠ শ্ৰীৰামকৃষ্ণেৰ এটি অন্তৰঙ্গ ভাবমূৰ্তি। এই অশৰূপ
মূৰ্তি প্ৰত্যক্ষ কৰে কালীভক্ত গৈয়েছেন—

দেখি মা তোৰ ৰূপেৰ ছবি, (ওমা) এমন ৰূপ ত আৰ দেখিনি।

ভয়ঙ্কৰা, কথিৰধাৰা, নয় অসিধৰা জিনয়নী। (আমাৰ মা)

বৰণবেশে ভৰে ছেলে, সে সাজ কি তাই নুকাইলে,

সন্তানে অভয় দিলে, ওমা বৰাভয়-প্ৰদায়িনী !

কি দোষে ভোলাৰে ভুলে, (ওমা) রাখনি আজ পদতলে,

শিবকে কেলে বুঝি শিবে, (আজ) দিলে আমায় চৰণ দুগানি ॥ ৩৪

দেখেন, মা কালী ঠাকুৰেৰ গলায় বা দেখিয়ে বসছেন, 'ওৰ ঐটেৰ জন্ত আমাৰও
হয়েছে।' দেখেন মা কালী ষাড় কাত কৰে বসেছেন। (শ্ৰীশ্ৰীমায়েৰ কথা,
২।১০৬)। ঠাকুৰেৰ মহাসমাধিৰ পৰা শ্ৰীমা আৰ্তনাদ কৰে উঠেন 'মা কালী
গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!' (লাটু মহাৰাজেৰ
স্মৃতিকথা, পৃ: ২৬২)। "ভক্ত স্মৰেন্দ্ৰনাথ বছৰ পয়লাৰ দিন কালীপুৰে উপস্থিত
হয়ে ঠাকুৰকে বলেন, 'আজ পয়লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার। কালীঘাটে
বাওরা হ'ল না। ভাবলাম যিনি কালী—যিনি কালী ঠিক চিনেছেন—তাঁকে
দৰ্শন কৰতেই হবে'।" (কথাবৃত্ত ৩২৫২)

৩৪ বিজয়নাথ মজুমদাৰ : বামৰু-কালীনা। (ভক্তমঞ্জৰী, ত্ৰয়োদশ বৰ্ষ,
ষষ্ঠ সংখ্যা)

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সীলাবিলাসের একটি চিহ্নিত দিন। 'সেই একই অবতার যেন ডুব দিলে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, এখানে উঠে বীণা হলেন', ইদানীং তিনিই রামকৃষ্ণ হয়েছেন। আর সকল অবতারেই সেই এক ভগবান। অবতার ভগবৎগুরু, অবতার আসেন তারণ করতে। অবতার-শরীরে দেব ও বাহুবভাবের অঙ্কিত সন্মিলন। প্রায়ই অবতারগুরুষের শরীরমনের বাধ অতিক্রম করে তাঁর অমাহুযী দৈবীশক্তির ক্ষুরণ ঘটে। আলোচ্য দিনটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দৈবীশক্তি অসাধারণভাবে অপাবৃত করে ভক্তগণকে অক্লপন্থে কৃপা করেছিলেন, তাঁর দয়াধনস্বরূপ প্রকট করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "১লা জানুয়ারী। ইতিপূর্বে রাজ-বর্ষের প্রথম দিবস বলিয়া ইহা আমাদের নিকট আনন্দের দিবস বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ঐ শুভদিনে পতিতপাবন দীনবন্ধু রামকৃষ্ণদেব, সাধন-ভজন-বিহীন, দীনহীন পতিতদিগের প্রতি সদয় হইয়া কল্পতরুরূপে করুণাধারা বর্ষণ করতঃ কলির কলুবরাণি পরিপূর্ণ জীবদিককে কৃতার্থ করিয়া 'তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর দীননাথের এ আশীর্বাদ চিরকাল বলবতী থাকিবে" ১।

আমি সারদানন্দ মন্তব্য করেছেন, "ঐক্য উচ্চাবসার... 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীগঙ্গাতীর আমিই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিম্নাঙ্গগ্রহসমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হইত।...তখন কল্পতরুর মত হইয়া তিনি তরুকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুই কি চাস?'—যেন তরু বাহা চাহেন তাহা তৎক্ষণাৎ অমাহুযী শক্তিবলে পূরণ করিতে বলিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য ঐক্য ভাবাপন্ন হইতে

১ নরেন্দ্রনাথ বসু রচিত '১লা জানুয়ারী', তত্ত্বমঞ্জরী, পৃঃ ২১৬

ঠাকুরকে আমরা নিত্য দেখিরাছি; আর দেখিরাছি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের
১লা জানুয়ারীতে।”২

সেদিন ভক্তবাহ্যিকল্পতরু ঠাকুর পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পতরুর তার ভক্তদের
অপূর্ণ বাসনা পূরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ‘অহেতুক কৃপালিঙ্গু’ নাম
সার্থক করে ভক্তজনকে অকাতরে প্রেম বিলিয়েছিলেন। সেদিন ছিল
তাঁর ‘পূর্বকথিত প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করিবার দিন’, সেদিনকার বিশেষ
লীলাস্থানের মধ্য দিয়ে লীলাময় ভগবান তাঁর ‘লীলারহস্য পরিসমাপ্ত’
করেছিলেন। ভক্তপ্রিয় ভগবানের কল্পতরুরূপটি ভক্তজনের বিশেষ প্রিয়।
সেই কারণে দিনটির নামকরণ হয়েছে ‘কল্পতরুদিবস’।^৩

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্ত্যলীলার অন্ততম প্রত্যক্ষদর্শী আলোচ্য দিনটি
সঙ্গে লিখেছেন :

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল তখন বিবরণ।

হাটেতে ভাস্কি বঁড়ি বাইব যখন।

সেই হাড়ি-ভাঙ্গা রক্ত আজিকার দিনে।^৪

অচিন গাছের মতই অবতারকে জনকরেক শুণ্ডের ব্যক্তি ভিন্ন অপরে চিনতে
জানতে পারে না। কিন্তু তিনি যখন দয়াপরবশ হয়ে তাঁর দয়াদয়নরূপটি
সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরেন, তখন আর কারোরই দ্বিধা সংশয় থাকে না।
আলোচ্য দিনটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।
তিনি প্রকান্তে তাঁর আত্মপরিচয় প্রদান করেছিলেন, তাঁর অমাহুযী
দিব্যশক্তি দেহমনের সঙ্গীর্ণতা অতিক্রম করে উপচিয়ে পড়েছিল। অবতারের
আত্মপ্রকাশলীলা বা হাড়িভাঙা রক্ত অমুষ্টিত হয়েছিল বলে এই দিনটির
লীলা-ঐশ্বর্য ভক্তগণকে সর্বদা আকৃষ্ট করে।

এই ধরনের বিভূত্বিলাসে যে চিহ্নভিন্ন বিস্মরণ ঘটে তার সংস্পর্শে
চৈতন্তোদয় হয়, চৈতন্তোদয়ের সঙ্গে পরপানন্দ উপস্থিত হয়। আলোচ্য

২ বাবী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ, গুরু ভাব, পূর্বার্ধ,
পৃ: ১১৭-১৮

৩ ইহা রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণের অভিমত। (রামচন্দ্র দত্ত :
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, সপ্তম সংস্করণ, পৃ: ১৭৬
অষ্টব্য।)

৪ অক্ষয়কুমার সেন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ: ৬:৩

দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিদ্যাম্পর্শ বা শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা উপস্থিত ভক্তদের দ্বারা চৈতন্য উদ্বীণ করেছিলেন, তাঁদের দ্বারা পরমানন্দ চলে দিয়েছিলেন। 'স্বকামং সর্বভূতানাম্'—কোন কিছুর প্রত্যাশা না করে তিনি বিশ্বজনের কল্যাণকাজী। তিনি পৌরাণিক কল্পতরুর মত তালমন্ড-নির্বিচারে প্রার্থীর সব প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না, হিতাকাঙ্ক্ষী স্বকৃদের মত তিনি শুধুমাত্র অপরের কল্যাণ সম্পাদন করেন। আলোচ্য দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বব্যাপী কল্যাণশক্তি সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন, মাংস-মতার অমৃত্যুত দেবতাকে উদ্বোধিত করে আশ্রিত-জনকে নিঃশ্রেয়সকল্যাণের পথে অগ্রসর হতে সর্বপ্রকারে অভয় দান করেছিলেন। সেই কারণে রামকৃষ্ণজীবনীর ভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ সেদিনকার ঘটনার মধ্যে আবিষ্কার করেন, “ঠাকুরের অভয়প্রকাশঃ অগবা আশ্রয়প্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়প্রদান।”^৬

দেবত্ব ও মানবত্বের সংমিশ্রণে অবতারের জীবন। অসাধারণ ও অলৌকিক মেশানো থাকায় অবতার জীবনের ঘটনা অনেক সময়েই রহস্যবৃত। আপাত-ব্যাপারের দ্বারা সে-সকল ঘটনার তাৎপর্য সব সময়ে বুজির নিষ্কিতে ভৌল করা যায় না, ঘটনার কার্য-কারণ বুজির দর্পণে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর অমৃতবের শঠতা ও তীব্রতা ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করতে দেয় না। তা ছাড়াও অমৃতবকারীর অভিজ্ঞতা

• স্বামী সারদানন্দের মতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থীর নিকট শুধুমাত্র নিগ্রহাশ্রয়গ্রহসমর্থ ঈশ্বরাবতাররূপে উপস্থিত হননি। তিনি বলেন, “...তাহাদের (ঈশ্বরাবতারদের) অমৃতবাদি প্রত্যেক মানবের মহাবল্য জীবনাধিকারসম্পত্তি বলিয়া নির্ধারণ করিলে তাহাদিগকে বিশেষরূপে আপনায় করিয়া মানবকে আশা ভরসা ও বিশেষ-শক্তি-সম্পন্ন করে। তাহাদের উচ্চগতি দেখিয়া মানব আপনায় উচ্চ-গতিতে বিশ্বাসবান হয় এবং সেও সেই বংশগ্রন্থত, অভাব সকল ধনের অধিকারী বলিয়া আশ্বনিহিত শক্তিতে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে।” (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, পৃঃ ৬৫৬-৫৭)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দিনে ভক্তগণের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করে তাদের কল্যাণমার্গে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন।

৬ লীলাগ্রন্থ, দ্বিত্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩২৬

ও অহুসরণের প্রভা ঘটনাকে অবিস্মরণীয় করে তোলে। ইংরেজী বছর পরলাতে ঘটনার উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যেক ও সংগৃহীত সাক্ষ্য অহুসরণ করে আমরা অতীতপূর্ব প্রতীত ব্যাপারটির রসাম্বাধনের চেষ্টা করব।

পটভূমিকার দেখা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গলরোগের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় শ্রামপুকুরে একটি ভাড়াবাড়ীতে বাস করছিলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঘোষণা করেছিলেন, গলরোগ ছুরারোগ্য কর্কটরোগ। স্বরভঙ্গের লক্ষণ দেখা দেয়, শরীর অতিশয় স্বীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকগণের পরামর্শে দ্বিতীয়বার স্থান-পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করা হয়। ঠাকুরের অহুমতি নিয়ে ২০ নং কান্দিপুর রোড ঠিকানায় প্রায় চৌক বিঘা জমির উপর একটি বাগানবাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির একদিন পূর্বে (১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর) অপরাহ্নে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কান্দিপুর উদ্যানবাটিতে এসে বাস করতে থাকেন।

“...নিরন্তর চারি বাস কাল কলিকাতাবাসের পর ঠাকুরের নিকট উহারমণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উদ্যানের মৃত্ত বায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়াযাজ তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার দ্বিতলে তাঁহার বাসের ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া ঐস্থান হইতেও কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।”^৭

নূতন পরিবেশে ঠাকুরের স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা গেল। “কান্দিপুরে আসিবার কয়েকদিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাগির চতুঃপার্শ্ব উদ্যানপথে অলক্ষ্য পাদচারণ করিয়াছিলেন।...ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু...ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্তকারণে পরদিন অধিকতর দুর্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্যন্ত আর ঐরূপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা দুই-তিন দিনেই কাটিয়া বাইল,...উহা (কচি পাঠার মাংসের স্কন্ধ) ব্যবহারে কয়েকদিনেই...দুর্বলতা অনেকটা হ্রাস হইয়া তিনি পূর্বাপেক্ষা স্বস্থ বোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে এখানে আসিয়া কিকিদ্দিক একশতকাল পর্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল

বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলালও—ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হৃৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন।”^৮

কাশীপুর এসে ঠাকুর চার-পাঁচ দিন পরে একবার বাগানে পায়চারি করেছিলেন, তারপর প্রায় পনেরো দিন উত্তানবাড়ীর দোতলায় আবদ্ধ হয়েছিলেন।^৯ ইতিমধ্যে চিকিৎসার না হলেও চিকিৎসকের কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। “কলিকাতার বহুবাজার পল্লীবাসী...রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা শহরে প্রচলনে ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিভ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন।... মহেন্দ্রলাল সরকার উহার সহিত মিলিত হইয়াই...ঐ প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়া-ছিলেন।... রাজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং... লাইকোপোডিয়াম্ (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ উপকার অল্পভব করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্বের তায় স্বস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন।”^{১০}

সে সময়ে একদিন^{১১} ঠাকুর ত্রিমাংসক বলেন, “এই অস্থ্য হওয়ার্তে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ।” এভাবে অন্তরঙ্গ বাছাই হতে থাকে, সেইসঙ্গে নীরবে নিভৃত্তে তাঁদের বিশেষ শিক্ষা স্বীকা সাধন ভজন চলতে থাকে। ঠাকুর বলতেন, “ভক্ত এখানে যারা আসে—তুই থাক। এক থাক বলছে, ‘আমায় উদ্ধার কর, হে ঈশ্বর!’ আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ; তারা ওকথা বলে না।

৮ লীলাগ্রসঙ্গ, দ্বিভাষ ও নরেন্দ্রনাথ পৃঃ ৩৮৮

৯ লীলাগ্রসঙ্গ, শুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১.৮ উল্লেখ আছে, “ঠাকুর চিকিৎসা এখানে (কাশীপুরে) আসা অবধি বাটার দ্বিতল হইতে একদিন একবারও নীচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই। আজ (১লা জাঙ্ঘারী, ১৮৮৬) শরীর অনেকটা ভাল থাকায় অপরাহ্নে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।” আবার লীলাগ্রসঙ্গ, দ্বিভাষ ও নরেন্দ্রনাথ খণ্ডে ৩৩৬ ও ৩৩৭ পৃষ্ঠায় ছবার উল্লেখ পাই যে, ঠাকুর কাশীপুর বাগানে আবার কয়েকদিন পরে, সম্ভবতঃ ১৫।১৬ই ডিসেম্বর একদিন বাগানে পায়চারী করেন। আবার সারদানন্দজীর দ্বিতীয় মত বৃত্তিগ্রন্থ বলে গ্রহণ করেছি।

১০ লীলাগ্রসঙ্গ, দ্বিভাষ ও নরেন্দ্রনাথ, ৩২২-২৩

১১ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ

তাঁদের ছুটি জিনিষ জানলেই হল ; প্রথম আশি (ঐরাবতক) কে ! তারপর তারা কে—আমার সঙ্গে সবকি কি ?”^{১০} অন্তরঙ্গ ভক্তদের এই আনাআনির প্রচেষ্টায়, তাঁদের অন্তরের অহরাগের অভিব্যক্তিতে কাশীপুরের দিনগুলি সমৃদ্ধল। ‘ঐশ’ ঠাকুরকে বলেন, “পাঁচ বছরের তপস্বী করে বা না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি।” কিন্তু তাঁদের ধ্যান ভজন পাঠ সঙ্গীত শাস্ত্র-চর্চা দ্বি ছিল গৌণ, তাঁদের মূখ্য লক্ষ্য প্রাণ-প্রতিম ঠাকুর ঐরাবতকের সেবাসুস্রবা। অন্তরঙ্গদের মধ্যে প্রায় বার জন যুবক বর সংসার তুলে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের সেবাসুস্রাে মন প্রাণ ঢেলে দেন। তাঁদের সেই সময়কার মনের ছবিটি দৃষ্টে উঠেছে বীর ভক্ত নিরঞ্জনর উক্তি। তিনি বলেন, “আগে, (ঠাকুরের প্রতি) ভালবাসা ছিল বটে,—কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই।”^{১১} গৃহী ভক্তগণও নিজের ছিলেন না। ঠাকুরের চিকিৎসা ও সেবাসুস্রার বাবতীয় অর্থব্যয়ের দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবাকাজে সাহায্য করতে থাকেন। পথ্য প্রস্তুত করা ইত্যাদির দায়িত্ব নেন ঐশ্যাতাঠাকুরানী। তাঁকে সাহায্য করেন লক্ষ্মীদেবী ও অন্যান্য স্ত্রীভক্তগণ। এইভাবে ঠাকুরের ব্যাধির চিকিৎসা ও তাঁর সেবাসুস্রার সুব্যবস্থা হওয়াতে ঠাকুর ঐরাবতক কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। চিকিৎসক ও ভক্তগণের মনে আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ঐরাবতকের পূর্ব-ঘোষিত লক্ষণগুলি, যেমন ঠাকুরের কনকাতার স্নানোৎসব, বার-ভার হাতে আহার করা, অপরকে প্রস্তুত আহারের প্বেবাংশ-গ্রহণ, শুধুমাত্র পায়ের খেঁচে থাকা, ইত্যাদি লীলাবসানের স্পষ্ট ইঙ্গিত করছিল। কিন্তু অগ্রিম রূঢ় বাস্তবকে মন সহজে মানতে চায় না। সমাগত দিনমণির অবসান তুলে বাস্তব বিচিত্র বর্ণময়ী দিনমণির অন্তরাগের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়। তেমনি অবতারপুরুষের অন্তরীলার চিহ্নগুলির ঐশ্বর্য, আনন্দ-প্রভার বিজয়রূপ ভক্তগণকে মুগ্ধ করে রাখে।

কালব্যাপিতে ঠাকুরের স্থিতি বৃদ্ধির দ্রুত অবসর চিকিৎসক ও সেবক ভক্তগণের অনেকের চিন্তার কারণ হয়। কিন্তু আনন্দপুরুষ ঠাকুরের সেহিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। “এই নিদারুণ রোগের ব্যথা তিনি লক্ষ্য।

১২ কথাবৃত্ত ৪।১৪।১

১৩ কথাবৃত্ত ৪।৩১।১

হাতাননে লুহ করিতেন। একদিনও বিষয় অথবা চিন্তিত হন নাই। যখনই যে গিয়াছে, তাহারই সহিত ঐশ্বরিক বাক্যালাপ করিয়াছেন। লোকে ব্যাধির বিভীষিকা দেখাইলে তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, ‘দেহ জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।’^{১৪} জলভারে চকল মেঘমালার স্তায় করুণার দ্বারে তারদ্রষ্ট ঠাকুর শ্রীরাঘবকৃষ্ণ মাহুকে জিতাপ, সস্তাপ থেকে শান্তি দেবার অস্ত্র সদা ব্যগ্র। তাঁকে দেখে হতঃই মনে হত একমাত্র ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’^{১৫} তাঁর জীবনধারণ। শ্রীশ্রীরাঘবকৃষ্ণ কথামৃতকার ঠাকুরের এই সময়কার মনোভাবটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘(ঠাকুরের) এতো অস্থখ—কিন্তু এক চিন্তা—কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। নিশিদিন কোন-না-কোন ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।’

অবতারের স্বরূপ অনিকাংগের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকে। ঠাকুর নিজেই বলতেন, ‘তারে কেউ চিনলি না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।’^{১৬} কিন্তু কালীপুর উদ্ভানে অবতারপুরুষ যে প্রেমের হাট বসান, তার রসমার্থ আশ্বাসন করতে কারোরই অহুবিধা হয় না। ঠাকুর শ্রীরাঘবকৃষ্ণ অকাতরে প্রেমদান করতে থাকেন। রূপান্ধর্ষ ভক্তদের চৈতন্ত্যবান করতে থাকেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরের বিবরণীতে কথামৃতকার লিখেছেন, ‘আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বলছেন, ‘তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।’ কালীপদ^{১৭} বক্ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, ‘চৈতন্ত হও’ আর চিবুক ধরিয়া আলদা করিতেছেন। আর বলিতেছেন, ‘যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহ্বিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।’ আজ সকালে দুইটি ভক্ত স্রীলোকের উপরেও রূপা করিয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া

১৪ রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরাঘবকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৪

১৫ মহাবক্ত অবদানস্, Sanskrit College, Calcutta, Vol. II, p. 193

১৬ কথামৃত ৩।১২।৩

১৭ কালীপদ ঘোষ কাগজ-বিক্রেতা জন ডিকিন্সন কোম্পানীতে কাজ করতেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার বলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। রাঘবকৃষ্ণ-পরশমণি তাঁর জীবনকে বর্ণনায় পরিণত করেছিল। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ নবদুগের জগাই-মাধাই বলে পরিচিত ছিলেন।

তাহাদের বন্ধ চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন; একজন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনার এত দয়া!' প্রেমের ছড়াছড়ি। সিঁথির গোপালকে^{১৮} কৃপা করিবেন বলিয়া বলিতেছেন, 'গোপালকে ডেকে আন।' সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর বলছেন, "লোক-শিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি।" সমাধি-ভবের পর বলেন, "দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে।...এখনও দেখছি নিরাকার অথও সচ্চিদানন্দ এই রকম করে রয়েছে!..."

উজ্জ্বল প্রেমভক্তির উজ্জ্বল চতুর্দিকে প্রাণ। প্রেমদাতা ত্রিরাশিক প্রেমবিতরণের জন্ত ব্যাকুল। প্রেমবিতরণ যেন তাঁর এক বিষম দায়। তিনি আপনমনে গাইতেন,

এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়।

যায় দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়।

হয়ে বিদেশিনী নারী, লাভে মুখ দেখাতে নারি,

বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া এক দায়।^{১৯}

তিনি দক্ষিণেশ্বরে কুশীবাড়ীর উপর থেকে আরতির সময় ব্যাকুলভাবে ডাকতেন, 'ওরে, কে কোথায় তক্ত আছিল আর।' তক্ত তক্ত নিয়ে আসার জন্ত অগজ্ঞানীর কাছে বারংবার প্রার্থনা জানাতেন। একদিন যুবক তক্ত লাটু খতিয়ে দেখেন মাত্র একত্রিশ জন যোগ্য পাত্র জুটেছেন। শুনে প্রেমদাতা ত্রিরাশিক যেন অহুঃবোগ করে বলেন, "কৈ, তেমন বেশী কৈ?"^{২০} 'প্রেমপাথার' ত্রিরাশিকের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন তক্ত গিরিশচন্দ্র। তিনি বলেন, "একদিন পরমহংসদেবের নিকট বাইয়া দেখি তিনি ঝুঁ ঝুঁ করিয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, নিতাই আমার হেঁটে হেঁটে ঘরে ঘরে প্রেম দিচ্ছেলেন, আমি কি না গাড়ী না হলে চলতে পারি না। আর একসময়ে বলেছিলেন, আমি সাঙ খেয়েও পরের উপকার করব।"^{২১} মাহুবকে প্রেমভক্তি শিখাবার জন্ত ঈশ্বর মাহুব হয়ে, অবতার হয়ে আসেন,

১৮ পরবর্তীকালে ইনিই স্বামী অষ্টতানন্দ নামে পরিচিত হন।

১৯ পুঁথি, পৃ: ৫২১

২০ কথামৃত ২.৪।২

২১ Minutes of the 14th meeting of the Ramakrishna Mission Association held on 25.7.1897

তাছাড়া “অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আত্মদান করা যায়।”

ভগবৎ-প্রেম-আত্মদানের স্বরূপ একটু করেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জাহুয়ারী।

সেদিন শুক্রবার, ১৮ই পৌষ, কৃষ্ণা একাদশী তিথি। নির্মল আকাশ, শীতের স্বর্ষ শ্রীতি বিকিরণ করছে, অনেকদিন পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মবেশ কিছুটা স্বস্থ ও প্রকৃত বোধ করছিলেন। অবতার-গোমুখ হতে যে করুণাগঙ্গা নিরত করিত হচ্ছিল আত্ম সকালবেলাতেই তা শতধারায় করতে থাকে। ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাধন কৃণামূর্তি ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য উদ্গ্রীব।

নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ।

ভবনে বিরাজমান কল্পতরুবেশ ॥২২

“পূর্ব সপ্তাহে তাঁহার কোন সেবক হরিশ মুক্তফীর^{২২} পরিজ্ঞাপের জন্য পরমহংসদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে দিবস তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ১লা জাহুয়ারীর দিন হরিশ পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবামাত্র তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। হরিশ আনন্দে উন্নতের জ্ঞার ছুটে যান নীচে। অঙ্গপূর্ণলোচনে উপরোক্ত সেবককে বলেন, ‘ভাই রে, আমার আনন্দ যে ধরে না! একি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখি নাই।’ সেবকেরও চক্ষে জল আসে। তিনি বলেন, ‘ভাই, প্রভুর অপূর্ব মহিমা’ ॥^{২৩}

তথু যে হরিশ বিন্মিত হয় তা নয়, উপস্থিত ভক্তগণ হরিশের হরিশ দেখে মুগ্ধ হন। “উৎখলিত কৃপাসিদ্ধ প্রভুর এখন।” তিনি কৃপা দান করতে উদ্ভূত। তিনি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে বাড়ীর নীচে হলধরে সন্ধ্যাপ করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবেন্দ্র ঠাকুরের ঘর থেকে ফিরে এসে উপস্থিত ভক্তগণকে জানানেন, “পরমহংসদেব আমাকে ডিজাসা করলেন, ‘রাব যে

২২ পুঁথি, পৃঃ ৬১৩

২৩ ইনি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ীল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, বাহুব্বারা অ্যাক্তে মরা যেমন হরিশ। ইনি জাতিতে তিলি, বৃত্তিতে ব্যাখ্যান-শিক্ষক, বাড়ী কলকাতার গড়গার। আকৃতি লৌহসদৃশ, প্রকৃতি ছিল অতি কোমল।

২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৪-৭৫

(১২৩)

রামকৃষ্ণ—১৩

আমার অবতার বলে, একথা তোমরা স্থির কর দেখি। বেশবকে তাঁহার শিত্তরা অবতার বলিত'।" "একবার অর্থ কেহ বুঝিতে নারিল। কথার অগুচ বর্ষ কথার রহিল।"

আজ বছর :লা ছুটির দিন। ঠাকুর ছুপুরে আহ্বারের পর সাধাক্ত বিজ্ঞান করে উঠেছেন। একে একে বেশ কয়েকজন ভক্ত বাগানবাড়ীতে উপস্থিত। মধ্যাহ্নের পর উপস্থিতের সংখ্যা জিশ ছাড়িয়ে যায়। ভক্তেরা ধলে ধলে তাগ হয়ে নীচে হসবরে বসেছিলেন, উতান-প্রাঙ্গণে শীতের মিঠে মোহ উপভোগ করছিলেন, বা গাছের ছায়ায় বসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবৃত্ত আলোচনা করছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের কয়েক জনের নাম লীলাগ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন : "গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, 'কথাবৃত্ত'-লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন।" পুঁথিকার এঁদের অতিরিক্ত উপেন্দ্রনাথ বজ্জব্দার ও রাঁধুনী ব্রাহ্মণ 'গাছুলি'র উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও স্বামী অভেদানন্দ, ২৫ ভাই ভূপতি ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এবং স্বামী অমৃতানন্দ, ২৬, 'হরিশ ভাইয়ের' উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে যারা আজীবন ত্যাগব্রত অবলম্বন করেছিলেন সে-সকল অন্তরঙ্গ ভক্তদের কেউ সেধিনকার ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি। আবার ত্যাগী বা পৃথী কোনও জীতক সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায় না। তাছাড়াও দেখা যায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে ঠাকুরের নিকট স্বপরিচিত; রবাহৃত বা সন্তপরিচিত কাউকে দেখা যায় না।

তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুর রামলালকে ডেকে বললেন, "দেখ, রামলাল, আজ ভাল আছি বলে মনে হচ্ছে, তা চল্ একটু নীচে বেড়িয়ে আসি।" ২৭ ঠাকুরের পরনে ছিল একটি লালপেড়ে ধুতি, একটি সবুজ

২৫ স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা, পৃ: ৮৪

২৬ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : শ্রীশ্রীলাট্ট মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃ: ২৫২

২৭ কমলকৃষ্ণ বিজ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গগ্রন্থ (রামলালদ্বাধার ধৃতি থেকে সংগৃহীত), পৃ: ৩৫; লাট্ট মহারাজের স্মৃতিকথাতে (পৃ: ২৫২) পাই, "তিনি রামলালদ্বাধার সঙ্গে উপর থেকে নেনে বাগানে বেড়াতে গেলেন।"

রংয়ের পিরান, লালপাড় বনামো একখানি ঘোটা চাহর, সবুজ-রংয়ের কানচাকা টুপি, পায়ে বোকা ও ফুল-সতা আঁকা চট্টিজুতা, হাতে একটি ছড়ি। রামলাল তাড়াতাড়ি একখানি চাহর গায়ে অড়িয়ে নেন। তিনি এক হাতে গাষছা গাড়ু নিয়ে ঠাকুরকে ধরে উপর থেকে নীচতলার নিরে আসেন। ২৮ ঠাকুর নীচের হলঘরটি ভাল করে দেখেন। নরেন্দ্র ও অন্তান্ত কয়েকজন যুবকভক্ত গতরাজিতে ঠাকুরের সেবা অথবা সাধনভক্তনের জন্ত রাহিআগরণে ক্রান্ত থাকার হলঘরের পাশে ছোট ঘরটিতে ঘুমোচ্ছিলেন। ঠাকুর হলঘরের পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সুরকির রাস্তা ধরে দক্ষিণদিকের কটকের দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন। ঠাকুরকে হঠাৎ নীচে নামতে দেখে কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরের পিছু নেন। সেবক লাটু এতক্ষণ পর্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন, ২৬ ভক্তদের অহসরণ করতে দেখে তিনি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর দক্ষিণপাশ পর্যন্ত এসে ফিরে যান। তিনি অপর এক যুবক ভক্ত শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের বসবাসের ঘরখানি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করেন ও বিছানাপত্র রোজে দেন।

ঠাকুর ত্রিরাহকৃষ্ণকে বেড়াতে দেখে ভক্তদের আজ বিশেষ আনন্দ। কেউ ছুটে এসে তাঁকে প্রণাম করেন, কেউ বা চুপচাপ তাঁকে অহসরণ করেন। গৃহী ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের তখন প্রবল অহুসাগ। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, “মন তখন আনন্দে পরিমুগ্ধ। যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নই—জন্মে বাদাহুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য—ঈশ্বর আশ্রয়দাতা—এই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য। এইভাবে আজ্ঞার হইয়া দিনযামিনী যায়। শরনে স্বপনেও এই ভাব,—পরম সাহস—পরমাস্ত্রীর পাইয়াছি—আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাত্ম—বৃত্যত্ম—তাহাও দূর হইয়াছে।” ৩০ ঠাকুর ও তাঁর তৈরবভক্ত গিরিশ সম্বন্ধে বলতেন, “গিরিশের

২৮ ত্রিরাহকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৫

২৯ লীলাপ্রসঙ্গ, শুকতাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১১২-২০

৩০ কুম্ভবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ১৭০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গিরিশ বক্তৃতাবলী।

পাঁচসিকে পাঁচ-আনা বিখাল।” গিরিশ ঠাকুরকে ঈশ্বরের ৩১ অবতারভাবে ভক্তিপ্রদা করতেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর মহত্ত্ব বলে বেড়াতেন। রায়হত, অতুল প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে গিরিশ পশ্চিমের একটি আমগাছের তলায় বসে আলাপ করছিলেন। হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ে আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছেন। তাঁরা দেখেন,

আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার।

বারেক দেখিলে কতু নহে ভুলিবার।

* * *

শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।

কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল।

হারণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।

কিন্তু বরান্নেতে কান্তি বহে নিরন্তর।

মনে হয় অলবাস সব দিয়া খুলি।

নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি ॥৩২

৩১ রামকৃষ্ণ শিশুদের চতুর্দশ অধিবেশনে গিরিশচন্দ্র ভাষণ দেন, “...আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মত ভালবাসিতেন। আমি কখনও বদ্ধু পাই নাই কিন্তু তিনি আমার পরমবদ্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমার বেশী ভালবাসিতেন।”

৩২ পুঁথি, পৃ: ৬১৪। উপস্থিত রামচন্দ্র হস্ত লিখেছেন, “সেইদিনকার রূপের কথা শ্রবণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাভের কান-ঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিগ্‌মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের-যে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহারও জানা ছিল না। (সেইরূপ আর একদিন ইতিপূর্বে নবগোপাল ঘোষের বাগীতে সঙ্গীতনের সময় দেখা গিয়াছিল)’ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃ: ১৭৫।

বসন্তবাসী ও ফটকের মাঝামাঝি ঠাকুর পৌছলে গিরিশ, রায় প্রভৃতি তাঁর নিকট উপস্থিত হন। অকস্মাৎ ঠাকুর গিরিশকে বলেন, “তুমি যে সকলকে এত কথা বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, কি বুকেছ?” গিরিশের অগাধ বিশ্বাস। তিনি এই আকস্মিক প্রশ্নে বিচলিত হন না। তিনি সসম্মখে রাক্ষাস উপর ঠাকুর ত্রিভুজের পদতলে আছ পেতে উপবিষ্ট হয়ে করলোড়ে গদগদ করে বলেন, “বাস বাঙ্গালীকি ধার ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কি আর বলতে পারি।” গিরিশের উক্তির প্রতি ছুঁতে তাঁর অন্তরের সরল বিশ্বাস অভিযুক্ত হয়। গিরিশের এই অপরূপ স্তব ঠাকুরের দৈবী কল্যাণী শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। দেখা গেল ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। শরীর স্পন্দনহীন, নয়ন স্থির! মুখে দিব্য হাসির ঝলক। বাহুশূন্য। আর সে মাহুস নয়। মুক্ত বিশ্বের সবাই দেখেন, ঠাকুরের রূপমার্ঘ্য যেন শতগুণে বেড়েছে। মহা উল্লাসে গিরিশচন্দ্র ‘জয় রামকৃষ্ণ’ ‘জয় রামকৃষ্ণ’ ধ্বনি দিয়ে বারবার ঠাকুরের পদরজ গ্রহণ করতে থাকেন।

অন্ধর মাঠার প্রস্থ করেকজন ‘পাছের উপর...ডালে ডালে বানর বানর’ খেলা করছিলেন। ঠাকুরকে বাগানে পায়চারি করতে দেখে দৌড়ে তাঁর নিকটে উপস্থিত হন। অন্ধর মাঠারের হাতে ছিল দুটি জ্বরটাশা ফুল। সমাধিস্থ ঠাকুরকে দেখে ভাবের আবেগে—

“পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে

তোলা দুটি টাশা ফুল দিছ দুটি পায়ে।”

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকুরের অর্ধবাহুদশা দেখা গেল। তিনি সহাস্তবদনে উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও প্রসন্নতার আশ্রয় হইল—

“ভক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায়।

তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি।

চৈতন্য হউক আর কি বলিব আমি।”

প্রেমবিহ্বল ঠাকুর এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এদিকে দিব্যশক্তিপূত আশীর্বাণী ভক্তদের অন্তরে আলোড়ন তোলে, ভাবের উচ্ছ্বাসে তারা যেন স্থান কাল ভুলে যায়। ভাবের উচ্ছ্বাসে কেউ জ্বরধ্বনি দেয়, কেউ গাছ থেকে হুল ভুলে ঠাকুরের শ্রীচরণে অঙ্গুলি দেয়, কেউ বা

পুণ্ড্রটির হাত ফুল উপরের দিকে ছুঁতে দেয়, ঠাকুরের পদধূলি দেবার অস্ত্র
 ছড়োহড়ি পড়ে যায়। ঠাকুর আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত তারা ঠাকুরের
 দিব্যদেহ স্পর্শ করবে না বাহের এই সঙ্কল্প তুলে বান। তাহের বোধ হয় যে,
 তাহের হুঃখে হরদী কোন দেবতা তাহের কল্যাণের জন্য আশ্রয়দানের জন্য
 সঙ্গেহে আহ্বান করছেন। প্রথম ব্যক্তি ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করে
 দাঁড়াতেই ঠাকুর তাবাবস্বায় তাঁর বক স্পর্শ করে নীচ থেকে উপরের দিকে
 হাত চালনা করে বলেন, ‘চৈতন্ত হোক’। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রণাম করলে
 তাঁকেও অমরুপ রূপা করেন, তৃতীয় ব্যক্তিকে, চতুর্থ ব্যক্তিকে,
 একে একে সমাগত সব ব্যক্তিকে তিনি ঐরূপ দিব্যস্পর্শ দান
 করলেন। ৩৩ “আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের জিতর অগূর্ব তাবাক্তর
 উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার
 কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক দয়ানিধি ঠাকুরের রূপালাভ
 করিয়া ধন্ত হইবার জন্য অপর সকলকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে
 লাগিলেন।” ৩৪ সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে। সেই সময় হারাণচন্দ্র

৩৩ স্বামী সারদানন্দ ‘লীলাগ্রন্থ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ’ পৃ: ৩২৫,
 লিখেছেন, “কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণার ও প্রসন্নতায়
 আত্মহারা হইয়া দিব্যসক্তিপূত স্পর্শে তাঁহাকে রূপার্থ করিতে
 আমরা ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিতাই দেখিয়াছিলাম,
 অস্ত্র অর্ধবাহুদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে স্পর্শ
 করিতে লাগিলেন।”

৩৪ লীলাগ্রন্থ, শুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃ: ১২২।

এই ঘটনার প্রত্যেক অভিজ্ঞতার আরেকটি চিত্র পাই তগিনী
 নিবেদিতার লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন,

“...a story was told me by a simple soul, of a certain
 day during the last few weeks of Sri Ramakrishna's
 life, when he came out into the garden at Cossipore,
 and placed hand on the heads of a row of persons,
 one after another, saying in one case, ‘Aj thak’ ‘To
 day let be?’ in another, ‘chaitanya hauk!’ ‘Be
 awakened!’ and so on. And after this, a different

হালও ঠাকুরের পদধূলি পরমভক্তিভরে গ্রহণ করেন। ঠাকুরকে প্রণাম করা মাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁহার মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করেন। ধন্য হারাণচন্দ্র! দেখে মনে হয়, পুরাকালে যেমন নারায়ণ গয়শিরে পদার্থপূজা করে পিতৃপুরুষদের মৃত্যুক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিলেন, সেরকম আজ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গদাধররূপে ভক্তকে কৃপাদান করে কালীপুরকে মহাতীর্থে পরিণত করলেন। কিছু সময়ের মধ্যে ঠাকুরের ভাবের উপশম হয়। এভাবে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের মাতিয়ে নাচিয়ে কাঁদিয়ে হাসিয়ে নিজে হাসতে হাসতে ভবনের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়ে অন্ধর মাষ্টারের উপর। অন্ধর মাষ্টার লিখেছেন,

gift came to each one thus blessed. In one there awoke an infinite sorrow. To another, everything about him became symbolic, and suggestive ideas. With a third the benediction was realised as overwelling bliss. And one saw a great light, which never thereafter left him but accompanied him always everywhere, so that never could he pass a temple, or a wayside shrine without seeming to see there, seated in the midst of this effulgence,—smiling or sorrowful as he at the moment might deserve—a Form that he knew and talked of as “the spirit that dwells in the images.”

—The Complete works of Sister Nivedita, Vol. I

২২ হারাণচন্দ্র বেলেঘাটায় বাস করতেন। তিনি কলকাতায় কিনলে যিগুর কোম্পানীর অফিসে কাজ করতেন। বাবী সারদানন্দ এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটির প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপাদান সন্দেহ লিখেছেন, “ঐরূপে কৃপা করিতে আমরা তাঁহাকে অন্নই দেখিয়াছি।” হারাণচন্দ্র প্রতিবৎসর এই দিনে মহাকৃপার স্মরণোৎসব করতেন।

পরে প্রভু কিরিলেন ভবনের গথে ।
 দাঁড়ায়ে আছিহু হুই অনেক তকাত্তে ॥৫৬
 ঘুরে থেকে সম্ভাবিয়া কি গো বলি মোরে ।
 পরশিয়া হস্ত দিয়া বন্ধের উপরে ।
 কানে কিবা বলিলেন আছয়ে শ্রবণে ।
 মহামন্ত্রবাক্য তাই রাখিহু গোপনে ॥
 কি দেখিহু কি শুনিহু নহে কহিবার ।
 মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার ॥৫৭

অক্ষয় মাষ্টার এই অপ্রত্যাশিত ও দুর্লভ স্পর্শের আবেগ যেন সঙ্করিতে পারেন না। কৃষ্ণকায় কদাকার অক্ষয় সেনের (ষাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ আদর করে ডাকতেন শাকচুরী) দেহ বৈকে চুরে অদ্ভুত আকার ধারণ করে। আনন্দাক্রম বিসর্জন করতে থাকেন তিনি, শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণের দ্বিব্যাস্পর্শে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন। ৩৮

৩৬ ‘কথামৃত’ (৩।১৩।৪) জানা যায়, দেবেন বহুমহারের বাড়ীতে অক্ষয় মাষ্টার ও উপেক্ষ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের পদসেবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু তত্তপোষ্টিতে প্রচলিত ছিল যে ঠাকুর তাঁর শ্রীঅঙ্ক অক্ষয় মাষ্টারকে স্পর্শের অধিকার দিতেন না। তার অঙ্ক অক্ষয় মাষ্টারের খেদের শেষ ছিল না, তিনি তাঁর ‘শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণ-মহিমা’ (পৃ: ৩৬-৩৪) পুস্তকে লিখেছেন, “আমার সঙ্গে ঠাকুর যে রকম ব্যবহার করতেন, এমন যদি অঙ্ক কোন লোকের সঙ্গে হ’তো, তা হ’লে সে প্রাণ গেলেও আর তাঁর কাছে যেত না।” “আমার বাপকে আমি যেমন ভক্ত করতাম, ঠাকুরকেও তেমনি ভক্ত করতাম।” আলোচ্য দিনে ভক্তরা যখন ঠাকুরের পদধূলি নিতে বাস্তু, অক্ষয় মাষ্টার সে-সময়ে ভয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩৭ পুঁথি, পৃ: ৬১৫

৩৮ অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন, “রাধকৃষ্ণদেব এখন আমাকে বা দেখিয়েছেন, বা বুঝিয়েছেন, তাতে বেশ দেখতে পেরেছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, তিনিই সেই ভগবান, ভগবানের অবতার, ছনিয়ার মালিক, সর্বশক্তিমান সেই রাম, সেট কৃষ্ণ, সেই কালী, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—মনবুদ্ধির অতীত আবার মনবুদ্ধির গোচর।” (শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণমহিমা, পৃ: ১৮)

ইতিমধ্যে কৃপাধর রামচন্দ্রদত্ত নবগোপাল ঘোষকে গিয়ে বলেন, “স্বশ্য, আপনি কি করছেন—ঠাকুর বে আদ করতর হয়েছেন। বান, বান, শ্রী বান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে নিন।” নবগোপাল ঐ ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বলেন, “প্রভু, আমার কি হবে?” ঠাকুর একটু নীরব থেকে বলেন, “একটু ধ্যান জপ করতে পারবে?” নবগোপাল উত্তর দেন, “আমি ছা-পোষা গেরস্ত লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমার নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায়?” ঠাকুর একটু চুপ করে আবার বলেন, “তা একটু একটু জপ করতে পারবে না?” উত্তর—“তারই বা অবসর কোথায়?” “নাচ্ছা, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?” উত্তর—“তা খুব পারব।” ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে বলেন, “তা হলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।” তারপর উপস্থিত হন উপেক্ষনাথ মজুমদার। “উপেক্ষ মজুমদারে করি পরশন। লোহার তাঁহার তরু করিলা কাশন।” তারপর কৃপালাভ করেন রামলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর স্বতিকথার বলেছেন, “আমি ভাই ঠাকুরের পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে, সকলের ত একরকম হ’ল, আমার কি গাড়া গামছা বরা গার হ’ল? একথা যেমন মনে হওয়া তিনি অমনি পিছন ফিরে বললেন, ‘কিরে রামলাল, এত ভাবছিস কেন? আর আর।’ এই বলে আমার সামনে দাঁড় করালেন, গায়ে চাদর খুলে দিলেন। বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন—‘দেখ্ দিকিনি এইবার।’” রামলাল বলেন, “আহা, সে যে কি রূপ, কি আলো জ্যোতি! সে- আর কি বলব।”^{৩৯} তিনি স্বামী সারদানন্দকে আরও বলেন, “ইতিপূর্বে ইষ্টদুর্তির ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্কের কতকটা মাত্র মানস মননে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ম দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না, আবার মুখ হইতে কটিদেশ পর্যন্তই হয়ত দেখিতে পাইতাম, শ্রীচরণ দেখিতে পাইতাম না, ঐরূপে বাহা দেখিতাম তাহাকে সঙ্গী বসিয়াও মনে হইত না; অতঃপর স্পর্শ করিবারাত্র সর্বাঙ্গস্থলর ইষ্টদুর্তি ক্ষয়পদ্মে সহসা আবির্ভূত হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল।”^{৪০} তারপর কৃপালাভ

৩৯ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গপ্রসঙ্গ (প্রথম সংস্করণ), পৃ: ৩৫

৪০ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যতাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃ: ৩২৬-২৭

করেন গিরিশচন্দ্রের তাই অতুলকৃষ্ণ ও কিশোরী রায়।^{৪১} ইতিমধ্যে তাই ছুপতি ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে সমাধি প্রার্থনা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করে আশীর্বাদ করেন, “তোমার সমাধি হবে।”^{৪২} তারপর উপস্থিত হন উপেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়। দারিদ্র্যের কশাঘাতে অর্জরিত উপেন্দ্রনাথ নীরবে প্রার্থনা জানান অর্থসাম্রল্যের জন্ত। ঠাকুর তাঁকে কৃপা করে বলেন, “তোমার অর্থ হবে।”^{৪৩}

ঠাকুরের দিব্যশক্তিশর্শে করেকজন কৃতকৃতার্থ হবার পর বৈকুণ্ঠনাথ সায়্যাল ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানান, “শশায়, আমার কৃপা করুন।” ইতিপূর্বে বৈকুণ্ঠ ইষ্টদর্শনলাভের জন্ত ঠাকুরের কাছে কয়েকবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। প্রত্যেকবার ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, “রোগ না, আমার অঙ্গুষ্ঠটা ভাল হোক। তারপর তোর সব করে দিব।” এখন ঠাকুর প্রসন্নভাবে তাঁকে বলেন, “তোমার তো সব হয়ে গেছে।” বৈকুণ্ঠ প্রার্থনা জানান, “আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় হয়ে গেছে, কিন্তু আমি যাতে অল্পবিস্তর সুখে পারি তা করে দিন।” “আচ্ছা” বলে ঠাকুর অণেকের জন্ত বৈকুণ্ঠের হৃদয় স্পর্শ করেন ও বলেন,

৪১ কৃষ্ণগরের লোক, বৈকুণ্ঠনাথ সায়্যালের বন্ধু। দীর্ঘ শত্রু রাধাতে নরেন্দ্রনাথ তাকে ডাকতেন আবহুল! বৈকুণ্ঠনাথ সায়্যাল লিখেছেন, “একে একে রামলালদাশা, অতুলচন্দ্র, কিশোর, অক্ষয়-মাষ্টার প্রভৃতি অনেকের দ্বয়ে ‘জাগ জাগ’ বলিয়া হস্তপ্রদান করিলে “তাহাদের চিত্ত তরুণ হইয়া সর্বদেবময় তত্ত্ব প্রভূতে য য ইষ্টরূপ দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল।” লীলাবৃত্ত, পৃ: ১২২

৪২ স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা, পৃ: ৮০

৪৩ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা লিখেছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। “সে (উপেন্দ্রনাথ) যখন হৃদয়েবরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত, তখন একদিন ঘরতরা তত্ত্বদের মধ্যে ঠাকুর অজুনি-নির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘এ ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থ কামনা করে আসে বার।’” (স্মৃতিকথা, পৃ: ১৮২) শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পূর্ণ হয়েছিল। তিনি উত্তরকালে বঙ্গমতী সাহিত্য হৃদয়ের স্রষ্টা ও মালিকরূপে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন ও তাঁর সম্পদের সচ্যবহার করেন।

“মা, আগ জাগ।” “অমনই সে তাহার অন্তর-বাহিরে, পুতুলিবাং তন্ত-
বগলীমধ্যে, উদ্ভানের পানপপজে ও গগনে সর্বময় শ্রীরামকৃষ্ণ
দেখিয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। পাণ্ডুরোগে আঁখিতে
যেমন সকল পদার্থই হরিত্রাত দেখায়, তাহার ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল।
কিন্তু আবেগে এক আধ ঘণ্টা বা একদিন নহে, ক্রমাগত দিবসজয়
এইরূপ দর্শনে সে যেন উদ্ভাদের মত হইয়াছিল।”^{৪৪} বৈকুণ্ঠ প্রবল
আনন্দে অধীর হয়ে উঠেন। সে সময়ে শরৎ লাটু প্রভৃতিকে ছাদে
দেখতে পেয়ে তিনি ‘কে কোথায় আছি! এই বেলা চলে’ আর’ বলে
চীৎকার করে ডাকতে থাকেন। ঠাকুর তাঁকে নিরন্তর হাতে ইঙ্গিত করেন।
ইতিপূর্বে আনন্দে উন্নত গিরিশ ও রাম চীৎকার করে ভক্তদের আহ্বান
জানাত্তিলেন। কে কোথায় বাদ পড়ে গেল, সেই খোজে গিরিশ রামাঘরে
যান, দেখেন পাঁচক ব্রাহ্মণ গাছুলি কুটি বেলতে বসেছে। গিরিশ তাকে
টেনে নিয়ে ঠাকুরের সামনে উপস্থিত করলেন, দয়াময় ঠাকুর তার প্রতি
কৃপা করেন।^{৪৫}

“... কয়েকজনের পরিজ্ঞাণ হইলে, হরমোহন মিত্রকে^{৪৬} সম্মুখে আনয়ন
করা হইল। তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, ‘তোমার আজ থাক।’
(ইতিপূর্বে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পরমহংসদেবের নিকট কৃপা
প্রার্থনা করা হইয়াছিল ; কিন্তু সেবারও ‘এখন থাক,’ বলিয়াছিলেন।)^{৪৭}
মহানন্দের দিনে কৃপালাভে বঞ্চিত হয়ে তিনি বিমর্ষ হন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ
একদিন তাঁকে ও আত্মকের দিনে কৃপা-বঞ্চিত অপর এক ব্যক্তিকে
স্পর্শ করে কৃপা করেছিলেন। উত্তরকালে হরমোহন জনৈক ভক্তকে বলে-
ছিলেন যে, ঠাকুরের দিব্যস্পর্শের ফলে তাঁর অনেক অসুস্থতা লাভ হয়েছিল,
তিনি জ্বরুগল-মধ্যে অনেক দেবদেবীর দর্শনলাভ করেছিলেন।

৪৪ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবৃত্ত, পৃঃ ১১০

৪৫ পুঁথি, ৬১৫

৪৬ হরমোহন সিমলাপল্লীতে তাঁর মাতুল রামগোপাল বসুর নিকট
মাহুয হন। তিনি নরেন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন। শ্রীম তাঁকে
শ্রীরামকৃষ্ণের লাকোপাধ্যায়ের মধ্যে নির্দেশ করেছেন।

৪৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৬

ভক্তদের উল্লাস ও আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে মনে হল, 'বসেছে ক্যাপার হাট-
বাজার', ক্যাপার হাটে বিনে-বাহুলে প্রেম বিকার রায়কর রায়। "চীৎকার
ও অরবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা নিজা ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ
কেনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্ভানপথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া
ঐক্য পাগলের ভায় ব্যবহার করিতেছেন এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে
বিশেষবিশেষ ব্যক্তির প্রতি রূপায় ঠাকুরের দ্বিভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার
অভিনয় হইত তাহারই অঙ্গ এখানে সকলের প্রতি রূপায় সকলকে লইয়া
প্রকাশ!"^{৪৮} ত্যাগী যুবক ভক্তেরা ঘটনায়নে এসে পৌছিতেই^{৪৯} ঠাকুরের
দ্বিভাবাবেশ অকর্ষিত হল, সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হল। ভক্তগণ
তখনও বিস্মিত স্তব্ধ বিমূঢ়। বা ঘটে গেল তখনও তার অহুত্ব প্রত্যেকের
নিজ নিজ অভিজ্ঞতার জালমায়ান। উপস্থিত ব্যক্তিদের এই অবস্থায় ফেলে
রাশি রাশি রূপা ঢালি প্রভু ভগবান।

উপরে ষিভলভাগে করিলা পয়ান।

নিজের ঘরে কিরে ঠাকুর সেনক রায়লালকে বসেন, "শালাদের (সকল
ভক্তদের) পাণ নিরে আমার অঙ্গ জলে বাজে। গঙ্গাজল নিরে আমার গায়ে
মাখি।" রায়লাল 'ব্রহ্মচারি' গঙ্গাজল আনলে ঠাকুর তা গ্রহণ করে সর্বাঙ্গে
ছড়িয়ে দেন, তখন দেহের জ্বালা নিবারণ হয়। যুবক নিরঞ্জন সিঁড়ির
দরজায় পাহারায় বসেন, ভক্তদের ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

৪৮ লীলাগ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃ: ১২২

৪৯ যুবক ভক্তদের মধ্যে লাটু ও শরৎ ঠাকুরের ঘর গোছগাছ করছিলেন।
লাটু ভক্তদের চীৎকার শুনেও নীচে নামেননি। পরবর্তীকালে
জর্নৈক ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি সেদিন উপর থেকে
নেমে এলেন না কেন? শুনেছি সেদিন তিনি কল্পভক্ত হয়ে-
ছিলেন—যে বা চাইছিলো তাকে তাই আশীর্বাদ করেছিলেন।'।
লাটু মহারাজ উত্তর দেন, "তিনি তো আশীর্বাদ দিয়ে আমাদের
ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার কি চাইবো তাঁর কাছে?"
(শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃ: ২৫২) শরৎচন্দ্রও ঘটনা-
স্থলে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রার্থনা না জানাবার কারণ পরবর্তীকালে
বলেছিলেন, "পাবার ইচ্ছা তো মনে আসেনি, তা ছাড়া তিনি যে
আমাদেরই ছিলেন।" (ভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ, পৃ: ৩১১)

রামকৃষ্ণ-লীলার জটিল-কুটিল প্রতাপচক্র হাজরা কিছুদিনের জন্ত কানীপুর উদ্যানবাড়ীতে বাস করছিলেন। ঠাকুর যখন তাঁর বরাতর-কল্যাণমূর্তি প্রকট করেন সে সময়ে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পপস্থিত ছিলেন। রূপাবিতরণের-হাটবাজার থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঠাকুর নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। সে সময় হাজরা উদ্যানবাড়ীতে ফিরে এসে আনন্দবেলায় বিস্তারিত খবর শুনেন। অল্পপস্থিত হওয়ায় তাঁর খুব মনস্তাপ হয়। নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মিতালি; নরেন্দ্র হাজরাকে সঙ্গে করে ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হন এবং তাঁকে রূপা করার জন্ত ঠাকুরকে বিশেষভাবে অহরোধ করেন। ‘উত্তরে কহিলা রায় এবে নাহি হবে। সময়সাপেক্ষ কাজে শেষেতে পাইবে।’

সন্ধ্যার পূর্বে ভক্ত চুনীলাল বহু উপস্থিত হন। চুনীলাল ঠাকুরের রূপা-বিতরণের অপূর্ব কাহিনী শুনে মুগ্ধ হন। নরেন্দ্রনাথ চুনীলালকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বলেন যে, হয়ত ঠাকুরের শরীর আর বেশীদিন থাকবে না। চুনীলালের প্রার্থনীর কিছু থাকলে যেন এখনই নিবেদন করেন। হরজাহ্ন পাহারাদার নিরঞ্জনকে অতিক্রম করা অসম্ভব জেনে চুনীলাল স্বযোগের অপেক্ষা করেন। এক সময়ে নিরঞ্জন কোন কাজে গিয়ে যেতেই নরেন্দ্র ইঙ্গিত করেন, চুনীলাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। অযাচিত-রূপালিঙ্গ ঠাকুর সপ্রমে দ্বিজাসা করেন, “তুমি কি চাও?” চুনীলাল মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। ঠাকুর তখন নিজের হেঁছ হেঁথিয়ে বলেন, “এটাতে ভক্তি-বিশ্বাস রেখো, তোমারও হবে।” তিনি ঘরের বাইরে এসে নরেন্দ্রনাথকে সব জানালে নরেন্দ্র সোৎসাহে বলেন, “তবে আর আপনার ভয় কি?”

আনন্দের হাট থেকে আনন্দ-সওদা হুদয়গুলিতে পুরে গৃহী ভক্তগণ ফিরে যান। তখনও কেউ ভাবের আবেগে অধীর, কেউ আনন্দের আতিশয্যে বেসামাল, কেউ বা ঠাকুরের রূপা-অনুধ্যানে বিভোর। এইভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনকার রূপাশ্রকটলীলার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু তাঁর রূপাবিজ্ঞরণ অব্যাহত থাকে। রূপাবর্ষণে কখনও ক্ষীণ ধারা, কখনও বা প্রবল বেগ। পরের দিন ঘটনায় দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসে কুণ্ডলিনীর আগরণ অল্পভব করেছেন। ঠিক দুদিন পরেই ঠাকুর তাঁকে

১০ বাবী গভীরানন্দ : শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ.

পৃ: ১১১

সম্মতি থেকেও উচ্চ অবস্থাপ্রাপ্তির তরঙ্গা দিচ্ছেন। কৃপার বল-পবন
অব্যাহত ধারায় বইতে থাকে।

অধ্যাক্ষকগণের পূর্বসন্নিধি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করে তাঁদের স্পর্শ
করেছেন বা মনের কোণে ঠাঁই দিয়েছেন, উত্তরকালে তাঁদের এতদ্যেক
কৃপাকরিত হয়েছেন খাটি সোনার। কৃপাবলে তাঁদের ধর্মজীবন প্রদীপ্ত
হয়েছে, অধ্যাক্ষকগণের বিকাশে জীবনপথ প্রস্তুতিত হয়ে নিজের ও বিশ্বজনের
হিতসাধন করেছে। এই কৃপা কি বস্তু? কৃপার স্বরূপ বুঝতে সমর্থ
একমাত্র কৃপাধস্ত ব্যক্তি। কৃপাধস্ত ব্যক্তিই কৃপাসাগরে ডুব দিয়ে মনি-
মণিক্য সংগ্রহ করতে সক্ষম।

সেদিনকার কৃপাবিতরণ-উৎসবে অন্ততম কৃতার্থ ব্যক্তি কৃপা সম্বন্ধে
লিখেছেন,

কৃপার আনন্দ কি বা ক্ষয়ে না ধরে ।
কৃপা নহে কাড়ি পাতি নহে রাজ্যধন ।
কিংবা নহে মনোহর কামিনী কাকন ।
স্বখাহু ভোজন নয় নয় গীতা সুরা ।
নহে মাদকীয় কিছু কপানন্দধারা ।
তথাপি কৃপার মধ্যে হেন বস্তু আছে ।
তুলনার বাবতীর রাজ্যধন নিছে ।
কৃপার আনন্দরাশি বহু শতবার ।
ধন সে আবার বাহে কৃপার সকার ॥৫১

আলোচ্য দিনটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অকাতরে কৃপাবিতরণ করে-
ছিলেন, বেন কল্লতরু'রূপ ধরেছিলেন। সেদিন তিনি তাঁর নিজের কৃপা-
স্বরূপ উল্লেখ্য করেছিলেন, তাঁর অবতারব্দের প্রমাণ দিয়েছিলেন। সেদিন
তিনি প্রেমভাও ভেঙ্গে দিয়ে প্রেমের হাট গুটিয়ে ফেলার স্থচনা করেছিলেন,
তাঁর প্রকটলীলা সাদ্ধ করার ইচ্ছিত দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি
শরণাগত ভক্তদের অভয়াশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষয়ে বল তরঙ্গা উৎসাহ
উদীপ্ত করেছিলেন। সর্বোপরি কৃপার অবতারপুরুষই একমাত্র সর্বভূতের
স্বকল্পে বাহুব্দের কল্যাণের লক্ষ্য দেখধারণ করে থাকেন—তাঁর স্থপতি
প্রমাণ দিয়েছিলেন। সেই কারণেই ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী
ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়।

৫১ পৃথি, পৃঃ ৬১৪

নব্বৈপ্রসঙ্গে লোকশিক্ষার চাপরাস দান

জগন্নাথার দিব্যদর্শন ও নিত্যসকলাভ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনের আবির্ভাব, জগন্নাথার প্রেরণাতেই তাঁর সাধনকৃষিতে বারো বছরের স্থিতি ও অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শিখর হতে শিখরান্তরে বিচিত্র উৎকম্প এবং জগন্নাথার আদেশেই দিব্যভাবাক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপনের বিবিধ ও বিচিত্র উদ্যোগ। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “এর (নিজের) ভিতর তিনি নিজেকে নিয়েছেন—যেন নিজেকে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করেছেন।”

মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনযজ্ঞের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন বোড়শীপূজার অমুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অমুষ্ঠানে দিব্যভাবাক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিনী সারদাদেবীর মধ্যে জগন্নাথার কল্যাণময়ী শক্তিকে প্রবুদ্ব করেছিলেন, ধর্মশক্তি-সকালনে সক্ষম একটি প্রবল শক্তিসত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। সারদামণিকে তিনি বলেছিলেন, “আমি কি করেছি! তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী করতে হবে।”

১২৮০ সাল হতে বারো বছরের বেশী কাল সর্বধর্মবিরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের মৃতদান করে ধর্মসংস্থাপনের একনিষ্ঠ প্রয়াস। এই কালের তাঁর সকলপ্রকার আয়াস প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দুতে যে লোকসংগ্রহ তাঁর প্রয়োজন সম্পর্কশঙ্করাচার্য লেখেন, “সংপ্রয়োজনাতাবেহপি কৃতাহুজিহ্বকরা।” লোকসংগ্রহ ছিল তাঁর একটা মহৎ দায়বদ্ধ, তিনি আপনভাবে গাইতেন, “এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কয়। দায় দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়?” এই দায় ঈশবাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের করুণার লক্ষণমাত্র। তাঁরই করুণাত্ব স্বামী শিবানন্দজী লিখেছিলেন, “ঠাকুরের করুণার কাছে গতি-কতি, বেড়া-টেড়া সব তেড়ে যায়। তাঁর করুণাবারির বেগ অতিপ্রবল—নীচের দারাও উপরে ঠেলে ওঠে। এখন যে pumping system চলেছে, তা স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করেছে।”^১ এই করুণাবারির বেগেই শ্রীরামকৃষ্ণ রাজধানী কলকাতায় বিভিন্ন ধর্মের ও সাংস্কৃতিক নেতাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন, কাজ করেছিলেন। তখন গোষ্ঠীহিমাবে ব্রাহ্মসমাজের বিপুল প্রতাপ। ব্রাহ্মনেতাদের

১ ‘ঐশ্বরহাপুরুষদীর পত্রাবলী’ উদ্বোধন, পৃ: ১১২

অনেকেই শ্রীমদ্রুক-সারিথ্যে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হলেও, তাঁরা সেই শ্রীমদ্রুকের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির প্রকৃত তাৎপর্য ধারণা করতে পারেন নি, ল্যাভামুড়ো বাদ দিয়ে তাঁর ধর্মচিন্তাকে গ্রহণ করেছিলেন। জগদ্ব্যবস্থার উপর সদানির্ভরশীল শ্রীমদ্রুক বোঝেন যে, তাঁর প্রত্যক্ষবিজ্ঞানের সমার্থ-গ্রহণে সমর্থ ব্যক্তিদের আগমনের জন্য তাঁকে প্রতীক্ষা করতে হবে। দীর্ঘ-প্রতীক্ষা তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রাণের ভিতর এমন করে উঠত, এমনভাবে ঝোঁট দিত যে, তিনি স্বপ্নায় অস্থির হয়ে পড়তেন। লোকভয় বা লজ্জা কাটিয়ে তিনি দক্ষ্যার পর কুঠিবাড়ীর ছাদের উপর থেকে কেঁদে কেঁদে ডাকতেন, “তোরা সব কে কোথায় আছিস আর রে।” রূপাবারির বেগেই অবতার পুরুষের এই কাতরতা। এই ডাকে সাড়া দিয়ে একে একে লবাই আসতে থাকেন। জগন্নাথার চিহ্নিত ব্যক্তিদের চিনতে পারেন শ্রীমদ্রুক। এঁদের নিয়ে গড়ে তোলেন একতাবমুখী অন্তরঙ্গদল, আশপাশেই জমায়তে হন বহিরঙ্গের অঙ্গগণ। সমাগত ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্রুক বলতেন, ‘ভক্ত এখানে বারো আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার কর হে ঈশ্বর। আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ওকথা বলে না। তাদের দুটি জিনিস জানলেই হ’ল; প্রথম আমি কে? তারপর তারা কে?—আমায় সন্ধে সম্বন্ধ কি?’^২ এঁরা অবতারের অন্তরঙ্গ, ‘কলমির দল’, অবতারের নিত্যসঙ্গী। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, “যোগদৃষ্টিসহায়ে পূর্বপরিদৃষ্ট ব্যক্তিগণকে নিজস্বকাশে আগমন করিতে দেখিয়া অধিকারীভেদে প্রৌণীপূর্বক তাহাদিগের ধর্মজীবন গঠন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ঈশ্বরনাভের স্বস্ত সর্বব্যত্যাগরূপত্রে দীক্ষিত করিয়া সংসারে নিজ অভিনব মতপ্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।... অগুণ্ড প্রেমবন্ধনে নিজভক্তগণকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এমন অদ্ভুত একপ্রাণতা আনয়ন করিয়াছিলেন যে, উহার ফলে তাহারা পরম্পরের প্রতি অন্তরঙ্গ হইয়া ক্রমে এক উদার ধর্মসংঘে স্বভাবতঃ পরিণত হইয়াছিল।”^৩

‘নিজ অভিনব উদারমত-প্রচারের কেন্দ্র’ ও ‘উদার-ধর্মসংঘের’ পরিচালনের জন্য শ্রীমদ্রুক বেছে নিয়েছিলেন কয়েকজন আধিকারিক-

২। শ্রীশ্রীমদ্রুককব্যাবৃত্ত ৪।১৪।

৩। স্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীমদ্রুকলীলাগ্রন্থ, ৫।৬-৭

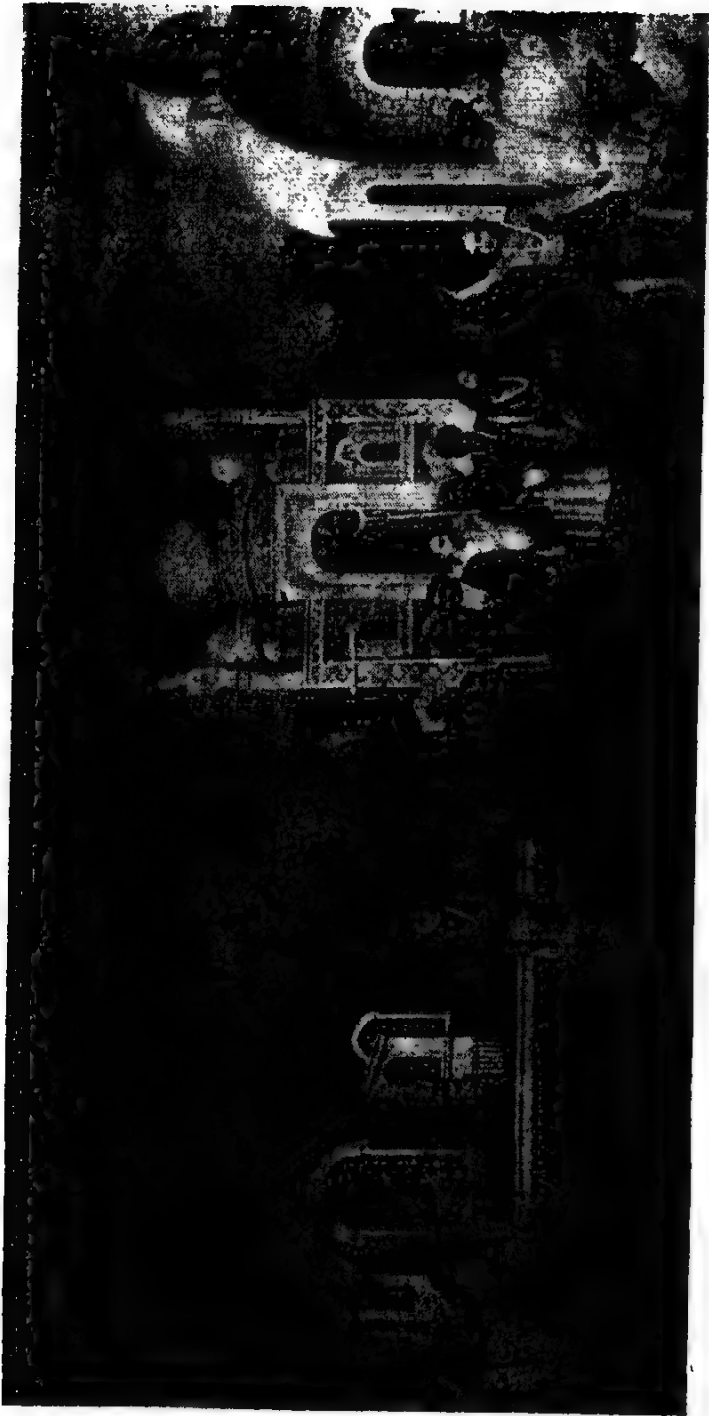
১৫
 গাভী গাভী গাভী গাভী
 (গাভী) গাভী গাভী গাভী
 গাভী গাভী গাভী গাভী

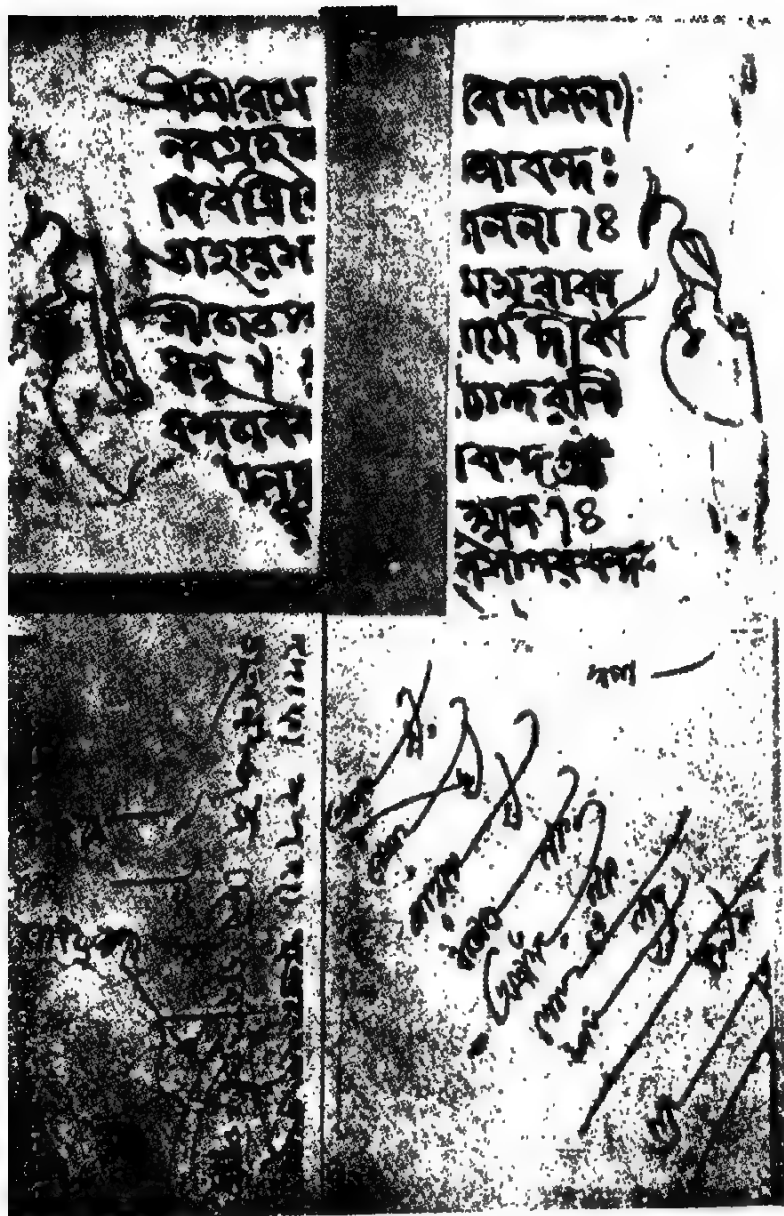
গাভী গাভী গাভী গাভী
 গাভী গাভী গাভী গাভী

গাভী



(২৩৫ পৃষ্ঠা) . এম. এ. হোসেন,





কিশোর ঐতিহাসিক আঁকা ছবি ও কথা হিসাব (পৃঃ ২৭)

পুরুষকে এবং তাঁদের নেতা হিসাবে নিরৈচ্ছিকেন একজন অসাধারণ যুবককে।
 ত্রিটি বলিষ্ঠ যোদ্ধা এক ভগবৎপরায়ণ যুবক। কলকাতার সিমলার হৃদয়ের
 বাড়ীর ছেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দর্শনেই চিনতে পারেন জগন্নাথার নির্দিষ্ট
 তাঁর জন্ত কুটোবাধা করীকে। তিনি লক্ষ্য করেন, যুবকের নিজের শরীরের
 দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল বা বেশভূষার কোন পারিণাট্য নেই। বাইরের
 কোন কিছুতেই যেন তাঁর আঁট নেই। চোখ দেখে মনে হয়, তাঁর মনে
 অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা টেনে রেখেছে। এ যে বড় সম্বলপের
 আধার! তথ্যাদি মিলিয়ে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন, 'বাঃ সব মিলে
 যাচ্ছে, এ ধ্যানসিদ্ধ—জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ।' তিনি প্রকাশ্যে বলেন, "দেখ,
 দেবী সরস্বতীর জ্ঞানালোকে নরেন কেমন জল জল করছে!" নিজের দিব্য-
 দর্শনের ভিত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করেছিলেন, "নরেন্দ্র শুদ্ধস্বজ্ঞানী! সে
 অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন।" দক্ষিণেশ্বর-প্রাঙ্গণে
 প্রথম-সাক্ষাতের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে নরেন্দ্রনাথকে অতিনন্দিত করে
 বলেছিলেন, "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ,
 জীবের হুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।" নিশ্চিত হবার
 জন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের উপর লৌকিক ও অলৌকিক বিবিধ পরীক্ষার
 প্রয়োগ করেন। দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয় সাক্ষাৎকারের দিনে ভাবন্ত নরেন্দ্রনাথকে
 চেতনার গভীরে আন্ড করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাঁর সম্বন্ধে নিজের
 ধারণা ও দর্শনাদি বাচাই করে নেন। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথই
 জগন্নাথার নির্দেশিত ব্যক্তি অগ্ন্যকল্যাণে বিশেষ তুসিকা-পালনের জন্ত,
 উপস্থিত হয়েছেন।

নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ মেটে না। নরেন্দ্র চোখের
 আড়াল হলেই তাঁর জদয়টা গামছা নিংড়াবার মত মোচড় দিতে থাকে।
 নরেন্দ্র-বিরহে তাঁর বসনা অহুত্ব করেন। তিনি নরেন্দ্রের প্রশংসায় সর্বদা
 পক্ষমুখ হয়ে উঠতেন। তিনি বলতেন, 'পদ্মের মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রবল',
 'ডোবা, পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীর্ঘ, যেমন হালদার পুকুর।' 'নরেন্দ্র
 রাঙা চক্ষু বড় কই—যার সব নানারকম মাছ—পোনা কাটি বাটা এই সব',
 'খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে', 'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের
 ঘর'। তিনি আরও বলতেন, 'আবার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু বেকি নেই;
 বাজিয়ে দেখ টং টং করছে।' তখনকার তারতবার্ষিক সর্বজনস্বীকৃত খেঁচ

(২০৩)

বর্মবেতা কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের তুলনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তির বিকাশ ঘটেছে সেদিক আঠারোটা শক্তি খেলছে নরেন্দ্রের মধ্যে। শোনে উপস্থিত সকলে; বিশ্বাস করে না অনেকেরই, আর নরেন্দ্র স্বয়ং প্রতিবাদ করেন। গীতাতোষে ‘ঈশদৃষ্টি-বিধানার’ ঈশ্বরের স্ববিকৃতির বর্ণন। তেমনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও স্তম্ভমণ্ডলীর মধ্যে নরেন্দ্রের নেতৃত্ব স্বপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন চাকলাকর বোষণা করতে থাকেন। তিনি ভক্তদের বলেন, “কথায় বলে অষ্টভৈরব হুকারেই গৌর নদীয়ার আসিয়াছিলেন— সেইরূপ শ্রী (নরেন্দ্র) অক্লান্তই তো সব গৌ।”^৪ নরেন্দ্রকে গড়ে-গিটে লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ তৈরী করার জন্যই যেন রামকৃষ্ণলীলাবিলাসের বিপুল আয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা করেন ও তিনিই অবতার। সেই সচ্চিদানন্দই বহুরূপে জীব হয়েছেন এবং তিনি মানুষরূপে লীলা করছেন...যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে ছড় ছড় করে গড়ছে”। সেই সচ্চিদানন্দের শক্তি একটা প্রণালী অর্থাৎ নলের ভিতর দিয়ে আসছে। রামকৃষ্ণ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে যে সচ্চিদানন্দ-শক্তির প্রকাশ ঘটেছে— অতুলনীয় তার বৈভব, ইতিহাসের মাপকাঠিতে অবিভীত তার সম্ভাবনা। লোকহিতের জন্য তিনি লীলাবিলাসের প্রাকৃত তমু ধারণ করেছিলেন। স্বমহিমার মহিমাযুক্ত হলেও অগম্যতার অমিহারাতে শাসন ও শাস্তি-বিধানের জন্যই তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। লোকহিতের ভাবনা সর্বক্ষণ তাঁর সর্বদয় জুড়ে। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন, “আমি সান্ত খেয়েও পরের উপকার করব।”^৫ ‘বহুজনহিতার বহুজনসুখার’ লোকসংগ্রহ-সংগঠন করেন তিনি। সে-উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির জন্য গড়ে তোলেন ইন্দ্রপাত-চরিত্রে গড়া ত্যোগী যুবকদল। দলের নেতারূপে গড়ে তোলেন নরেন্দ্রনাথকে। নরেন্দ্রনাথকে গড়েতেই যেন তিনি অধিক অতিনিবেশ করেন, বিবিধ বিচিত্র উপায় অবলম্বন করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ই আগস্ট আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মূখে শুনি এক অদ্ভুত ব্রহ্মের উক্তি। তিনি বলেন, “আশ্চর্য সব বর্ণন হয়েছে—অথও সচ্চিদানন্দ-

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ, পৃ: ৫১৩২৫।

৫ ভক্ত গিরিশচন্দ্রের স্বতীকথা হতে।

দর্শন। তার ভিতর দেখছি, যাকে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার, চুনী, আর অনেক সাকারবাদী তত্ত্ব। বেড়ার আর একধারে টকটকে লালহুড়কির কাঁড়ির মতো জ্যোতিঃ—তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র সমাধিস্থ। ধ্যানস্থ দেখে বললাম, ‘ও নরেন্দ্র’। একটু চোখ চাইলে—বুঝলাম ওই একরূপে শিবলোভে কায়েতের খেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, ‘যা ওকে মারার বন্ধ কর, তা না হ’লে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।’ ঐরামকৃষ্ণ জানেন খাটি সোনা দিয়ে ব্যবহারযোগ্য গয়না গড়া যায় না, দরকার সামান্য খাদ। লোকশিক্ষকের বিচিত্র গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন সত্বাধিকার সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ, মুক্তির মধ্যে মারালেশের আবরণ। সেকারণেই ঐরামকৃষ্ণ সাধারণের দুর্বোধ্য উপযুক্ত প্রার্থনা জানাচ্ছেন। প্রধানতঃ নরেন্দ্রকে অবলম্বন করেই তিনি ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ-প্রচারবস্ত্রের প্রসারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ বাইবেলের ভাষায় বলেছেন, He was the rock upon which the structure was to be built. বিবেকানন্দকে মধ্যমণি করেই রামকৃষ্ণভাবদর্শের প্রসার।

শুষ্কস্ব আধারের কয়েকজন শিকিত যুবক রামকৃষ্ণ-মধুতে আকৃষ্ট হয়ে-ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্ততম। প্রথম সন্ধ্যা হতেই নরেন্দ্রনাথ মুক্তি-বাদের কট্টপাথরে ও স্বাভাব্যবোধের মননালোকে ঐরামকৃষ্ণকে, তাঁর বাণী ও আচরণকে বাচাই করতে থাকেন। ঐরামকৃষ্ণকে পুরোপুরি বুঝতে পারেন না, বুদ্ধির স্ফুর্জিতস্বয়ং বিবেচনায়ও রসগ্রহণ বেন করতে পারেন না, কিন্তু প্রথমক্ষেপ হতেই প্রাণে প্রাণে অহুতব করেন রামকৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণ। তীব্র, গভীর ও ব্যাপক সে আকর্ষণ। কখনও কখনও ঐরামকৃষ্ণকে উদ্গাদবৎ বোধ হলেও তিনি বুঝেছিলেন, ঐরামকৃষ্ণের মত পবিত্র ত্যাগী ঈশ্বরসমর্পিত জীবন জগতে দুর্লভ। সংসারে দোকানদারির পটভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ বখার্বাই বলেছিলেন, “একা তিনিই (ঐরামকৃষ্ণ) ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অন্তসকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার তানমাত্র করিয়া থাকে।” ঐরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর সামগ্রিক ধারণা প্রকাশ করেছিলেন একটি শব্দে LOVE; তাঁকে বলেছিলেন ‘প্রেমশাখার’। ঐরামকৃষ্ণের নিকট নবাগত শরণ ও শশীকে বলেছিলেন গানের মাধ্যমে, ‘প্রেমধন বিলাস গোরা রায়। প্রেম কলসে কলসে চলে তবু না কুরায়।’ তিনি বুঝিয়ে বলেন, ‘সত্য সত্যই বিলাইতেছেন। প্রেম বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায়’

বাহাকে বাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহা বিলাইতেছেন। কি অকুতশক্তি।” সত্যিই অকুত বিচিত্র শক্তিতে তিনি নরেন্দ্রনাথকে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন, তাঁর ভাবজগৎকে গ্রাস করেছিলেন। নরেন্দ্র খুলে বলেন তাঁর গোপন অভিজ্ঞতা, “রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানার ভইরা আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হামির করাইলেন—শরীরের ভিতর বেটা আছে, সেইটাকে ; পরে কত কথা, কত উপদেশের পর পুনরায় কিরিতে দিলেন। সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন।”^৬

নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট বোধ করলেও তাঁর সব মত পথকে মেনে নিতে পারেন না। পাশ্চাত্য-শিক্ষার সংস্কার, সাধারণ বুদ্ধি বিচারের অভিমান বাধা সৃষ্টি করে। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে বাচাই করতে চান, শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে উৎসাহিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলতেন, ‘আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে’, নরেন্দ্র উত্তর করতেন, ‘হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলব না’। শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হন। তিনি বিচার ও মননশীলতার পথ ধরে নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে চলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যাকালভূতির মাপকাঠিতে সবকিছু গ্রহণ করতে উপদেশ দিতেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলতেন, “আমি বলছি বলেই কিছু মেনে নিবি না, নিজের সব বাচাই করে নিবি। মানলে বা না মানলেই তো আর বস্তুরাত হবে না, কিন্তু সাক্ষাৎ অল্পভূতি করলে তবে হবে”।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন বিচার-তর্কের দৌড় সীমিত। ‘নৈবা তর্কেন মতিরাপনো’। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে বলেন, “বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায় ; শুধু মুখে বললে হবে না, এই আমি দেখছি, তিনিই সব হয়েছেন। তাঁর কৃপার চৈতন্তলাভ করা চাই।...চৈতন্তলাভ করলে তবে চৈতন্তকে জানতে পারা যায়।...দেখছি বিচার করে একরকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে একরকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি...তাঁর মাহুঘলীলা দেখিয়ে দেন—তাহলে আর বিচার করতে হয় না।” শ্রীরামকৃষ্ণ করুণাপূর্বক নিজেকে ধরা দেন, আত্ম-প্রকাশ করেন, অভয় দান করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ। শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বির ধীর গভীর কণ্ঠে বলছেন, “এখানে বাহিরের লোক কেউ নাই ; তোমাদের একটা গুহ্য কথা বলছি। সেদিন দেখলাম,

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রন্থ, পৃঃ ৫।১৬৪-৬৫

আবার ভিতর থেকে সজ্জিবানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, ‘আমিই যুগে যুগে অবতার।’ দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব; তবে সন্তোষের ঐশ্বর্য।”^১ জগন্নাথের জমিদারীতে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য, ত্রিভাঙ্গীভিত্তি বাহুবল যথো লোককল্যাণ সংসাধনের জন্য, বাহুবলকে বানহঁস করার জন্য ঐশ্বর্য জীরাযকরূপে অবতীর্ণ। বাহুবল বেশে বাহুবল মাঝে তাঁর বিচিত্র লীলাবিলাস। ‘সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈনিক স্বরূপ যীর জীবনে নিহিত করিয়া’ সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁর সাধন এবং সাধ্যসাধনের বিলাস।

তাত্ত্বিক বিচারে বিবেকানন্দ জীরাযকরূপের প্রতিরূপ, রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের একটি চিন্নর বিগ্রহ বৈ তো নয়। ভাবাবিষ্ট জীরাযকৃষ্ণ একদিন নরেন্দ্রের গা বেঁধে বসে, নিজের ও নরেন্দ্রের শরীর পরপর দেখিয়ে বলেন, “দেখছি কি—এটা আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলছি,—কিছুই তকাত বৃকতে পারচি না। যেমন গন্ধার জলে একটা লাঠি কেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিছু ভাগাতাগি নেই, এটাই রয়েছে!—বৃকতে পাচ্ছ? তা বা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?”^৮ অহুতবের বিবর কথার প্রকাশ করেই কান্ড হন না। তাঁর আচার ব্যবহারে প্রকটিত হয় সেই অতেন্দ্রিয়হুত। ঠাকুর জীরাযকৃষ্ণ তামাকের কলকে হাতে ধরেন, সে-হাতেই তিনি নরেন্দ্রকে তামাক খেতে বাধ্য করেন, আবার নিজেও সে-হাতেই তামাক খান। লঙ্কুচিত সন্তোষ নরেন্দ্রকে আশঙ্ক করে তিনি বলেন, “তোর তো ভারী হীন-বুদ্ধি,—হুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।” পরিবেশ ও কালভেদে একই সত্তার যেন বৈতপ্রকাশ। আবার একদিন জীরাযকৃষ্ণ হুস্পষ্টভাবে উক্তবের বলেন, “আমি নরেনকে আমার আত্মার স্বরূপ জান করি।”^৯ জীরাযকৃষ্ণের চেতনালোকে নরেন্দ্র ও তিনি অভিন্ন, নরেন্দ্র তাঁর স্বরূপ সত্তা, নরেন্দ্র তাঁরই অভিন্নের একটি প্রমাণ রাজ।

ব্যবহারিকজ্ঞানে নরেন্দ্রনাথ জানেন জীরাযকৃষ্ণ প্রকৃ, তিনি জীরাযকৃষ্ণের দাস। জীরাযকৃষ্ণ ‘জুজ্জিত যুগ-ঐশ্বর্য,’ নরেন্দ্র ‘দাস তব জনমে জনমে’। জীরাযকৃষ্ণ অনন্তবীর্ষ ঐশ্বর্য, তাঁর ইচ্ছামাত্রে ধূলিকণা হতে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ

১ কথাসূত্র ৫। পরি ১০

৮ জীজীরাযকৃষ্ণলীলাপ্রমদ। পৃ: ৫১২৪৮

৯ কথাসূত্র ৫।১৩১২

সৃষ্টি হতে পারে। নরেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে। সমর্পিত নরেন্দ্রনাথ হতে শ্রীরামকৃষ্ণ সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত কুশলী শিল্পী। জীবন-শিল্পসৃষ্টিতে একটিই হয়েছিল তাঁর প্রকৃত মূল্যবান। তাঁর কলাকৌশলে মুগ্ধ বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “এই যে পাগলাগামুন লোকের মনুলোকে কাহার ডালের মত হাত দিয়ে ভাঙত, পিটুত, গড়ত, স্পর্শমাজেই নতন হাঁচ কেলে নতনভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়ি আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি না।” বিচিত্র স্বপ্নের তাঁর সৃষ্টিকৃতির তালিকা। তিনি মেঘপালক রাধুতুরায় হতে গড়েছিলেন ব্রজর অমৃতানন্দ, মাতাল নট গিরিশ হতে সৃষ্টি করেছিলেন ভৈরবভক্ত গিরিশচন্দ্র দত্তবাড়ীর ছেলে বিলে হতে সৃষ্টি করেছিলেন যুগনায়ক বিবেকানন্দ, রসিক মেধর হতে জীবমুক্ত হরিতরু, রক্ষপিন্নাসী ঝড়ানী হতে তেজস্বী গৌরদাসী।

নরেন্দ্রনাথ হতে বিবেকানন্দের বিবর্তন জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মহান কীর্তি। শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যস্বপ্নের সৃষ্টি বিবেকানন্দ। কোবিদ জ্ঞানদাস কবি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ কাব্য জ্ঞানপ্রমে স্তম্ভিত-বিস্তার বিবেকানন্দ-সাধনা। ভক্তের দৃষ্টিতে বিশ্বনাথপুত্র হতে বিবেকানন্দ সৃষ্টিও অবতার-পুরুষের লীলাখেলা। বিবেকানন্দ তাঁর লীলাবিলাসের একটি ঐশ্বর্যমাত্র। প্রত্যেক সৃজনকর্মের দ্বারা বিবেকানন্দ-সৃষ্টিতে বেদনার ব্যঙ্গনা থাকলেও সামগ্রিকভাবে এক আনন্দঘন জোতনাই বিবেকানন্দসৃষ্টির মুহূর্তকে মাধুর্যমণ্ডিত করে রেখেছিল।

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে চুহাতেই মূঠোর মধ্যে ধরে বিবেকানন্দ-সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ হতে বিবেকানন্দ-বিবর্তনে অত্যন্ত বিষয়ের চাইতে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনই বোধকরি বেশী চাঞ্চল্যকর। সাধনভজন ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটতে থাকে এবং ঘটতে থাকে ক্রতগতিতে হুমমছন্দে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে বলেন, “নরেন্দ্রকে দেখছ না?—সব মনটি ওর আমারই উপর আসছে।” ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্র রামকৃষ্ণের হয়ে ওঠেন—রামকৃষ্ণহতে তিনি একেবারে ‘ডাইলুট’ হয়ে যান। যে নরেন্দ্রনাথ প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা বলে অগ্রাহ্য করতেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাভণে মাকালীকে সত্য বলে গ্রহণ করেন, অগ্নাতার রূপালভ করে তিনি ধর্ম

হন। নরেন্দ্র শেখরপর্বত মা-কালীকে যেনেছে জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আঁহ্লাড়ে আঁটখানা হন। উৎকল শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “নরেন্দ্র কালী যেনেছে, বেশ হয়েছে, না?” পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ স্বীকার করেছিলেন, “রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে (মা-কালীর) আমাকে উৎসর্গ করে দিলেন। কৃত্রিমপিতৃকাজে তিনি আমাকে চালিত করেন।...তিনি আমাকে নিয়ে বান বা-ইচ্ছে-তাই করান।”১০

গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী বড়লোকের ঘরে পুত্র নরেন্দ্রকে যিয়ে দেবার জন্য মতলব আঁটেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাহাকার করে ওঠেন। তিনি মা কালীর পা ধরে কঁদে প্রার্থনা করেন, “মা ওসব ঘুরিয়ে দেখা, নরেন্দ্র যেন ডুবে না।” পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলে সাংসারিক বিপর্ষয় নরেন্দ্রনাথকে পয়ছন্দ করে ফেলে। অভাব-অনটনের মধ্যে চাকুরীর সন্ধানে ব্যর্থভাবে ঘুরে বেড়ান নরেন্দ্রনাথ। একদিন উপবাস পরিশ্রমে ক্লান্ত নরেন্দ্রনাথ একটি বাড়ীর রকে ঘুমিয়ে পড়েন। মনের পুঞ্জীভূত সন্দেহ সহসা দূর হয়। ‘শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর জ্ঞানপরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য’ ইত্যাদি বিষয়ের দ্বির মীমাংসা উপলব্ধি করেন তিনি। মন অমিত বল ও শক্তিতে পূর্ণ হয়। সংসার-বৈরাগ্য গভীরতর হয়ে ওঠে, ব্রহ্মচর্য-অবলম্বনে ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা অবলম্বন হয়ে ওঠে। তাঁর প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুস্তকপাঠ ও বিচার-মননের সাহায্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে জীবব্রহ্মৈক্য ভাবনা সিকন করতে থাকেন। পাশ্চাত্যদর্শনের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা যে গভী হুটি করেছিল তিনি তা অতিক্রম করেন; ক্রমেই তাঁর ধ্যান-ধারণা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তিনি অদ্বৈততত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ অহুতব করেন।

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণলীলার আসর জমজম করছিল। ১৮০৫ সালে চৈত্র-বৈশাখ। প্রসন্ন সুনীল আকাশে প্রশান্তির দীপ্তি। অকস্মাৎ আকাশের এক কোণে দেখা দেয় কালবৈশাখীর দুর্ধোগমেঘ। বজ্রবিছ্যতে গর্জনে সকলে সচকিত হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণলীলার আসরের প্রধান গায়নের কণ্ঠরোগ ধরা পড়েছে, প্রাণঘাতী রোহিণী রোগ। রোগের উপলগ্নগুলি বতই প্রকট হতে থাকে, ভক্তগণ ততই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ষাট এই অসাধ্য ব্যাধি তিনিও সাময়িকভাবে ভক্তগণের দুশ্চিন্তার সার যেন,

১০ শঙ্করীপ্রসাদ বসু : নিবেদিতা লোকমাতা, পৃ: ৩৩৪

কিন্তু তিনি থাকেন সমানস্বয়, আনন্দগভীর। সংসারী বাহুবের সঙ্গে
হলানন্দ কৰ্ণে ধারণ করে তিনি হলেন নীলকণ্ঠ, এদিকে সংসারী বাহুবকে
সংসারের জালা হতে আরাম দেওয়ার জন্ত তিনি হলেন অবরোগবৈদ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের কৰ্ণরোগের চিকিৎসার জন্ত তাঁকে ভাৰপুত্রে আনা
হয়, এবং পরে কান্দিপুরের এক বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা
হয়। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হাকিজকেল, বৈদ্য, ইত্যাদি
চিকিৎসা, ঝাড়কুক-তাবিজ-মানৗ-হত্যা ইত্যাদি বিশ্বাসবিধির সকল
প্রচেষ্টার বিফলতার মধ্য দিয়ে দিন দ্রুত গড়িয়ে চলে। শ্রীরামকৃষ্ণের
স্বঠাৎ দেহ জীর্ণ হয়ে বিছানার মিশে যায়। কিরকৰ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের
কৰ্ণের প্রায় তরু। লীলাকনে রোশনচোকিতে বাজতে থাকে পূরবীরাগিণী।

‘অবতারপুত্রে’র ব্যাধি শুনে হজুগে লোক সবে পরে, গৃহীতকৈরা সেবা-
শুশ্রূষার সংগঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, সেই অবসরে লীলানাথ তাঁর কর্মীদল
বাছাই করে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা সংগঠিত করে তোলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ
নিজ সাধা অহুযায়ী তাঁর সাধনক্রম দেখিয়ে দেন। কান্দিপুর বাগানে
সাধকদের জীবন সম্বন্ধে পুঁথিকার লিখেন, “প্রাণে শ্রাণে সাধামাধি ভাব
পরম্পরে। প্রত্যেকেই ঠাই ঠাই তপধ্যান করে”। এই সাধকদলের অগ্রণী
নরেন্দ্রনাথ। বাড়ীতে গিয়ে আইন পরীক্ষার জন্ত তৈরী হবেন’ স্থির
করেছিলেন। তাঁর বুক আটুপাটু করতে থাকে। সব ছুঁড়ে কেলে রাস্তা
দিয়ে ছুট দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন। সেদিন ছিল ষষ্ঠী
জাহ্নবীরী, ১৮৮৬।১১ ঈশ্বরলাভের জন্ত ব্যাকুলতা তাঁকে হস্তে কুকুরের মতো
করে তুলেছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে নিবেদন করেন, “আমার ইচ্ছা,
অমনি তিনচারদিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব। কখনও কখনও একবার খেতে
উঠবো”। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হতে পারেন না। তাঁর নয়নের মণি নরেন্দ্র-
নাথের লক্ষ্য আরও উচু হবে, মহান হবে। তিনি বলেন, “তুই তো বড়
হীনবুদ্ধি। এ অবস্থার উচু অবস্থা আছে”। আবার একদিন। নরেন্দ্রনাথ
শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসলেন নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্ত। নরেন্দ্রের
তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তিনি শুকদেবের মত পাঁচ ছয় দিন ক্রমাগতঃ সমাধিতে ডুবে
থাকবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তেজিতকণ্ঠে তিরস্কার করে বলেন, “ছি ছি! তুই
এতখড় আধার, তোর মুখে এই কথা। আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই

একটা বিশাল ঘটনা ছেঁড় বতো হবি, তোর ছায়ার ছায়ার ছায়ার লোক
 আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা নিশ্চয় মুক্তি চান। এতো অতি তুচ্ছ
 হীন কথা! নারে, অত ছোট নম্র করিস না।" নবালোক বুদ্ধির অগতে নতন
 দ্বিগন্তের সৃষ্টি করে। ক্রমে পরিষ্কার হয় তাঁর বিশ্বাস; নিশ্চিত ধারণা হয়,
 অগভিতার তাঁর জীবন ও সাধন। যে নরেন্দ্র একদিন আত্মবুদ্ধির স্বস্তি উবেল
 হয়েছিলেন, তিনিই বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে,
 বতদিন দেশের একটা কুসুর পর্যন্ত অহুত থাকবে ততদিন তিনি মুক্তি চান না।

আধ্যাত্মিক সাধনভঞ্জে কান্দিপুরের দিনগুলি ভ্রমভ্রমট। নরেন্দ্রনাথ
 সর্বত্র পণ করে সাধনে যেতে উঠেন। সাধনকুটীরের দেয়ালে লেখা "ইহাসনে
 শুভতু মে শরীরম্..." সাধকদের দৃঢ়স্বরূপকে স্থাপিত করে তুলে ধরে। ত্যাপ
 বৈরাগ্যের হোমোনিতে ক্ষুদ্র আশ্রয়ের পত্রপত্র ছাই হয়ে যায়। অজ্ঞান-
 প্রহেলিকার ঘনকুয়াসা পাতলা হতে থাকে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর
 অজিত দুর্গত (অপরিষাদি) বিহুতিসকল নরেন্দ্রনাথকে দান করতে উত্তত
 হন, নরেন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আগে ঈশ্বরলাভ হোক, পরে
 ঐগুলি গ্রহণ করা না করা সবকিছু স্থির করা যাবে।" শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী
 হন। দক্ষিণেশ্বরের বেলতলার, কান্দিপুর বাগানে ধুনির পাশে, বোধগয়াতে
 বোধিক্ষয়তলে নরেন্দ্রনাথের অহুসন্ধান ও অধ্যয়ন চলতে থাকে। ধ্যান
 করতে করতে নরেন্দ্রনাথ ললাটের স্বভাস্তরে দেখতে পান একটা ত্রিকোণাকার
 জ্যোতি। ঠাকুর বলেন, ব্রহ্মজ্যোতি। অসংখ্য ধুনির পাশে নরেন্দ্র দেখতে
 পান বহু দেবদেবী। বোধগয়াতে উপলব্ধি করেন বৃদ্ধের উপস্থিতি, তাঁর
 অগাধ প্রেমস্বীতি।

এদিকে তীর্থযাত্রা শেষ করে ফিরেছিলেন বুড়োগোপাল। ৮ই ফাল্গুন
 রাত্রিবেলা তিনি কান্দিপুর বাগানবাড়ীতে একটা ভাঙার ঘন। গঙ্গাসাপর-
 যাত্রী সাধুদের গেকরা কাপড় ও কড়াকের মালা দিবেন সঙ্গ করেন।
 শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকে বলেন, 'মাঝার-এই যুবক সেবকেরা হাজারি সাধু,
 প্রত্যেকে হাজার সাধুর সমান। এদের মতো সাধু কোথায় পাবে তুমি?'
 বুড়োগোপাল ঠাকুর রামকৃষ্ণের হাত দিয়ে "নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন,
 বাবুরাম, শশী, শরৎ, কালী, যোগীন, লাটু, তারককে গেকরাবস্ত্র ও কড়াকের
 মালা দান করেন এবং নিজে গ্রহণ করেন। সেদিন হতে কান্দিপুরের
 ভাণ্ডারের বাগানবাড়ীতে গৈরিকবস্ত্রই ব্যবহার করতে থাকেন।

ইতিপূর্বেই নরেন্দ্রনাথ 'রামমন্ডে' দীক্ষিত হয়েছিলেন। কয়েকদিন নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলে রামমন্ডের সাধন। ১৬ই জানুয়ারী গভীররাত্রে নরেন্দ্রনাথ ভাবের ঘোরে 'রাম' নাম তারবরে উচ্চারণ করে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বসতবাটীর চতুর্দিকে বাই বাই করে ঘুরেছিলেন। সকলে তাঁকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে বান রামকৃষ্ণের কাছে। ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করেন। এই সময়ে একদিন রামচন্দ্রের তপস্বীবেশ দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করে নরেন্দ্রনাথ নিজেকে ধন্য মনে করেন।

তখনকার কালীপুর বাগানবাড়ীতে প্রতিটি দিন ঘটনার বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ। বুধবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৬। সকালবেলা। নরেন্দ্রনাথ রামাইত সাধুদের বেণে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে নিরঞ্জন ও গোপাল। তিতরে বাইরে গৈরিকের দীপ্তি। 'ত্যাগীর বাদশাহ' নরেন্দ্রনাথকে গৈরিকবসনে দেখে ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল। স্বগায়ক নরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর হতে উৎসারিত হয় বৈরাগ্যরাস্তা ভাবস্রোত। নরেন্দ্রনাথ গান করেন,

'প্রভু ময় গোলাম, ময় গোলাম, ময় গোলাম তেরা।

তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা।'

স্বরের যুছ'নার ভাবের জোতনার উপস্থিত সকলে মুগ্ধ। শ্রোতাদের অনেকের চক্ষে ভাবাশ্র। প্রেমাকিগভীর শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে প্রেমশ্রবিন্দু। মধুময় সেই স্বগীয় দ্রুত।

শুক্রবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৮৮৬। মাষ্টারমশাই কালীপুর বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন। দেখেন, প্রাঙ্গণে গাছতলায় একটি খোট আসর বসেছে। নরেন্দ্রনাথ ও নিরঞ্জন। দুজনেই গৈরিকভূষিত। কাছেই বসে আছেন তরু কালীপদ ঘোষ, পুরানো ব্রাহ্মভক্ত মণি মল্লিক ও তাঁর ভাই। নরেন্দ্রনাথ মধুর কণ্ঠে গান ধরেন,

"স্বপ্নদ্বীপী হরি বলে করে। বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।..."

এরপরে নরেন্দ্রের অহরোধে মাষ্টারমশাই নরেন্দ্রের সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে

গান ধরেন,

"দ্বাদের হরি বলতে নরেন্দ্র বলে, নদীরায় তারা দুজাই এসেছে রে।..."

নরেন্দ্রের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলেন, "এই ভাষা নরেন্দ্র আগে কিছু জানত না, কিন্তু এখন 'রাখে রাখে' বলে কাঁদে ও কীতনে নৃত্য করে।" এসময়কার একদিনের ঘটনা, লিখেছেন

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, “...তাহাকে (নরেন্দ্রকে) প্রেমধনে ধনী করিবার বাসনার (ঠাকুর) শয্যাপরি অঙ্কুরি দিয়ে যেমন লিখিলেন, ‘শ্রীমতী রাধে, নরেন্দ্রকে দয়া কর’। এমনিই যেন কোন মহাপুত্রের প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথ রাধাভাবে বিভোর হইলেন এবং ‘কোথায় ওমা প্রেমময়ী রাণী’ বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ দিবসত্রয় ভ্রমের পর শুক দার্শনিক সরস হইয়া কহেন, প্রকুর কুপায় আজ এক নূতন আলোক পাইলাম।”

নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গভীর বোধশক্তি। একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব ধর্মপ্রসঙ্গ করছিলেন। ‘সর্বজীবে দয়া’ বলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। পরে অধ্বাহদশায় ফিরে তিনি বলতে থাকেন, ‘জীবে দয়া, জীবে দয়া? দূর শালা। কীটামুকীট—তুই জীবে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।’ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে নরেন্দ্রনাথ পান অনাবাদিত আনন্দ ও নূতন আলোক। পরবর্তী-কালে এই স্মৃতি ধরে তিনি বনের বেদান্তকে ধরে এনেছিলেন, আত্মসংস্কারকে এই মহৎ-বাণী শুনিয়ে উদ্ধৃত করেছিলেন।

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলার প্রধান ঐশ্বর্য অনৈশ্বর্য। এই অনৈশ্বর্যের মাধুর্যে তাঁর তত্ত্বগোষ্ঠীর জীবন স্নিগ্ধ লালিত্যপূর্ণ। তত্ত্বদলের প্রধান নরেন্দ্রনাথের শিক্ষাদীক্ষাও চলতে থাকে অনৈশ্বর্যের মধ্য দিয়ে। নরেন্দ্রনাথকে খোঁগা লোকশিক্ষকরূপে গড়ে তোলার জন্য তিনি ব্যগ্র হন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন।...আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্যসত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়।... লোকশিক্ষা হবে তার ‘চাপরাস’ চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্য লোক! কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। হিতে বিপরীত। তগবান লাভ হলে অসুস্থ দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।”^{১২} লোকশিক্ষকের ভূমিকার দায়িত্ব লব্ধে প্রোতাদেশের সচেতন করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন, “প্রকৃত প্রচার কি রকম জান? লোককে না ভজিয়ে আপনি ভজলে বখেটে প্রচার হয়। যে আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করে, সে বখার্ব প্রচার করে। যে আপনি মুক্ত, শত শত লোক কোথা হতে আপনি আপনি এসে তার কাছে

শিকা নয়। ফুল ফুটলে জ্বর আপনি এসে ছোটো।” শ্রীমাক্ষ-
পরিষেবিত পরিষদের মধ্যে তাঁর সংগৃহীত পুস্তকোৎকলি স্বন্দরভাবে
প্রস্তুত হতে উত্তোষী হয়। এদিকে শ্রীমাক্ষ স্থির করেন, একটি
আহুষ্ঠানিক বোষণার মধ্য দিয়ে অগম্যতা-নির্বাচিত লোকশিক্ষকে
সকলের সামনে তুলে ধরবেন। তাঁকে লোকশিক্ষার চাপরাস নিজে হাতেই
লিখে দিবেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা।
শ্রীমাক্ষের গলরোগের ব্যথা চরমে উঠেছে। গলার ভিতরের কত
বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, রক্তপূর্ণ করছে। গলার বাধা হয়েছে গীর্দাণাতার
পুলটিল। দেহব্যথা অগ্রাহ করে লোকোত্তরপুরুষ লোকসংগ্রহের কাজ নিয়ে
ব্যস্ত থাকেন। তাঁর লোককল্যাণের কর্মসূচী অব্যাহত থাকে, অথবা
বেড়েই চলে। তিনি বলতেন, “আমি কোনো জায়গার আবদ্ধ নই। সব
গেছে, কেবল এক দয়া আছে।...যদি সহস্রবার জয়গ্রহণ করেও একজনের
উদ্ধার সাধন করতে পারি তাও সার্থক বোধ করি।” সন্ধ্যাবেলা তিনি
এক টুকরো কাগজ চেয়ে নেন। তাতে নিবিষ্ট মনে লেখেন, “জয় রাখে।
প্রেমময়ী! নরেন সিকে দিবে, যখন যবে বাহিরে হাঁক দিবে, জয় রাখে।”
প্রকৃতপক্ষে তিনি লিখেছিলেন,

“জয় রাখে পৃথিবী নরেন সিকে দিবে

অখন যুরেবাহিরে

হাঁক দিবে

জয় রাখে।”

লীলাবিলাসের নিজস্ব সংবাদদাতা “শ্রীম” অল্পশ্রিত ছিলেন। লীলাপতি
শ্রীমাক্ষের আদেশে তিনি গিয়েছিলেন কামারপুত্র দর্শনে। নবযুগের
তীর্থ কামারপুত্র। তীর্থধামের আনন্দমধু সংগ্রহ করে শ্রীম কামারপুত্র
বাগানবাড়ীতে কিয়েছিলেন সেদিনই রাত্রি প্রায় এগারটার। তিনি
শ্রীমাক্ষকে তাঁর তীর্থ দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ নিবেদন করেন। প্রমাণ
করে শ্রীমাক্ষ অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

“শ্রীম” বাগানবাড়ীর নীচতলার দানাদার ঘরে এসে শোনেন লীলা-
পতির বিচিত্র কীর্তি। স্বচক্ষে দেখেন তাঁর হাতে-লেখা হকুমনামা। বিখ্যিত
পুলকিত শ্রীম তাঁর ডায়েরীতে তাঁর স্বহস্ত নকল করে রাখেন। তিনি

মস্তব্য লেখেন “প’স হাতের লেখা ও ছবি (কাগজে)” “I take it without leave as something too valuable to be lost.” তাঁর ডায়েরীর পাতার পুরানো ও নতুন ক্রমসংখ্যা বথাক্রমে ৩৬৫ ও ১১৫।

উপরন্তু স্বভাবশিষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ হকুমনামা লিখে তারই নীচে একেছেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ছবি। ভাবব্যঞ্জনাময় একটি রেখাচিত্র। বামদিকে অবশ্য একটি নৃমূর্তি। টানা চোখ; পুরু ক্র। মাথার গড়ন সাধারণ মাহুকের মাথার চাইতে বড়। দৃষ্টি লম্বুখে স্থির। তার পিছনে মাথা উঁচিয়ে সাগ্রহে চলেছে একটি শিখী। যেন নরেন্দ্রনাথের পিছনে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নববোধিত লোকশিক্ষকের পিছনে জগৎপতি।

সংবাদদাতা ‘শ্রীম’ আরও জানতে পারেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের চাপরাস পেয়ে ভেক্সীয়ান নরেন্দ্র বিজোহ করেছিলেন, “আমি ওসব পারব না।” শ্রীরামকৃষ্ণ মুচকি হেসে বলেছিলেন, “তোমার ছাড় করবে”। এ-প্রসঙ্গে স্বরণ করা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের ছুটো উক্তি। তিনি নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, “মা তোকে তাঁর কার্য করিবার জন্ত সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন”। “আমার পশ্চাতে তোকে কিরিতেই হইবে, তুই বাইবি কোথায়?”

নরেন্দ্রনাথের জন্ত লোকশিক্ষার ‘চাপরাস’ লিখে দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ কান্ত হন না। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে লোকশিক্ষার শক্তি ও সামর্থ্য বাড়ানোর জন্ত সর্ববিধ ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি হতে শুরু করে লোকব্যবহার পর্যন্ত তিনি সকল বিষয়েই শিক্ষা দেন। এদিকে নরেন্দ্রের মধ্যে প্রত্যক্ষানুভূতির জন্ত আটুপাটু ভাব বেড়েই চলেছিল। সেদিন শনিবার, ২০শে মার্চ, দোলষাত্রা। ভক্তির ফাগ কাশীপুর উঠান-বাটিকে করে তুলেছে মধুবন্দাবন। সেদিনই একসময়ে লীলাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সাধনা দিয়ে বলেন, “তুই যেজন্ত কাঁদছিল, তোকে তাই দেবো। কিন্তু তুই আমার জন্ত খাট। তোমার জন্ত আমি এতদিন দুঃখ করলুম, তুই এদের জন্ত একটু দুঃখ কর। আমি বোলো আনা খেটেছি; তুই এক আনা খাট—তোকে গহি করে দেবো।”^{১৩}

নির্বাচিত নরেন্দ্রকে সর্বজনস্বাক্ষর করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্ত

১৩ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : শ্রীশ্রীলাট্ট মহারাজের স্মৃতিকথা,
পৃঃ ২৫২

শ্রীরাধকৃষ্ণের কতই না আকৃতি। শ্রীরাধকৃষ্ণের সখের শিল্পচর্চার মধ্যেও
 ঘটেছে তার বিচ্ছুরণ। এই এপ্রিল, শিল্পী শ্রীরাধকৃষ্ণ এঁকেছেন একটি
 চিত্রপট। একখণ্ড কাগজে ঝাঁক রেখাচিত্র। বিকাল পাঁচটা নাগাদ
 শনীঠাকুর কাগজটি এনে উপহার দেন দানাদের ঘরে উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ,
 কালীপ্রসাদ ও “শ্রীম”কে। মনে রাখতে হবে এর পূর্বদিনেই নরেন্দ্রনাথ,
 কালীপ্রসাদ ও তারক বুদ্ধগয়া হতে ফিরেছেন। তাঁরা বিফারিত নয়নে
 দেখেন, কাগজের একপিঠে লেখা রয়েছে, “নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও”। তারই
 নীচে শ্রীরাধকৃষ্ণ এঁকেছেন একটি বাঘ ও একটি ঘোড়া। কাগজের উল্টো-
 পিঠে এঁকেছেন একটি নারীর মাথা, তার মাথার বড় একটি খোঁপা। শিল্পীর
 খেয়ালিপনা, ও শিল্পনিপুণতা দর্শকদের মুগ্ধ করে, নরেন্দ্রের জন্ত তাঁর আকৃতি
 সকলকে বিস্মিত করে।

নরেন্দ্রনাথের সাধন-ভজনের তীব্রতা বেড়েই চলে, তাঁর বৈরাগ্যবিধুর
 মনের ব্যাকুলতা সর্বত্রানী হয়ে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি চিরবাহিত
 নির্বিকল্প-সমাধিতে আরুঢ় হন। নরেন্দ্রনাথের সাধন-ভজনের ইতিহাস
 সার্ভে করে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, “আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত
 নির্ধারিত টাকা জমা দিতে বাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্তোদয় হইল
 ...এবং উন্নতির মত নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্বক তাঁহার কৃপা লাভ
 করিলেন, আহা! ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময়ে দ্বিবারাত্র
 ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরসঙ্গী কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন...কেমন করিয়া
 শ্রীগুরু-প্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর
 দর্শন লাভ করিতে করিতে তিনচারি মাসেই নির্বিকল্পসমাধিস্থ প্রথম অল্পভব
 করিয়া ছিলেন—ঐসকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া
 আমাদেরিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিল।” সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসের শেষাংশের
 ঘটনা। এই নির্বিকল্প-সমাধির স্বপ্নস্বপ্ন চরন করে স্বামীজী পরবর্তীকালে
 বলেছিলেন, “সেদিন দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে
 গিয়েছিলুম, আর কি! একটু ‘অহং’ ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরে-
 ছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই ‘আমি’ আর ‘ব্রহ্মের’ ভেদ চলে যায়—সব
 এক হয়ে যায়—যেন মহাসমুদ্র—জল, জল, আর কিছুই নেই। তাব আর

ভাষা সর্ব কুরিয়ে যায়।” ১৪ হোতলায় ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণের নিকট খবর শৌছায়। তিনি নির্বিকার চিত্তে মন্তব্য করেন, “বেশ হয়েছে, থাক ঋনিকৃষ্ণ ঐরকম হয়ে। ওরই জন্ত যে আমার জালাতন করে তুলেছিল।” সেবক কালীপ্রসাদের অবানীতে জানা যায়, সমাধি-বুখিত নরেন্দ্রনাথ হোতলায় ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণের নিকট গিয়ে আবদার করেন, “আপনি আমাকে সেই আনন্দসাগরে যাতে সর্বদা থাকতে পারি দয়া করে তাই করে দিন”। ঈবৎ হেসে ঐরামকৃষ্ণ বলেন, “এখন না, পরে হবে।” ব্যগ্র নরেন্দ্রনাথ জিদ করেন, বলেন, “আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, সর্বদাই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থার থাকতে ইচ্ছা হয়।” ঐরামকৃষ্ণ বলেন, “সে ঘরের চাবি আমার হাতে। তুই এখন আমার কাজ কর, পরে সময় হলে আমি চাবি খুলে দেব। নইলে তুই তোর স্বরূপ জানতে পারলে এই শরীরটা খুঁ করে ফেলে দিবি।” নরেন্দ্রনাথ ঐরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে নীচে চলে যান। ১৫

নির্বিকল্প-সমাধিস্থতের আশ্বাদ পাইয়ে দিয়ে লীলাপতি ঐরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের নৌকশিক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় বাকী সকল বিষয়ের শিক্ষা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ করে তোলেন। সেবক শরৎ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন, “নরেন্দ্রনাথের জীবন গঠনপূর্বক তাহার উপরে নিজ ভক্তমণ্ডলীর, বিশেষতঃ বালক ভক্ত সকলের ভারপূর্ণ করা এবং তাহারিগকে কিরূপে পরিচালনা করিতে হইবে তাহা নিয়ে শিক্ষা দেওয়া ঠাকুর এইখানে করিয়াছিলেন”। নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পূর্ণ হুন্দর করে তোলেন নিজের হাতে নিজের পরিকল্পনাছায়ায়ী।

‘কালঃ কলয়তামনি’, বলেছেন ঐকৃষ্ণ। মহাকাালের তরলভক্ত ঐরামকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের কেন্দ্রবিন্দু ঐরামকৃষ্ণাবরব লুপ্ত হতে উদ্ভূত। তিন চার দিন মাত্র বাকী। এক শুভমূহুর্তে ঐরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে তাঁর সম্মুখে বসিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। নরেন্দ্রনাথ অলুভব করেন, ঠাকুরের দেহ হতে হৃদয় তেজোরশ্মি তড়িৎকম্পনের মতো তাঁর শরীরের মধ্যে সঁধিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাববিহীন নরেন্দ্রনাথ বাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। চেতনা লাভ করে দেখেন ঐরামকৃষ্ণের চোখে জল, বেদনাঙ্গ। তিনি নরেন্দ্রকে বলেন, “আজ যথাসর্ব্ব তোকে দিয়ে ককির হনুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে

১৫ বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা পৃঃ ১০৬

কিরে বাবি।” তখন, তাৎপর্য অবধারণ করে নরেন্দ্রনাথ ভাবে উবেলিত হন, বালকের মত কাঁদতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধির পূর্বে একরাত্রে নরেন্দ্রনাথকে বলেন, “দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে বাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, বাতে আর ঘরে কিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি”। নরেন্দ্রনাথ মাথা পেতে নেন এই গুরুদায়িত্ব।

এত দেখে-শুনেও নরেন্দ্রের মনের আকাশে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় এক-টুকরো সংশয়মেঘ। রামকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের শেষাঙ্গের একটি দৃষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ চিরকালের পরীক্ষার্থী। নরেন্দ্রের সন্দেহ-লেশ নিঃশেষে দূর করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মোচন করে বলেন, “এখনও তোর জ্ঞান হ’ল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়”। অসুতাপ-জর্জরিত চোখের জলে নরেন্দ্রের সন্দেহের ধূলিবাণি লাক্ হয়ে যায়।

লীলাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ নরনীলা সঞ্চরণ করেন। ইজিরগ্রাহ-অমৃতুতির রাজ্য হতে অন্তর্হিত হয় রামকৃষ্ণবিগ্রহ। গুরুপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইয়েরা। লক্ষ্য করে দেখেন তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণসত্তার বিভিন্ন দিকের অল্পবিস্তর প্রকাশ। মনে পড়ে উপনিষদের বাণী, “একমত্থা সর্বভূতাস্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিস্ক”। সর্বভূতাস্তরাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন বিচিত্র প্রকাশ তাঁর সম্মানগণের মধ্যে।

গুরুনির্দিষ্ট পথ ধরে নরেন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করেন বিবেকানন্দরূপে। লোকশিক্ষারূপে আবির্ভূত স্বামী বিবেকানন্দ বেশে বিদেশে সমব্রাহ্মচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী জগদ্ধিতার, লোকহিতার প্রচার করলেন। তিনি সঙ্গী-সাথীদের সাধর আহ্বান জানিয়ে বললেন, “শোন শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের জন্য এসেছিলেন, আর জগতের জন্য প্রাণটা দিয়ে গেলেন। আরিও প্রাণটা দেবো, তোমাদেরও সকলকে দিতে হবে।” ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে চাপরাস দিয়েছিলেন সে-দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি পালন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিরূপ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর প্রাণসখ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্ভেদ করে তিনি লিখেছিলেন,

‘প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর ।
কতু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি ।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
ভরসে ভোয়ার ভেসে বার নরনারী ॥’^{১৬}

রামকৃষ্ণবাণীর অমূর্তরূপ বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-ভাবতরঙ্গের সর্বগ্রাসী প্রাবল্যে ভাসিয়ে নিয়ে যান জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে । বিবেকানন্দ-জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ন ক’রে গুরুতাই বামী অভেদানন্দজী বলেছিলেন, “Thus he fulfilled to the very letter the prediction of his blessed Master : ‘That when his mission would be finished he would realize his divine nature and would give up his body.’”^{১৭} বিবেকানন্দবিগ্রহ পঞ্চদশে মিশে গেছে, বিমূর্ত্য বিবেকানন্দ স্ববাতর্যে বিদ্যমান ।

রামকৃষ্ণ-ভাবতরঙ্গের চেতনালোকে বিশ্বের দিক-দিগন্তরে জলে উঠেছে শতসহস্র জীবনদীপ, কিন্তু দীর্ঘকালের পৃষ্ঠীভূত অন্ধকার নিঃশেষে দূর করার জন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ জলন্ত জীবনদীপ—সেই দীপসকলকে জালাবার জন্য লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । তিনি নিজমুখে অঙ্গীকার করেছেন, “But I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere, until the world shall know that it is one with God.” ‘চাপরাস’-প্রাপ্ত লোকশিক্ষক বিবেকানন্দের লোকহিতায় কর্ম চলেছে চলবে ।

১৬ বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ খণ্ড । ২৭২-৩

১৭ Complete Works of Swami Abhedananda, Centenary Publication, Vol. V., p. 591

মহাসম্মিলনের পরের তিনদিন

মাহুকের মাঝে ভগবানের লীলাবিলাস শুধুমাত্র ভক্তিমধু-আধাদন ও বিতরণের ক্ষমতা নয়। এখানে মাহুকের শুধুমাত্র তাঁর খেলার দোস্ত নয়, মাহুকের মাঝে ভগবানের অবতরণ ত্রিভূতপীড়িত মাহুকের সাহায্য করার ক্ষমতা। তিনি ব্যথিত মাহুকের পাশে হৃদয়ের মত এসে দাঁড়ান। তিনি হতাশ মাহুকের উদ্ধৃদ্ধ করেন। তিনি অকল্যাণের আক্রমণ প্রতিহত করে কল্যাণের শক্তিকে হৃদয় করেন। তিনি সামাজিক মাহুকের অত্যাচারের ক্ষমতা যুগোপযোগী জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। অবতার তারণ করেন, অবতার যুগসমুদ্বর্তা।

বর্তমান সমস্তায় যুগের দিশারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তাঁর বিচিত্র নরলীলা সাক্ষ করেছিলেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট। তাঁর লীলাবিলাসের প্রতিটি ক্ষণ লোককল্যাণে উৎসর্গীকৃত। তিনি তাঁর দেহ তিলে তিলে বিসর্জন দিয়েছিলেন বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়। তাঁর দেহ নৈসর্গিক নিয়মে ক্যান্সার-রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তাঁর হৃদয় দেহ পূর্ণদস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর লোকহিতকর-কর্মের বিরাম ছিল না। দুর্বল মাহুকের সাহায্য করার ক্ষমতা তিনি সর্বদাই ব্যগ্র ছিলেন। দুর্বল মাহুকের ব্যথার ব্যথী তিনি কল্পনাভ্রমে বলেছিলেন : শরীরটা কিছুদিন থাকতো, লোকদের চৈতন্য হতো...তা রাখবে না।

তাঁর ভাগবতী তম্র অপ্রকট হয়। হাহাকার করে ওঠে তাঁর কৃপাকাজী ও কৃপাধন মাহুকেরা। তাদের অন্তরের বেদনা করে পড়ে অশ্রু হয়ে, আকাশ বাতাসও বেন সমবেদনার কৈদে ওঠে। ভক্তগণ কাতরকণ্ঠে আর্তনাদ করে—

হরি মন মজারে লুকালে কোথায় ?

(আমি) ভবে একা, দাঁওহে দেখা প্রাণসখা রাখ পায় ।

তাঁর পার্শ্বভৌতিক দেহ কান্দিপুরের আশানবাটে ভস্মীভূত হয়, অপকীকৃত হয়। ভক্তগণ তাঁর পুতাসি ও চিত্তান্তর সমস্ত একটি কলসীতে সংগ্রহ করেন। তাঁরা ‘জয় রামকৃষ্ণ’ ধ্বনি দিতে দিতে কলসী নিয়ে আসেন কান্দিপুরের উত্তানবাটিতে।

প্রত্যক্ষদর্শী অভূতানন্দ্রী তাঁর স্মৃতিকথাতে বলেছেন : 'তাঁর (শ্রীরাব-
কৃষ্ণের) অগ্নি আর তন্দ্র একটি কলসীতে পুরে শব্দভাই মাখায় করে বাগানে
এনেছিলো। যে বিছানার তিনি শুতেন সেইখানে কলসীটি রেখে দেওয়া
হোলো।'^১

অপর প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অভেদানন্দ তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন পরবর্তী
ঘটনা : "সেই রাজে আমরা সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে অস্থি রাখিয়া তাঁহার
পবিত্র জীবনী আলোচনা করিতে লাগিলাম এবং ধ্যান-জপে মনোনিবেশ
করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনজনিত দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিলাম। নরেন্দ্র-
নাথ পুরোভাগে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অষ্টৈতুকী বিচিত্র রূপার কথা বলিয়া
আমাদের কখনও কখনও সাহস দিতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা
তখন সকলেই নিজেদের অসহায় বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম। তাহার পর কি
করিব কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলামনা।" আমার জীবনকথা পৃ: ১২২

তখন সেবকদের বেদনাবিধুর মন শ্রান্ত, এবং দেহ পরিভ্রমে ক্লান্ত। তবুও
ক্রমে মনের আবেগ শান্ত হয়ে আসে। প্রশান্ত মনের দর্পণে ভেসে ওঠে
অনিন্দ্য শ্রীরামকৃষ্ণমুখপদ্ম। তাঁর হৃদয়নিঃড়ানো ভালোবাসার মধুর স্মৃতিতে
ক্ষুব্ধ হয় মনের সাময়িক প্রশান্তি। স্মৃতিপট উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তাঁর
প্রাণমাতানো দিব্যবাণীর স্বলকে। রাত্রি অতিবাহিত হয়।

পরের দিন। মঙ্গলবার, ১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

অনেকেরই বোধ হয় মনে পড়ে নরেন্দ্রনাথের একটি উক্তি। তিনি
স্বার্থবর্হী বলেছিলেন : "All this will appear like a dream in our
lives, only its memory will remain with us." (এই সমস্তই আমা-
দিগের জীবনে বেন স্বপ্নের মতো মনে হইবে এবং ইহার স্মৃতি অন্ততঃ আমাদের
মধ্যে থাকিরা যাইবে। স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা পৃ: ৭০

১ শ্রীশ্রীলাট্ট মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃ: ২৬৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-
পুথিকার ও অন্ততম প্রত্যক্ষদর্শী অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন :

কলের পুতুল সম মুখে নাই স্বর।
লইয়া দেহাবশিষ্ট কলসী ভিতর।
সে স্বপ্নের বাগান নাহিক আজি আর।
আঁধারের চেষ্টে অতি নিবিড় আঁধার।
পাখায়ে বাঁধিয়া বুক সন্ন্যাসী গণে।
তুচ্ছাচারে কলসীটি থুইল বতনে। (পৃ: ৬:১)

গৃহী ভক্তদের মনও বেদনার তারাকান্ড। সবয়ে সবয়ে করে পড়ে বেদনার অশ্রুবিন্দু। হৃদাশার কুয়াসা ঘিরে ধরে চারিদিক থেকে। সমাচ্ছন্ন হৃদয়-আকাশে মাঝে মাঝে ঝলকু দেয় স্বতির বিজলি। স্বতি যেন কালজরী।

গৃহী ভক্তদের কয়েকজন উপস্থিত হয়েছেন মুরব্বি রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে মধু রায়ের গনিতে বাড়ী। উপস্থিত মহেন্দ্রনাথ বসুমদার, স্বরেশচন্দ্র মিত্র, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও রামচন্দ্র দত্ত আলোচনা করেন। প্রথম উঠেছে : ‘শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে ভোগ দেওয়া হবে কি না?’ মহেন্দ্রনাথ ওরফে মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, তাঁকে represent করার কাহারও সাধ্য নাই—Christian দেশে (তিনি থাকলে তাদের সঙ্গে কিছুটা মিলতো)।

এই দিনটির বিবরণীর প্রথমেই মাষ্টারমশাই লিখেছেন : Acts of the Apostle, He is in them.

এই ভাবটি পুঁথিকার ছন্দোবদ্ধ পদে প্রকাশ করেছেন :

ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকের খানা।

ঠিক ঠিক ভক্তমাত্রে সকলের জানা।

এক এক ভাবে প্রভু এক এক ঠাই।

ভক্তের সমষ্টিমধ্যে আগোচী গোঁসাই।

* * *

ভাবরূপে ভক্তের হৃদয়মধ্যে খেলা।

ভক্তের করান কর্ম নিজে দিয়া ঠেলা। (পৃঃ ৬৩১)

মাষ্টারমশাই ও দেবেনবাবু সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। কথা বলতে বলতে পথ চলেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হতে বেরিয়েছে বুদ্ধাবন বস্থ লেন। ১১নং বুদ্ধাবন বস্থ লেনে শিবচন্দ্র গুহর কালীমন্দির। ১২৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের স্বতির সঙ্গে অড়িত। সেই কালীমন্দিরে উপস্থিত হয়ে মাষ্টারমশাই মনের খেদ প্রকাশ করেন।

ক্রমে তাঁরা পৌছান বলরাম বস্থর ভবনে। সেখানে ভক্ত গিরিশচন্দ্র উপস্থিত হয়েছেন। দরদী ব্যক্তিদের মধ্যে বোধকরি গিরিশচন্দ্রের স্বতিমেধ চকল হয়ে উঠে। গিরিশচন্দ্র স্বতি-বর্ষণ করে সেই তার লাঘব করেন।

তিনি বলতে থাকেন : এখন বুঝি তাঁর (ঈশ্বরাক্ষের) কত কষ্ট হয়েছিল।

‘এই বাসনা কেন তাঁর disciple বলে কেউ ঘৃণা না করে।’২

‘আমার ওখানের (জন্ত) আর কোন interest নাই—তবে যাঁঠাকুরাণীর জন্ত’—

‘তাঁকে এক দেবতা জানতুম—আর কাউকেই জানি নাই—জানবো না।’৩

বলরামবাবু বলেন : ‘ওরা কি করেন?’

‘দক্ষিণেশ্বরে ঘর নিলেই হতো—দেখনা শেষে শূন্যে দেহত্যাগ।’৪

মাষ্টারমশায় সেখান হতে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে বান। জগন্নাথমন্দিরে বান।

পরবর্তী দৃষ্টে দেখা যায় মাষ্টারমশাই গঙ্গারান করে কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন। নীরব নিমন্ত্রণ কাশীপুর-বাগান। এখানকার খরদোর, রাস্তাঘাট, গাছপালা সবকিছু তাঁর মধুরস্মৃতিতে বিষণ্ণিত। কত শত মধুর ও বেদনা-বিধুর স্মৃতি শরতের ছিন্ন মেঘের মত ভক্তজনের মনের নীল আকাশে ভাসতে থাকে। দোতলার প্রসিদ্ধ হলঘর। ঠাকুর ঈশ্বরাক্ষের ব্যবহৃত শয্যার উপরে রাখা হয়েছে তম্ব ও পূতাঙ্গি পূর্ণ ভাস্কর্য। স্থাপন করা হয়েছে ঈশ্বরাক্ষের একখানি প্রতিকৃতি।৫ ডায়েরীতে মাষ্টারমশাই এই ঘরটিকে লিখেছেন ‘সমাধি-ঘর’।

- ২ কৃপাশাগর ঈশ্বরাক্ষ থিয়েটারের গিরিশচন্দ্র ও অপর কয়েকজনকে আল্প্রদে দিলে কোন কোন উরাসিক ব্যক্তি কটুক্তি করে। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরাক্ষ সযত্নে বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন না। গিরিশচন্দ্রকে জড়িয়ে পাছে কেউ ঈশ্বরাক্ষ সযত্নে কোন নিন্দা করে এই আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে গিরিশচন্দ্রের উত্তির মধ্য।
- ৩ তত্ত্বপ্রবর গিরিশচন্দ্র সাময়িক ভাবোচ্কালে এখানে বা বলেছেন, তার অনেককিছুই পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছিল।
- ৪ ঈশ্বরাক্ষ কাশীপুর বাগানবাড়ীর দোতলার হলঘরে মহাসমাধি লাভ করেছিলেন। সে সযত্নে বলেছেন বলরাম।
- ৫ ঈশ্বরাক্ষের ভোগ-রাস পূজা-সহকারী। আজি হতে আরম্ভ করিল নিয়মিত। শয্যার ঈশ্বরী এক করিয়া স্থাপিত। (পুঁথি, পৃ: ৬৩১)

ইতিমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সে-সময়ে অকুতা-ব্রহ্মা পরবর্তীকালে বলেছিলেন : “পরের দিন গোলাপ মা এসে খবর দিলো—মাকে উনি (ঠাকুর) দেখা দিয়ে হাতের বালা খুলতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন—‘আমি কি কোথাও গেছি গো? এই ত রয়েছি; শুধু এঘর থেকে ওঘরে এসেছি।’ গোলাপ-মার কথা শুনে বারা সব দুঃখ করছিলো তাদের সম্বন্ধে মিটে গেলো। তারা তখন সকলে মিলে বললে—‘সেবা যেমন চলছিলো তেমনি চলবে।’ সেদিনে ত নিরঞ্জনতাই, শশীতাই, বুড়োগোপাল দাদা আর তারকদাদা সেইখানে রইলো। হামনে আর ষোণীনতাই মাঘের কথামত ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করতে কলকাতায় গেলুম। ছপুয়ে সেদিন ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়েছিলো। সবাই মিলে তাঁর ঘরে কীৰ্তন কোরেছিলো।” (শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬৩)

হলধরে বসে বসে শ্রীম সেবক শশীর কাছে শোনেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরভারতী। শশী প্রথমেই বলেন যে একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন : তুই ছেলেদের রাজা (তুই অমন কাজ করবি কেন?)।

সেদিনই শ্রীরামকৃষ্ণ শশীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : কেমন আছিস?

একের পর এক স্মৃতি এসে ভীড় করতে থাকে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শশীকে বলেছিলেন : ওরে বালিস-মাদুর রাখ, তা না হলে watch করতে (দেখতে) আসবে কেন?

আবার একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপ্রসাদকে বলেছিলেন : তুই কি আর আমার সেবা করবি নি? (তুই জ্ঞান-জ্ঞান করিস) আমার কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দে।

শশী বলেন অপর একটি কাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন মুড়ির মধ্যে সামান্য কারণ ছিটিয়ে বলেন : নরেন্দ্র, রাখাল—এই ভোদের শেষ হ’ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সেবক হরিশকে বলেছিলেন : দশটা বেলা এখনও নাস্ নি... স্ত্রামা পাগল হলো, এখানকার নিন্দা হবে।

রোগাক্রান্ত ঠাকুরের সেবার জন্ত হরিশ কান্দীপুর বাগানবাড়ীতে এসে বাস করছিলেন। কয়েকদিন পরে বাড়ীতে ফিরে গেলে তাঁর মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছিল। তিনি আবার স্বস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

লেবক শরীর কাহিনী শেষ হতে না হতেই লেবক হরিশ তাঁর স্বভাব ছুয়ার উন্মোচন করেন। তিনি অগ্ন্যধ্বামে গিয়েছিলেন, সেখানকার তাঁর এক অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার জানিয়ে ছিলেন শ্রীক্ষেত্রে—বুক চিরে নাড়িভুড়ি দেখিয়েছিলেন।^৬

ঠাকুরের মহাসমাধির দিনে হরিশ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলছেন : লক্ষ্মী আমি (চন্ডাম) তুই রইলি।

মাষ্টারমশাই তাঁকে মনে করিয়ে দেন কয়েকটি মূল্যবান পুরানো স্মৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন হরিশের জানীর ভাব। তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাটি চাপা সোনার মত জ্ঞান চাপা থাকে।^৭

এবার লেবক তারকনাথ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের রূপায় উপলব্ধি একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতার কাহিনী। তিনি বলেন : (দেখলাম) কালী অনন্ত শ্রোত—তখন শোক নাই, (দুঃখ নাই)’

মাষ্টারমশাই তারকনাথকে মনে করিয়ে দেন তাঁর একটি ব্যক্তিগত মধুর স্মৃতি। দক্ষিণেশ্বরে কালীঘরের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের ঘোরে তারকনাথের মুখ ধরে চুম্বন করেছিলেন।^৮

৬ হরিশ অগ্ন্যধ্বানির জন্ত পুরী গিয়েছিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রের ধারে ভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। সেইসময়ে তিনি দেখতে পান যে চৌটার গোপীনাথ তাঁকে দর্শন দিয়ে বলছেন : আমি একরূপে পরমহংস হয়ে আছি। (মাষ্টারমশাইয়ের ভাষায়, পৃঃ ৭০৩) কথিত আছে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাগবতী তত্ত্ব চৌটার গোপীনাথ-বিগ্রহে অন্তর্লীন হয়েছিল। লেবক হরিশ এখানে বৃসিংহাবতারের কথা বলছেন।

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথাস্থতের মধ্যে দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : ‘হরিশকে বললুম, আর কিছু নয়, সোনার উপর ঝোড়া কতক মাটি পড়েছে সেই মাটি কেলে দেওয়া।’ (কথাস্থত ৩।১০।২)

৮ ‘ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে স্থানিত হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন।...ঠাকুর তারককে চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।’ (কথাস্থত ৪।৫।১)

নরেন্দ্রনাথ চাইর মূর্তি বিরে গুরেছিলেন। তিনি মাঠারমশাইকে জানান,
তিনি খুশিছিলেন না, মূর্তি বহন ক'রে চলেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের শারিত্ত অবস্থা দেখে অনেকেরই মনে পড়ে মাল করেক
পূর্বকার একটি ঘটনা। এই ঘটনা লব্ধে অভ্যন্তরীণ লিখেছেন :
“একদিন কাশীপুরের বাগানবাটীর নীচের হলঘরে চিৎ হইয়া শুইয়া ধ্যান
করিতেছিলেন এবং দেহবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অধঃপাশে মন স্থির করিবার চেষ্টা
করিতেছিলেন—এমন সময়ে তাঁহার মন ত্রক্ষে একাধ হইয়া নির্বিকল্প অবস্থায়
পৌছিয়া নিরোধ-সমাধিতে মগ্ন হইয়া রহিল। তখন বাহ্য-জগত ও দেহজ্ঞান
লুপ্ত হইয়া ত্র্যক্ষানন্দ-সমুদ্রে মন ডুবিয়া গেল। এই অবস্থায় অল্পক্ষণ থাকিয়া
মন নীচে নাহিয়া আসে।”^৯ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের অনেকেই উপস্থিত
ছিলেন দেখানে। তাঁদের কেউ কেউ অমুভূতি করেন সেই কাহিনী-সম্বন্ধে
নিজ নিজ অভিজ্ঞতা। কালীপ্রসাদ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে সমাধিস্থ অবস্থায়
মনে হচ্ছিল বৃত্তদেহের মত।^{১০} পরে যখন দেখা গেল প্রাণ ধুক ধুক করছে
তখন সেবকদের একজন ঘোতলার গিয়ে ঠাকুরকে সংবাদ দিবে এসেছিলেন।

অমৃতলাল বহু উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখ হতে শোনা
তাঁর বাল্যলীলার কাহিনী বলেন। বালক গদাধর স্মরণ ছবি আঁকতেন,
দেবদেবীর মূর্তি গড়তেন, আবার সেই মূর্তি ছয় আনা দরে বিক্রয়
হয়েছিল।^{১১} শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনী সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনেন।

অমৃতলাল বলেন : প্রথম দেখার সময় (তিনি) কদম্বকে বলেছিলেন—
আরে সেই না? সম্ভবতঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শঙ্কু মন্ডিকের বাড়ীতে
বক্তৃতা দিতে দেখেছিলেন।

রাখাল মন্তব্য করেন : কেশববাবুকে দেখে (ঠাকুরের) পাঁচ বছরের
বালকের (ভাব হয়।)

৯ স্বামী অভ্যন্তরীণের “আমার জীবনকথা”-গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।

১০ তুলনীয় বর্ণনা লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে পাওয়া যায়।
“নিরঞ্জন তাই তাই না দেখে ঠাকুরকে এসে বললেন, ‘লোরেনবাবু
মারা গেছেন। তাঁর দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে’। (পৃঃ ২৫০)

১১ ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫ খ্রীঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে এই কাহিনী
বলেছিলেন কয়েকজনকে।

যোগীন বলেন : তিনি বলেছিলেন 'অবুত আপনার লোক ?'

অবুতমাল : কবে বলেছেন ?

যোগীন : হৃদয়ে।

অতঃপর সেবক যোগীন তাঁর পাকী দেখার কাহিনী বলেন সবাইকে।

১৫ই আগষ্ট, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সকাল আটটা নাগাদ ঠাকুর সেবক যোগীনের বলেছিলেন পঞ্জিকা থেকে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ হ'তে প্রতিদিনের তিথিনক্ষত্রাদি পড়ে শোনাতে। যোগীন পড়তে থাকেন। ঠাকুর ৩১শে জ্যৈষ্ঠের তিথিনক্ষত্র প্রভৃতি শুনেই ইকিতে বলেন পঞ্জিকা রেখে দিতে। পরে দেখা গেল ঐ দিনটিকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন মহাসমারিযোগে তাঁর দেহরক্ষার জন্ত।

মাষ্টারমশাই লিখেছেন, 'সেদিন রাজে সঙ্কীর্ভন হয়েছিল।' স্বামী অকুতানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন : 'রাতে হুজীর পারেস কোরে তাঁকে নিবেদন করা হোলো। কিন্ রায়নাম শুনানো হোলো। তারপর সব যে ঘর বাড়ী চলে গেলো। হামনে, গোপালদাদা আর তারকদাদা সেইখানে রয়ে গেলুম' (স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬৩)।

বুধবার, ১৮ই আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

কানীপুর-বাগানবাড়ীতে ঠাকুরের ঘরে অনেকে উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সামনে বসে সকলে কীর্তন করেন। রায়লাল দাদা শ্রীকৃষ্ণের বালালীলার গান করেন। বালক কৃষ্ণের ননীচুরি বিষয়ক গানটি গাইতে গাইতে তাঁর হৃদয় উবেলিয়ে ওঠে। চোখ কেটে অবাধ অশ্রুর ঢল নামে।

পরবর্তী এক দৃষ্টে দেখা গেল তারকনাথ মাষ্টারমশাইকে বলছেন : ছুনিয়ার দুঃখ কি একবার দেখা যাক।

অপর এক দৃষ্টে কালীপ্রসাদ মাষ্টারমশায়ের কাছে টাকা চান। তিনি বিজয়রুক গোলামীর কাছে শুনে গয়র নিকটে বরাবর-পাহাড়ে এক সিঁদ্ব হঠাৎযোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর মন ঢেঁকে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ত তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি এক ব্যক্তির কাছ হতে (সম্ভবতঃ উমেশবাবু) পাঁচ টাকা ধার ক'রে ট্রেনে চেপেছিলেন এবং বালী-ট্রেনে পৌঁছে গঙ্গা পার হয়ে কানীপুরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই ধারের টাকা শোধের জন্ত তিনি এখন মাষ্টারমশায়ের কাছ থেকে পাঁচ টাকা গ্রহণ করেন।

একটি দৃষ্টে দেখা গেল, বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন সেবক শশীর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র। উদ্দেশ্য পূত্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিহনে শশীর অবস্থা 'আমার জীবন-ধন বিহনে আধার হেরি এ ভুবন।' শশী বিনীতভাবে পিতাকে উত্তর দেন : দেখুন এখন মাথার ঠিক নাই—কেমন ক'রে করে বলি—।

বিকাল পাচটা নাগাদ উপস্থিত হয়েছেন সিঁথির ব্রাহ্মণ। সেখানে উপস্থিত আছেন স্বরেশবাবু (স্বরেশচন্দ্র মিত্র)। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রসিদ্ধ উপমা—মন হচ্ছে ধুবির কাপড়ের মত। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হবে। এই উপমাটি প্রচলিত উপমা—মন দর্পণের অপেক্ষা অধিক কদম্ব-গ্রাহী। এবিষয়ে বুঝিয়ে বলেন স্বরেশচন্দ্র। ইতিমধ্যে নৃত্যগোপাল সেখানে উপস্থিত হন। তিনি সমর্থন করে বলেন : ক্রীকৃষ্ণচৈতন্তই (ঠাকুর) রোমকৃষ্ণ হবেন।

নৃত্যগোপালের মন সামান্যতেই উদ্দীপ্ত হয়। গান শুনে শুনে তিনি ভাবস্থ হয়ে পড়েন।

ষড়ি ও ঝামী অভ্যুত্থানের স্বতিকথাতে পাই 'তিন-চার দিন' পরের ঘটনা, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করে মনে হয় ঘটনাটি ঘটেছিল ঐ দিনেই। অভ্যুত্থানন্দজীর জবানীতে ঘটনার বিবরণ এইরূপ : 'তিন-চারদিন পরে মা হামাকে, গোলাপ-মাকে আর লক্ষ্মীদিকিকে সঙ্গে নিয়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, সন্ধ্যার আগেই তিনি কাশীপুর-বাগানে ফিরে এলেন।... শুনেছি সেদিন বিকালের দিকে রামবাবু বাগানে এসেছিলেন। ছুপুরে শশীভাই, নিরঞ্জনভাই, লোরেনভাই, রাখালভাই ও বাবুরামভাই এসেছিলেন। রামবাবু নাকি আশ্রয় তুলে দিতে চেয়েছেন, আর সকলকে নিজের নিজের বাড়ী ফিরে যেতে বলেছেন। একথা শুনে নিরঞ্জনভায়ের আর শশীভায়ের ভারী দুঃখ হয়েছিলো। তাদের ইচ্ছা, যেমন চলছে ঠাকুরের সেবা তেমনি রোজ রোজ চলুক।' (স্বতিকথা, পৃ: ২৬২-৩)

ঝামী অভ্যুত্থানন্দের স্বতিকথাতে পাই : 'আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি তাহা হইলে কোথায় রাখা হইবে? রামবাবু বলিলেন, 'কাঁকড়াগাছিতে তাঁহার বোগোড়ান আছে, সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি সমাধি দেওয়া হইবে।'...শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-মন্দির পবিত্র গঙ্গার তীরে না হইয়া বোগোড়ানে কিভাবে হইবে তাহা আমরা চিন্তা করিতে

লাগিলাম।...তিনি (রামবাবু) খ্রীষ্টীঠাকুরের পবিত্র অস্থি তাঁহার
 বোগোড়ানেই সমাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার স্থির-সিদ্ধান্ত
 আদর্শগকে জানাইয়া সেই রাজি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাজি অধিক
 হইল।...আমরা সকলে স্থির করিলাম যে, খ্রীষ্টীঠাকুরের পবিত্র অস্থির
 বেশী অংশ কলস হইতে বাহির করিয়া একটি কোটাতে রাখিয়া ঐ কোটা
 বাগবাঝারে তক্ত বনরামবাবুর বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হউক এবং রামবাবু
 যেন ঘুণাকরে সেই কথা কোন রকমে জানিতে না পারেন। পরে রামবাবু
 আসিলে বাকী অস্থি কলসীসহ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। আমাদের সিদ্ধান্ত
 মতো তাহাই করা হইল।...তাহার পর নরেন্দ্রনাথ বলিল : “ত্যাগো,
 আমাদের শরীরই খ্রীষ্টীঠাকুরের জীবন্ত সমাধিস্থান। এসো আমরা সকলে
 তাঁর পবিত্র দেহের ভস্ম একটু করে খাই ও পবিত্র হই।” নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম
 কলসী হইতে সামান্য অস্থির গুঁড়া ও ভস্ম গ্রহণ করিয়া ‘জয় রামকৃষ্ণ’ বলিয়া
 ভক্ষণ করিল। তারপর আমরা সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের
 ধন্য জ্ঞান করিলাম।’ (আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২২-৪)

এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য স্বামী শিবানন্দের স্মৃতিকথা। তিনি বলেছিলেন :
 “স্বামীজী ঘড়াটি হতে সমুদয় বড় একটি কাপড়ে ঢালেন। একটি ক্ষুদ্র অস্থি-
 ধণ্ডা গুঁড়াইয়া ভস্ম উদরস্থ করেন ও বলেন, ‘ত্যাগ্ ওদেশে (ভিকতে) বড়
 বড় লামাদের অস্থিকণা এরকম খেয়ে থাকে। আর তোরগও একটু খা !
 ঐরূপে ঐ পুত্রেদের অস্থিকণিকা উদরস্থ হওয়া মাত্র দেখা গেল খ্রীষ্টীস্বামীজীর
 ঘোর মাতালের মত নেশা উপস্থিত হইল। তিনি নিজেও ঐরূপে গ্রহণ করায়
 একটা মন্তব্য সেদিন অনুভব করিয়াছিলেন।” (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ :
 শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ, ১৩০৪, পৃঃ ৩৬)

অপরপক্ষে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : “দেহাবসানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের
 শরীর অগ্নিতে সমর্পিত হইয়াছিল এবং ভস্মাবশেষ অস্থিসমূহ সংরক্ষণ করিয়া
 একটি তারকলসে রক্ষিত হইয়াছিল। পরে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ তক্ত-
 সকলে মিলিত হইয়া প্রথমে পরামর্শ করিয়া স্থির হইয়াছিল যে, পুত
 ভাগীরথীতীরে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া উক্ত কলস তথায় রাখানিয়মে
 সমাহিত করা হইবে। কিন্তু ঐরূপ করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন দেখিয়া
 ও অন্ত নানাকারণে ঠাকুরের গৃহী তক্তগণের অনেকে কিছুদিন পূর্বে পূর্বোক্ত
 সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরের ত্রিশদাশিত, অধুনা পরলোকগত তক্ত

ঐরামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকড়াগাছির 'যোগোভান' নামে প্রসিদ্ধ ভূমিধণ্ডে উক্ত কলস সমাহিত করিবার কথা নির্ধারিত করেন। তাঁহাদিগের এরূপ মত পরিবর্তন ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহারা পূর্বেক্ত তাম্রকলস হইতে অর্ধেকেরও উপর ভ্রমাবশেষ ও অস্বিনিচয় বাহির করিয়া লইয়া তিন্ন এক পাতে উহা রক্ষাপূর্বক তাহাদিগের প্রদ্যাপদ গুরুভ্রাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীমুকু বলরাম বহু মহাশয়ের ভবনে গীতাপূজাদির ভক্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন।" ১২

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার নরেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ দোতলার হলঘরে গান গাইতে আরম্ভ করেন। প্রথমেই গান করেন গভীর স্মৃতি-বিষণ্ডিত ১৩ গান—

মা ঞ্জ হি তারা তুমি ত্রিগুণধরা পরাংপর।

আমি জানি গো ও দীন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥

তারপর তিনি একে একে গান করেন—

- (১) শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে যগনা,
স্থধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না। ইত্যাদি
- (২) শিব শঙ্কর বম্ বম্ ভোলা, কৈলাসপতি মহারাজ রাজ্য। ইত্যাদি
- (৩) মজলো আমার মন-ভ্রমর! স্তামাপদ নীলকমরে।
বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লো, কামাদি রিগু-সকলে। ইত্যাদি
- (৪) কেনরে মন ভাবিস এত, দীনহীন কাঙালের মত।
আমার বা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সিন্ধেশ্বরী কেম্বরী। ইত্যাদি
- (৫) আপনাতে আপনি থেকে মন, যেও নাকো কারু ধরে।
বা চাবি তা ব'লে পাবি, খোজ নিজ অন্তঃপুরে। ইত্যাদি
- (৬) ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাচ-বিনোদিনী। ইত্যাদি
- (৭) স্তামা স্থধাকর - ইত্যাদি
- (৮) দয়াময় দয়াময় - ইত্যাদি

কল্পনা করা যেতে পারে গানের পর গানের লহরী একদিকে যেমন

১২ স্বামী সারদানন্দ : ভগবান ঐরামচন্দ্রদেবের ভ্রমাবশেষ অস্বি-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, উদ্বোধন, প্রাবণ, ১৩২২

১৩ যে'দিন নরেন্দ্রনাথ মা-কালীকে বেনেছিলেন সেদিন সারান্নাত ঠাকুর ঐরামচন্দ্রের লভ্য শিখিয়ে দেওয়া 'মা ঞ্জ হি তারা' গানটি গেয়েছিলেন। (লীলপ্রসঙ্গ, ৫১২৪৬-৭)

মাধুৰ্যময় পরিবেশ রচনা করেছিল, তেমনি প্রতিটি গানের সঙ্গে জড়িত ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি শ্রোতাদের শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যের আনন্দানুভবে
আবিষ্ট ক'রে তুলেছিল।

কিছুক্ষণ পরে নৃত্যগোপাল বলেন তাঁর দর্শনের (সম্ভবতঃ স্বপ্ন-দর্শন)
ছুটো কাহিনী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির রাজে তিনি দেখেছিলেন
ঠাকুরের ঘরের ছাত্রের কাছে একটি বিড়াল। আবার একরাত্রে তিনি
দেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ও তাঁর (মা কালীর ?) বরাভয় মূর্তি সব একই।

রামলালদাদা কিছুদিন পূর্বে বাড়ী গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ঠাকুরকে
সব বিবরণ তুলিয়েছিলেন। রামলালদাদা স্মৃতি চয়ন ক'রে বলেন ঠাকুরের
কয়েকটি উক্তি। ঠাকুর রামলালদাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'বাড়ীতে
আর কিছুদিন থাকলি নি কেন ?'

'করবীর গাছ বাড়ীর ভিতরে দিলি কেন ?'

মাঠারমশায়ের ভায়েকী থেকে আরও জানা যায় যে, গতদিনের মত এই
দিনেও ছপুর্বে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করা হয়, সন্ধ্যাতে নীতল দেওয়া হয়।

পরদিন বৃহস্পতিবার, ১১শে আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। একত্রে মিলিত
হয়েছেন অরেশচন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র বোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নৃত্যগোপাল
প্রভৃতি।

গিরিশচন্দ্র আবেগের সঙ্গে বলতে থাকেন : 'টাকা কি জিনিষ—এবার
দেখবো।' ১৪

'সমাধি-জমির production দ্বারা যাতে চলে (দেখতে হবে।)'

'(এর অর্থ) এক লাখ টাকা, কি পঞ্চাশ হাজার টাকা ওঠাতে হবে।'

তিনি নৃত্যগোপালকে লক্ষ্য ক'রে বলেন : 'চিতা সমাধির অস্ত অস্থি
আলাদা লওয়া হবে না।'

তিনি আবার বলতে থাকেন : 'পরমহংসের নিকট যাওয়া (নিষেকে)
ধার্মিক জানাবার অস্ত নয়।'

১৪ কয়েকদিন পরে ২৫শে অগাষ্ট গিরিশচন্দ্রকে খেদোক্তি করতে শোনা
গিয়েছিল : 'হি'ছ হব—মহ আদর্শে হোঁব না—টাকা করবো,
কেননা টাকার অস্ত তাঁকে দেখতে পারি নাই। ইচ্ছা ছিল একটি
ভাকার সর্বদা কাছে রাখবার—তা পারলুম না।'

* এই রচনার অন্ততম আকর পুস্ত্যপাদ মাঠারমশায়ের ভায়েকী।

২৩শে আগস্ট, ১৮৮৬

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। সেইদিনের ঘটনা কালের রঙ্গমঞ্চে ক্রমেই মহত্তর ও বৃহত্তররূপে প্রতিভাত হচ্ছে। ঘটনার ব্যঙ্গনা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করছে। তদানীন্তন কালের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করব।

সেদিন ছিল ঞ্জাষ্টমী। বাংলা সন ১২৯০-এর ৮ই তাজ, সোমবার।

শ্রীভগবান রামকৃষ্ণবিগ্রহে নরলীলা সাক্ষ ক'রে অগংগমঞ্চ হতে অস্তর্হিত হয়েছেন যাত্রা কয়েকদিন পূর্বে, ভক্তদের হৃদয় হাহাকার করতে থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যসন্দের স্মৃতি হৃদয়কে উদ্বেলিত ক'রে তোলে। কোন কোন মুখীভক্ত যদিও অসুস্থত্ব করেন, 'প্রয়োজনমত কানবিগ্রহের রূপে। বিরটিমুখি এবে গোটা বিশ্বব্যাপে।', অধিকাংশ ভক্তচান তাঁকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেতে, আপনজনের মতো তাঁর সঙ্গে সহবাস করতে, নিকট বন্ধুর মতো সুখে-দুখে সহমর্মী হতে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 'চিহ্নর'-তত্ত্বের পূতাস্থি সংরক্ষিত হয়েছিল একখানি তামার কলসের মধ্যে। কাশীপুর উত্তানবাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত শস্যার উপর সংস্থাপিত হয়েছিল পূতাস্থির আধার। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-প্রতীকরূপে পূতাস্থির নিত্যপূজা-ভোগরাগাদি চলেছিল।^১

এভাবে অতিবাহিত হয় কয়েকটি দিন। ইতিমধ্যে কাশীপুরের বাগান-বাড়ী ছেড়ে দেবার প্রস্তাব ওঠে। মুন্সি ডক্টর রামচন্দ্র দত্ত এগিয়ে এসে ত্যাগী যুবকভক্তদের জানান গৃহী-ভক্তগণের সিদ্ধান্ত। স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিকথাতে পাই, "রামবাবু আমাদের সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা যে বাহার ঘরে কিরিয়া বাইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অধি তাহা হইলে কোথায় রাখা হইবে? রামবাবু বলিলেন,

- ১ "সেবক ভক্তগণও শস্যার উপর শ্রীকৃষ্ণদেবের চিত্রপট স্থাপনপূর্বক সেইদিন হইতেই বিধিমত ভোগরাগাদি প্রদান করিয়া তাঁহার নিত্যপূজা আরম্ভ করিলেন," শশিভূষণ বোব কৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব।' পৃ: ৪৬১

কাঁড়গাছিতে তাঁহার যোগোড়ান আছে, সেইখানেই খ্রীষ্টিানদের অস্থি সমাধি দেওয়া হইবে। ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ আমরা অত্যন্ত হুঃখিত হইলাম। খ্রীষ্টিানদের সমাধি-মন্দির পবিত্র গন্ধারতীরে না হইয়া কাঁড়গাছিতে যোগোড়ানে কিভাবে হইবে তাহা আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমাদের চিন্তার কথা রামবাবুকেও জানাইলাম। রামবাবু কিন্তু কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি খ্রীষ্টিানদের পবিত্র অস্থি তাঁহার যোগোড়ানেই সমাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানাইয়া সেই রাত্রি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।”^২

মনোমোহন মিত্র তাঁর স্বতিকথাতে লিখেছেন : ‘দেহাবসানের পূর্বে খ্রীরাঘকৃষ্ণদেব তাঁহার সেবকগণকে বলিয়াছিলেন—আরুণীতীরে যেন তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয়। ভক্তগণ তাঁহার চিতা-অবশিষ্ট অস্থি একটি তাম্র-পাত্রে পূর্ণ করিয়া কানীপুরের বাগানে রাখিয়াছিল। সপ্তাহকাল উত্তীর্ণ হইতে চলিল তখনও গন্ধারতীরে স্থান সংগ্রহ করা ভক্তগণের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উহা যোগোড়ানে সমাহিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে ভক্তগণের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। একপক্ষ আরুণীতীরেই উহা সমাহিত করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মতে বহিঃ কাহারও আপত্তি ছিল না, তথাপি সেইরূপ স্থান সেই স্বল্পকালের মধ্যে সংগ্রহ করিতে না পারায় এবং রামচন্দ্র তাঁহার কাঁড়গাছিতে যোগোড়ানকে উক্ত কার্যের জন্ত উৎসর্গ করিতে স্বীকৃত হওয়ার, পরিশেষে সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন।’^৩

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামচন্দ্র দত্তের স্বতিকথার একটি অংশ। গন্ধারতীরে খ্রীষ্টিানদের পূজাস্থি সমাহিত করা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : “সে আমি, হরমোহন, আর কথক, তিনজনে খুঁজে খুঁজে নাকালের একশেষ। এদিকে বালী, উত্তরপাড়া, কোরগর, মায় বাশবেড়ে অবধি, আর ওদিকে মণিরামপুর অবধি খুঁজে বেড়িয়েছি। কোথাও জায়গা পাওয়া গেল না। মহিম চক্রবর্তী কাঠা দশেক জায়গা দিতে চেয়েছিলেন, তিনিও শেষে সরে পড়লেন।”^৪

২ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২২-৩

৩ “ভক্ত মনোমোহন”, পৃঃ ১৬০

৪ “ভক্তমঞ্জরী” ২০ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, পৃঃ ১৫৮

ইতিমধ্যে বলরাম বহুর পিতা যিনি বুদ্ধাবন হুঙ্কে বাস করতেন তিনি ব্যবস্থা দেন। তিনি বলেন, “সমাধি না দিয়া যদি শুধু অস্থি কোন পাত্রে রক্ষিত হইয়া পূজা দি করা যায় তাহা হইলে কোন দোষ নাই। তবে একটি মহোৎসব করিয়া ঐক্যভাবে রাখা বাইতে পারে। বলরামবাবুর ঐ সকল কথা ভক্তগণকে বিজ্ঞাপিত করার মতবৈধ উপস্থিত হইল। নিত্যগোপালবাবু বলিলেন, তর্কের উপর তর্ক আছে। তখন অগত্যা স্থির হইল যে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকড়াগাছির উদ্ভানে উহা সমাহিত করা হইবে।” (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ : শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ, পৃ: ৩৫)

এই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ অন্তর্গত। তিনি লিখেছিলেন : “পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার (স্বরেন্দ্র ও বলরামের) নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গলাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অস্থি সমাহিত করা হয়।...এবং স্বরেশবাবু (স্বরেন্দ্র) ভক্ত ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন।”^৫ ঘটনাপ্রসঙ্গ দেখে মনে হয়, ভক্ত স্বরেন্দ্রনাথের দানের ইচ্ছা ত্যাগী ভক্তদের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল কাঁকড়াগাছি যোগোদ্ভানে পূজা দি সমাহিত করার সিদ্ধান্তের পরে। এই সময়কার ঘটনাসংঘাতের উপর কথঞ্চিৎ আলোকপাত করবে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ভাষণংশ। তিনি বলেছিলেন : “Among others, he (Sri Rama-rishna) left a few young boys who had renounced the world, and were ready to carry on his work Attempts were made to crush them. But they stood firm, having the inspiration of that great life before them...At first they met with great antagonism, but they persevered...”^৬

রামবাবু তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে চলে যান, ত্যাগী ভক্তেরা বিষম হয়ে পড়েন, হতাশায় তাঁদের মন সমাচ্ছন্ন হয়। রাজিবেলা। কান্দিপুরের বাগানে বসেছিলেন ত্যাগী সন্তানদের অনেকেই। রামবাবুর সিদ্ধান্তে তাঁরা বিভ্রান্ত বোধ করেন। যুবক নিরঞ্জন বলে ওঠেন—‘আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা দি

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, বর্ষ ৭৩, পৃ: ৩২২

৬ The Complete Works of Swami Vivekananda (Mayavati Memorial Edn) Vol, V, p. 186.

কিছুতেই রামবাবুকে ছেব না।’ শশীও বলেন—‘কলসী ছেব না।’ উপস্থিত সকলেই সমর্থন করেন, শশীও নিরন্তর নেতৃত্বে অধেকেরও উপর ভ্রমাবশেষ ও অস্থিচর বের ক’রে একটি কোটার রাখা হ’ল এবং কোটাটি ভক্ত বলরাম-বাবুর বাড়ীতে নিত্যপূজার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হ’ল।^১ গুতাখি কোটার তুলে রাখার পর নরেন্দ্রনাথ বললেন, ‘ছাখো, আমাদের শরীরটী খ্রীষ্টীকরের জীবন্ত সমাধিস্থান। এসো আমরা সকলে তাঁর পবিত্র দেহের ভ্রম একটু করে খাই ও পবিত্র হই।’ সর্বপ্রথম নরেন্দ্রনাথ, তারপর তাঁকে অনুসরণ করে অন্য ত্যাসী ভক্তেরা সামান্য অস্থির গুঁড়া ও ভ্রম ‘জয় রামকৃষ্ণ’ উচ্চারণ করে গ্রহণ করলেন।^৮ রামকৃষ্ণ ভাবান্নি যেন তাঁদের মধ্যে উজ্জলতর হয়ে উঠল।

এই সময়কার ঘটনার সারাংশ পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার সেনের বর্ণিত খ্রীষ্টীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে। ‘কর্তৃত্বাভিমানে’ রামচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে খ্রীষ্টীরামকৃষ্ণপুঁথিকার লিখেছেন :

“প্রভুর বিরহে মাত্র দিনজয় খেদ ।
পরে গৃহী সন্ন্যাসীতে লাগিল বিচ্ছেদ ॥
... ...
গৃহীদের মধ্যে একা কার্যকারী রাম ।
... ...
সব কর্মে অগ্রসর কর্তৃত্বাভিমানে ।
অন্ত বত সহকারী রামের পেছনে ॥
রাম কহে গঙ্গাতীরে কিনিবারে জমি ।
কোথায় এতেক টাকা-কড়ি পাব আমি ॥
বাদ-প্রতিবাদ এইরূপে হুই দলে ।
চারি পাঁচ দিবস জয়শঃ গেল চলে ॥
খ্রীপ্রভুর গৃহী ভক্ত আছে এতগুলি ।
কিন্তু এই কর্মে বেশী রামের বিকুলি ॥
সন্ন্যাসী বালকবর্গে বুঝায় বিহিত ।
কাঁড়গাছিতে মত কৈল স্থিরীকৃত ॥৯

১ ‘উদ্বোধন’, ১৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৪০

৮ ‘আমার জীবনকথা’, পৃঃ ১২৩

৯ ‘খ্রীষ্টীরামকৃষ্ণপুঁথি’, পৃঃ ৬৩২

কাঁকড়াগাছিতে ছিল রামচন্দ্রের বাগান, তার নিকটেই ছিল সুরেন্দ্রনাথের বাগান। শ্রীঠাকুরের নির্দেশে 'একশ খুন হলেও কেউ জানতে পারে না' এমন একটি জায়গা খুঁজতে খুঁজতে রামচন্দ্র কাঁকড়াগাছির এই বাগানটি বেছে নিয়েছিলেন। শ্রীঠাকুর এই বাগানে গিয়েছিলেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর। বাগানে পদার্পণ করেই তিনি বলেছিলেন, 'আহা বাগানটি তো বেশ। এইরকম বাগানে যেন আছি, একদিন দেখেছিলাম।' বাগানের মধ্যে একটি পুকুর। পুকুরের জল পান ক'রে তিনি বলেছিলেন, 'পুকুরের জলটি ত বেশ মিষ্টি।' শ্রীঠাকুর রামচন্দ্রকে বলেছিলেন বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করতে। উপরন্তু তিনি বাগানটির নাম দিয়েছিলেন 'তুলসী-কানন'।^{১০} বাগানের ভিতর একটি তুলসীকানন দেখে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন, 'বাঃ বেশ জায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বরচিন্তা হয়।' ^{১১} তিনি পুকুরের দক্ষিণের দিকের ঘরটিতে বসেছিলেন এবং রামচন্দ্র-নিবেদিত বেদানা, কমলালেবু ও কিছু মিষ্টি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করতে করতে গ্রহণ করেছিলেন।

রামচন্দ্র বাগানের 'তুলসী-কানন-অংশ' শ্রীঠাকুরের পুতাহির সমাধির জন্ত দান করতে অগ্রসর হন। নরেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় মতবিরোধ কাঁড় হয়, সকলের মন সাময়িকভাবে হলেও শান্ত হয়। নিকটবর্তী জম্মাঠিমীর তিথি পুতাহি সমাধির জন্ত স্থির হয়।

পরবর্তী তথ্যের জন্ত আমরা মনোমোহন মিত্রের স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করব। তিনি লিখেছেন, 'এই ভাত্র জম্মাঠিমীর পূর্বপ্রান্তে কালীপুরে রক্ষিত তাম্রকলসটির নিত্যনিরমিত পূজা সূক্ষ্ম হইলে ভক্তচূড়ামণি শশী ও বাবুরাম উহা বাগবাঞ্ছারে বলরামবাবুর গৃহে লইয়া আসিলেন। পরে উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহযোগিতায় উহা রামচন্দ্রের গৃহে আনীত হইয়াছিল।' অক্ষয়কুমার সেনের লেখা হতে জানতে পারি 'সমাধি-দিনের ঠিক পূর্বকাল রেতে। (রাম) কলসি লইল তবে আপনার হাতে।' ^{১২}

পরের দিন জম্মাঠিমী, ১২৯৩ সাল ৮ই ভাত্র, (সোমবার), সকালবেলা ভক্তগণ পুতাহি পূর্ণ কলসীটি চন্দনে চর্চিত করেন ও ফুলের মালা দিয়ে

১০. ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ১৬৪-৬

১১. কথামৃত ৫।১৩।১

১২. শ্রীশ্রীরাবকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৬৩২

সাজান। তারপর শুভ্রগণ একে একে এসে প্রণাম করেন। শুভ্রদের প্রণাম শেষ করতে বেলা আটটা বেজে গেল।^{১৩}

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট সংখ্যার The Indian Mirror পত্রিকা লিখেন : “A sankitan procession in commemoration of this solemn event, started from Simla at 8-30 A.M. yesterday.” আর ১২৯৩ সালের ১২ই ভাদ্র সংখ্যার ‘হুলস্ত সমাচার’ ও ‘হুলদাহ’ লিখেছেন, “গত সোমবার প্রাতে নয়টার সময় সিমুলিয়া ষ্ট্রীটের ১৩ নম্বর ভবন হইতে সঙ্কীর্তন সহ অনেকগুলি শুভ্রলোক স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের অস্থিপূর্ণ তাম্রকলস লইয়া সমাধির সহিত বাহির হইলেন, দলে অহুমান পকাশ জন^{১৪} শুভ্রলোক ছিলেন। অত্র খোল করতাল সিঁদা-সহ বিভিন ষ্ট্রীট থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার একটি সঙ্কীর্তনের দল, তৎপরে কতকগুলি সৌখীন যুবক পাখোয়ারের সহিত একটি নবরচিত সঙ্কীর্ত করিতে করিতে চলিলেন, পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যেরা ক্রমাগত উক্ত কলসটি মস্তকে করিয়া চলিতে লাগিলেন। ফুলের মালায় কলসীটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, উপরে বহুমূল্য ছত্র ধরা হইয়াছিল, পার্শ্বে আড়ানীবোণে বাতাস করা হইতেছিল, দুইদিক হইতে চামর ব্যঞ্জন করা হইতেছিল, সর্বশব্দে নববিধানের প্রচারকণ্ঠ অবনত-মস্তকে গমন করিতেছিলেন।”^{১৫}

সিমুলিয়া ষ্ট্রীট হতে বাজা করে শুভ্রের দল ‘জয় রামকৃষ্ণ’ ধ্বনিত্তে তাদের হৃদয়ের বেদনা, আবেগ ও আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথকে

১৩ শুভ্র মনোমোহন, পৃ: ১৬১

১৪ এই সঙ্গে স্মরণযোগ্য ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বরে The Indian Mirror পত্রিকার বোষণা : “The other day his ashes were buried in the garden house of one of his disciples, on which occasion hundreds of educated persons were present. A procession of several graduates and undergraduates of the University was formed when the ashes were conveyed to the garden house.”

১৫ ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যনীকান্ত দাস : ‘সমসাময়িক দৃষ্টিতে ঐরামকৃষ্ণ পরমহংস’, পৃ: ৫০-৫১

পুরোভাগে রেখে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণ এগিয়ে চলেন। সেবক শশিভূষণ অস্থি-কলসটি লব্ধে মন্তকে ধারণ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। কীর্তনের দল গাইতে থাকে গিরিশচন্দ্র রচিত চৈতন্তলীলার একখানি গান—

হরি মন মজারে লুকালে কোথায় ?

(আমি) ভবে একা দাওহে দেখা প্রাণসখা রাখ পায় ।

হিলাম গৃহবাসী করিলে ডহাসী কুল ত্যাজে অকূলে ভাসি

কোণা কদবিহারী আছ হরি পিপাসী প্রাণ তোমায় চায় । ১৬

দলটি ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীর কাছে পৌছালে অমৃতলাল বসু ও ঠার থিয়েটারের আভিনেতা কয়েকজন যোগদান করেন। দলটির প্রথমভাগে রইলেন বৈষ্ণবচূড়ামণি বলাইচাঁদ গোস্বামী আর শেষের দিকে রইলেন ঠার থিয়েটারের দল। সঙ্কীর্তন ও জয়ধ্বনির গম্ভীর মধুর পরিবেশ সৃষ্টি ক’রে এগিয়ে চলে দলটি।

৮০নং কাকুড়গাছিতে ছিল রামচন্দ্রের উদ্ভান। বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সামিয়ানা টালানো হয়েছিল। পাতা-ফুল দিয়ে বাগানটিকে সাজান হয়েছিল। ইট দিয়ে বাধান হয়েছিল সমাধি-গম্বর। বৈষ্ণব-প্রথামত অস্থিপূজা শেষ ক’রে অস্থি-কলস গম্বরে স্থাপন করা হয়। কলসীর উপর মাটি কেঁলতে থাকলে সেবক শশী আত্ননাহ করে ওঠেন, “ওগো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।” তাঁর কথার অনেকেই চোখে জল এসে যায়। সবাই প্রাণে মনে কণেকের ভক্ত হলেও অহতব করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সদা-বিরাজমান। তিনি জীবন্ত সচেতন বিগ্রহ। তিনি তাঁদের সাথে রয়েছেন।

রামচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শেবদিনের আজ্ঞা ছিল ‘হাড়ি-হাড়ি ভাল-ভাত’। ১৭ ভদ্রহাবারী হাড়ি হাড়ি খিচুড়ী ভোগ দেওয়া হ’ল। খিচুড়ী-ভোগ উপস্থিত ভক্তদের বিতরণ করে দেওয়া হ’ল। পাশে

১৬ একদিন গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্রকে আবেগভরে বলেছিলেন : “এই চৈতন্তলীলাই আমার সব। এই থেকে আমি গুরুত্বপা লাভ করলুম। সব কথা মনে পড়ছে—ঠাকুরকে বেদিন মাথার করে এনে এখানে বসালুম সেদিনও সেই চৈতন্তলীলা, ‘হরি মন মজারে লুকালে কোথায়’ ?” (তত্ত্বমঞ্জরী ২০ বধ, পৃঃ ১৫৭)

১৭ রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৫৫

হুজুরনাথের বাগানে^{১৮} কাকাল ও গরীবদের পরিভূষিত সহকারে খাওয়ান হ'ল। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি উৎসব প্রাক্কণকে আনন্দমুখর ক'রে রেখেছিল।

সেদিন সন্ধ্যার নিভাগোপাল বহু সমাধিস্থানে সন্ধ্যারতি করেন ও সাংকালীন ভোগ দেন। সেদিন ভোগ হেওরা হয়েছিল কলা, মড়কী ও বাতাস।^{১৯} সেদিন রাজে ত্যাগী সন্তানেরা সকলেই বোগোস্তানে থেকে যান।^{২০} এভাবে সম্পূর্ণ হয় কাঁকুডগাছিতে পূজাস্তি সমাধি-উৎসব।

বলাবাতলা সাকর শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বিকার এট দীন সামান্য আয়োজনে তাঁর ত্যাগী সন্তানেরা যে সঙ্কট হতে পারেন নি তাই নয়, জনসাধারণের মধ্য হতেও অভূষিত অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল। ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ তারিখের The Indian Mirror পত্রিকায রাজেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদককে লিখেছিলেন : 'Permit me to appeal, through the medium of your widely-circulated journal, to the large scale of disciples and admirers of the late Ramkrishna Paramhansa to set on foot a public subscription for perpetuating his memory... when we are ready to open our purse-strings to raise monuments to those who distinguished themselves in war and politics, would it not be an act of base ingratitude not to honour in some suitable way the memory of that spiritual captain who has valiantly made war on our behalf, not against any earthly King or Kaiser—not against any temporal grievances but against the eternal enemies of mankind against death and hell?'^{২১}

ভক্তের দৃষ্টিতে জগৎ লীলাময় ভগবানের লীলাক্ষেত্র। ভগবানের ইচ্ছাতেই ঘটে ঘটনাবৈচিত্র্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছা

১৮ শ্রীঠাকুর এই বাগানে ছুবার গিয়েছিলেন। একবার ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর। আরেকবার ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জুন—সেদিন সেখানে মহোৎসব হয়েছিল।

১৯ ভক্ত বনোমোহন, পৃঃ ১৬২

২০ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২৪

২১ 'Vedanta for East and West', Vol. 129, p. 2-3

বই একটি পাতাও নড়বার ঘো নাই।" ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কি তার তাৎপর্য না বুঝে স্বাস্থ্য ছটকট করে, সময় সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কিন্তু ঘটনা ঘটে যাবার পর ক্রমে ক্রমে তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কালস্রোতে ভাসমান স্থিতি-নৌকা ঘটনার নূতন নূতন ভাবব্যঞ্জনা সম্ভার নিয়ে ঘাটে ঘাটে এসে নোঙর কেলে এবং সেই ভাববৈচিত্র্যের সম্পদ দেখে মুগ্ধ হন ভক্তগণ। রামকৃষ্ণলীলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট। ঘটনার ভাবভরদ্ব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশঃ দিনে দিনে আবিষ্ট ভক্তগণকে আকৃষ্ট করছে রামকৃষ্ণ-ভাবাধর্ষের প্রতি, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত নূতন যুগের প্রতি। সেকারণেই দিনটি বিশেষ স্মরণযোগ্য।

স্বামীকৃষ্ণ মঠে প্রথম কালীপূজা

“বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পব নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা একত্র হইরাছেন।...ঠাকুরঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবা।... শশী নিত্যপূজার ভার লইরাছেন। নরেন্দ্র ভাইদের ভাস্কর্য্যাদান করিতেছেন। ভাইরাও তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। নরেন্দ্র বলিলেন, সাধন করিতে হইবে, তাহা না হইলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। তিনি নিজে ও ভাইরাও নানাবিধ সাধন আরম্ভ করিলেন। বেদ পুৰাণ ও তন্ত্রমতে মনের খেদ মিটাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও কখনও নির্জনে বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শ্মশান ঘাট, কখনও গঙ্গাতীরে সাধন করেন। মঠের মধ্যে কখনও বা ঘ্যানের ঘরে একাকী জপধ্যানে দিন যাপন করেন। আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া সংকীৰ্ত্তনানন্দে মত্ত করিতে থাকেন। সকলেই বিশেষতঃ নরেন্দ্র ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল।”^১

এবার নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করেন মঠে কালীপূজা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : “আত্মশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালী” ব্রহ্ম. ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না,—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম-রূপ ভেদ।”^২

“তিনি নানাতাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী; বক্ষাকালী, জ্ঞানাকালী।”

তব্ধে কালী লীলাময়ী মহাশক্তি। তিনিই সাংখ্যের প্রকৃতি ও উপনিষদের অব্যাকৃত বা অব্যক্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণের গিরি বা গিরির জাতাকাতার হাড়ি। কালের কড়ী কালীর অক্ষুন্ন লীলাব্যঙ্গনা বিচিহ্নভাবে অভিব্যক্ত। বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই দোককল্যাণার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-গিঞহ

১ কথাবৃত্ত ৩, পরিশিষ্ট ১

২ কথাবৃত্ত ১।২।৪

ধারণ করে অবতীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের নবলীলার সমাপনান্তে শ্রীম্মাকালী প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সদংবেশ অমৃতব,—শ্রীরামকৃষ্ণ মাকালী বৈতন। শ্রীম্মাকালী বিবেকানন্দও ভগিনী নিবেদিতার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ অবলম্বন করে মাকালীই জগৎকল্যাণে ব্যাপ্ত। ব্যক্তিবিশেষের অমৃতভূতির মধ্যেই এই তত্ত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই দেবি, ভামপুত্রে ৮তমাপূজার সন্ধ্যায় স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছিতে ত্যাগী ও গৃহী উভয়গণ সমবেতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহে আবিস্কৃত রামকৃষ্ণকালীর পূজা করেছিলেন।

নরেন্দ্র একসময়ে মাকালীকে মানতেন না, মূর্তিপূজাকে কটাক্ষ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে নরেন্দ্র ভিন্নরূপে মাকালীর রূপান্তর করেছিলেন। নরেন্দ্র মাকালীকে স্বয়ংসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খুশিতে ভগমগ হয়ে তত্বদের বলেছিলেন : “নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?” মাকালীকে শুধু মানা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নরেন্দ্রকে মাকালীর অচরণে সমর্পণ করেছিলেন।^৩

শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহে জগন্মাতার লীলা অপ্রকট হলে রামকৃষ্ণ-সন্ধানেরা এসে মিলিত হন বরাহনগরের একটি পোড়ো বাড়ীতে—ত্যাগী সন্ধানদের সমবেত চর্চার গড়ে ওঠে রামকৃষ্ণ মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির কয়েকদিন পরে তাঁর ভক্ত ও ‘রসদার’ সুব্রহ্মনাথ মিত্র এক বিবাহপর্বের মাধ্যমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ পান। তিনি অর্থনাহাব্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছুটে যান নরেন্দ্রনাথের নিকটে, নরেন্দ্র বরাহনগরে ছুঁবন হস্তের জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বাড়ীটি সন্ধ্যায় ভাঙা নেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগীসন্ধানদের একত্র করে রামকৃষ্ণ মঠ গড়ে তোলেন। রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার প্রাৰ্থনার এই ইচ্ছানিহিত অলৌকিক কাহিনী ছাড়াও ভিন্ন একটি দৌকিক কারণ নির্দেশ করেছেন শশীভূষণ ঘোষ। তিনি লিখেছেন, “কিছুদিন পূর্বে সুব্রহ্মনাথ তাঁহার ইষ্ট শ্রীশ্রীকালীমাতার একখানি তৈলচিত্র নিজগৃহে স্থাপন করিবার জন্য মনোমত করিয়া চিত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমূর্তি উগ্রভাবে চিত্রিত দেবীয়া বাণীর কটাক্ষ

৩ শঙ্করীপ্রসাদ বসু : নিবেদিতা লোকমাতা : ‘অধাঃস্বরাধোঃ গোপন হসিল’ : শ্রীম্মাকালী বিবেকানন্দ বলেছেন, “And Ramakrishna Paramahansa made me over to Her.” Sister Nivedita : The Master as I saw him, p. 214 : “Ramakrishna Paramahansa dedicated me to Her (Kali).”

তাহা গৃহে রাখিতে নিবেদন করেন। অরেশচন্দ্র সেই চিত্রপট কালীপুরের বাগানে শ্রীগুরুদেবের কাছে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনস্বরূপ সেই চিত্রপট এখন কোথায় লইয়া যাইবেন?—স্বতরাং তিনি চিত্রপট রক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহজেই তাঁর মনে হইল, কেবল বাটী ভাড়া করিলে চলিবে না। তাঁহার চিত্রপটের রক্ষকস্বরূপ লোকের আবশ্যক। দুই তিন ভক্তের (লাটু প্রভৃতির) থাকিবার স্থান নাই। তাঁহারা এই কার্যের ভার লইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বিশেষতঃ সেই স্থানে শ্রীগুরুদেবের আসন স্থাপন করিলে, তাঁহার পূজাকার্য যাহা ইতঃপূর্বে (কালীপুর বাগান-বাটীতে) আরম্ভ হইয়াছে তাহাও বন্ধ হইবে না। বরাহনগরে গঙ্গার সন্নিকটে জমিদান মুল্লীবাবুদের পুরাতন ভগ্নবাটী ১০ টাকা ভাড়া দ্বিগুণ করিয়া শ্রীহরেশচন্দ্র শ্রীগুরুদেবের শয্যাঙ্গি সমস্ত দ্রব্য ও শ্রীশ্রীকালীমাতার চিত্রপট জনৈক ভক্তের দ্বারা ভাড়া বাটীতে স্থানান্তরিত করি-ন। এইরূপে নিঃশব্দে, নিভৃতে লোকচক্ষুর অঙ্গণে শ্রীরামরূক্ষ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।” লেখক আরও মন্তব্য করেছেন, “শ্রীরামরূক্ষের জীবন আত্মশক্তির লীলাভূমি। বাল্যকালে মঙ্গল-চণ্ডিকা বিশালাক্ষীদেবীর ধর্মপথে তাঁহার মানসচক্ষে যে মহাশক্তি প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবশরীরীর মূর্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সর্ববিধসাধনে সিদ্ধ করেন, এখন চিত্রপটে বিরাজিতা সেই সর্বশক্তিবহুদণীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীরামরূক্ষের সন্ন্যাসী ভক্তগণের একত্রে মিলন।”^৪ উপযুক্ত পটভূমিকার প্রতিষ্ঠিত রামরূক্ষসম্বন্ধ ইতিহাসের বিচারে কালীশক্তির লীলাভূমি বৈতন্য।

“(বরাহনগরের মঠ) বাটীটি অতি প্রাচীন, চাকীর জমিদার মুল্লীবাবুদের। একটি ঘরে ভবনাথবাবুদের আত্মোন্নতি বিধায়িনী সত্তার লাইব্রেরী ছিল এবং সময় সময় সত্তার অধিবেশনও সেই ঘরে হইত। বাকী পাঁচ ছয়টি ঘরে আমাদের মঠ হইল।”^৫ “(মঠবাড়ীর) পেছনের দিকে শাকসবজির বাগান, সজনে গাছ, একটি বেগগাছ ও কয়েকটি নারিকেল ও আমের গাছ ছিল। একটি পুষ্করীও ছিল।—একটি উড়ে মালী ছিল, তাকে কেলে বলে ডাকত।—নীচের ভগাটার ভিতর বাড়ীর দিকে বহুকালের আবর্জনার ও

৪ শ্রীরামরূক্ষদেব, উদ্বোধন, পৃ: ৪৬২-৩

৫ মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিত ‘বিবেকানন্দ-চরিত’ গ্রন্থে ১০২৬ সনের ১০ই কার্তিক তাং লেখা দ্বারী শিবানন্দজীর ভূমিকা।

অকস্মেৎ এমন ভয়ে গেছলো যে, তা শেরালৈয় ও সাপের বাসা হয়েছিল। কেউ ভয়ে সেদিকে যেত না।...উপরতলার মি'ড়ি দিয়ে উঠে বাম দিকে কালী ভগবতীর ঘর, পরে ছোট ধাপ দিয়ে উঠে ও নেমে ভিতরের দিকে পূজার বোঁগাঙের ঘর (যার মধ্যে মেঝেতে একটি ১ হাত X ১ হাত পরিমিত চৌকো মাটির হোমকুণ্ড ছিল), তার ভিতর দিয়ে ঠাকুরঘরে যেতে হত। দানান ঘর দিয়ে সোজা গিয়ে সামনে বাঁদাঘর, বাম হাতে লম্বা হলঘর (যাকে দানাদেব ঘর বলা হত), তারপর পাশে খাবার ও মুখ-হাত-পা ধোবার ঘর, তারপর একটু অন্ধকার গলি পার হয়ে পাইখানা, নীচে মি'ড়ি নেমে বাগানের ভিতর দিয়ে পুকুরে যাবার পথ।...ঠাকুরঘরে মাঝখানে ঠাকুরের বিছানা—ডুমুর উপর মাদুর, গদি, বালিশ। চাদর দিয়ে করা ছিল ৬ ঠাকুরের কটো ছিল। বিছানার পাশদেশে ঠাকুরের অস্থির তাম্রকোট। ও পাড়কা চোতিতে রাখা ছিল।”৬

শ্রীমতী মাসের উপর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের অধিকাংশই মঠে যোগদান করেছেন। ঠাকুরের জন্মসময় পয়ে কালীপ্রসাদ, শরৎ ও বাবুবাম পুরীধামে যান এবং প্রায় দুমাস সেখানে সাধনভজন করেন।^৭ এই মে নিরঞ্জন তাঁর গর্ভধারিণী জননীকে দেখতে যান। ইতিমধ্যেই গলাধর পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করেছিলেন। হরি ও তুলসী মাঝে মাঝে মঠে আসেন। হরিপ্রসন্ন তখনও মঠে যোগ দেন নি। ইতিমধ্যে ত্যাগী সন্তানদের অধিকাংশ বিরজাহোম করে আত্মত্যাগিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।^৮

মঠের অবিসংখ্যিত নেতা নরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, মঠে কালীপূজা করবেন। মঠের অল্পতম অন্বেষাদী তাপস লাটু বলেন : “একদিন লরেনভাই এসে বললে—কালীপূজা করবো। আমি সুরেন্দ্রবাবু কালীপূজার সব বন্দোবস্ত করে দিলেন।”^৯ আমাদের মরণ রাখা দরকার, নরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই ত্রিপুরার নির্দেশে বহুবিধ সাধনার সিদ্ধিলাভ করে বহু-আকাজিক ও নির্বিকল্প-ভূমির উত্তর

৬ স্বামী বিরজানন্দ বর্ণিত। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ : অতীতের স্মৃতি, পৃ: ৩৫-৭

৭ স্বামী অন্বেষানন্দ : আমার জীবনকথা, পৃ: ১৪৭

৮ আলোচ্যকালে মঠবাসীদের সন্ন্যাস নাম ব্যবহারের প্রচলন হয়নি। সেকারণে এখানে তাঁদের পূর্বাঙ্গের নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৯ লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃ: ২৮৬

শিখরে আরোহণ করেছিলেন এবং জগন্নাথানির্দিষ্ট লোকসংগ্রহের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নরেন্দ্রের নির্বিকল্প সমাধির চাবিকাঠি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। আবার এদিকে দেখি নরেন্দ্রনাথ ৭ই মে (১৮৮৭) তারিখে মাষ্টার মশাইকে বলছেন : “কত দেখলুম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জল জল করছে। কত কালীরূপ; আরও অস্তিত্ব রূপ দেখলুম। তবু শান্তি হচ্ছে না।”^{১০} আবার তিনি মাষ্টার মশাইকে কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন : “সাধনটান দা আমরা করছি, এ সব তাঁর কথায়। ...আমাদের তিনি সাধন করতে বলেছেন।”^{১১}

নরেন্দ্রনাথ মহামায়ার প্রসন্নভাগ্যের জন্য কালীপূজার আয়োজন করেন। “সৈধ্য প্রসন্ন বরদা নৃপাং ভবতি মুক্তয়ে।” কথাযুতকার লিখেছেন, “পরদিন মঙ্গলবার, ১০ই মে (১৮৮৭)। আজ মহামায়ার বার। নরেন্দ্রাঙ্গি মঠের ভাইরা আজ বিশেষরূপে মায় পূজা করিতেছেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখে ত্রিকোণ যন্ত্র প্রস্তুত হইল, হোম হইবে। পরে বলি হইবে। তদনন্তরে হোম ও বলির ব্যবস্থা আছে।”^{১২}

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মহামায়ার বিশেষ পূজার প্রস্তুতি সম্যকভাবে বুঝতে গেলেন তার পটভূমিকা জানা দরকার। নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অর্থাৎ মাষ্টার মশাই শনিবার দিন (৭ই মে) অপরাহ্নে বরাহনগর মঠে এসেছেন, দিন পাঁচেক থাকবেন^{১৩} ও দেখবেন ‘ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্শ্বদেবের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছেন।’ কয়েকদিন বাস করে মাষ্টার মশাই দেখেন ‘সকলেই রহিয়াছেন; সেই অযোধ্যা, কেবল রাম নাই।’ তিনি আরও দেখেন, ‘ঠাকুর মঠের ভাইদের কামিনী-

১০ কথাযুত ২, পরি-১

১১ কথাযুত ৩, পরি-২

১২ কথাযুত ১, পরি-১

১৩ মাষ্টার মশায় এই কয়েকদিনের আংশিক বিবরণী তিনটি পরিচ্ছেদে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন ‘ভক্তমঞ্জরী’ পত্রিকার অষ্টমবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ সাল)। তার মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ, বরাহনগর মঠের প্রাথমিক পরিচিতি ‘কথাযুত’ তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ কথাযুত প্রথম ভাগের পরিশিষ্টে ‘বরাহনগর’ শীর্ষক নিবন্ধে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ভবকমাত্র ‘মঠের ভাইদের সাধনা’ নিবন্ধে কথাযুতের প্রথম ভাগের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কাকন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এঁরা কেমন ঈশ্বরের ভক্ত ব্যাকুল। স্থানটি যেন লাক্ষ্য বৈকুণ্ঠ। মঠের তাইগুলি যেন লাক্ষ্য নারায়ণ। ঠাকুর বেশী দিন চক্রিমা যান নাই; তাই সেই সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় রহিয়াছে।’

রবিবারে গৃহস্থভক্তেরা কেউ কেউ মঠ দর্শন করতে আসতেন। সে সময়ে মঠে যোগবাশিষ্ঠের পাঠ ও আলোচনা খুব চলেছিল। বৈরাগ্যের প্রেরণায় সারদাপ্রসন্ন হেঁটে বৃন্দাবন রওনানা হয়েছিলেন, কিন্তু কোমর থেকে ফিরে আসেন। ঈশ্বরদর্শনের ভক্ত মঠবাসীরা সকলেই অভ্যস্ত ব্যাকুল, সকলেরই প্রাণে আটুপাটু ভাব। সর্বোপরি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় ভালবাসা স্বরণ করে সকলেই অশ্রু বিসর্জন করেন আর বলেন : “আমরা তাঁর কি করেছি যে এত ভালবাসা। কেন তিনি আমাদের দেহ মন আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন ?...” মাঠার মশাই মুখ হয়ে শোনেন ত্যাগী গুরুতাইদের সংপ্রসঙ্গ। নরেন্দ্র বলেন : “তিনি (ঠাকুর) বলতেন বিশ্বাসই সার। তিনি ত কাছেই রয়েছেন! বিশ্বাস করলেই হয়। ...বত্ৰঞ্চ কামনা, বাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস।”

সোমবার সকালে মঠের বাগানের গাছতলায় বলে নরেন্দ্র তাঁর প্রাণ-মাতানো কণ্ঠস্বরে শঙ্করাচার্যরচিত ‘শিবাপরামর্শমাপনভোজম্’ আবৃত্তি করেন, “ছাড় বোহ, ছাড়য়ে কুমন্ত্রণা” গান গেয়ে শোনান, ‘কৌপীনপঞ্চকম্’, ‘নির্বাণবটকম্’ ও ‘বাহুদেবটকম্’ স্বর করে আবৃত্তি করেন। সব কিছুর মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রের অন্তঃকরণের তীব্র-বৈরাগ্যের উত্তাপ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আহাের পর নরেন্দ্র ভারক ও হরিশকে নিয়ে কলকাতায় যান। নরেন্দ্রের বাড়ীর যোকদ্দমা এখনও মেরেটনি। আহাের পর মঠের তাইরা একটু বিশ্রাম করছেন, এদিকে বুড়োগোপাল তাঁর স্বন্দর হস্তাক্ষরে একটি গানের খাতা থেকে নকল করছেন। মাঠার মশাই তাঁর কাছে গিয়ে বলেন। কথা-প্রসঙ্গে বুড়োগোপাল বলেন তাঁর এক গুহ্য অভিজ্ঞতার কাহিনী।

বুড়োগোপাল : “এটা কাউকে বলিনি—কল্যাণেশ্বর গেছি—শিবরাত্রির উপোস করে শিবপূজা করতে গেছি—হঠাৎ দেখি নিম্ন ঠেলে উঠলো—তাঁর পাশে শিব ও ব্রহ্মবাহন ও শক্তি। জীবন্ত চৈতন্যবর।”^{১৪} মুগ্ধবিশ্বয়ে মাঠার মশাই শোনেন এই দিব্যকাহিনী।

১৪ শ্রীমত মাঠার মশাইর ভায়েবী, পৃ: ১৮৩

বিকালে রবীন্দ্র^{১৫} উন্নতের মত মঠে উপস্থিত হন। শুধু পা, ধূতি আঁধারানা পরা, উন্নতের জার জার চোখের চাহনি। কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। ঠাকুর ঐরাবতেশ্বর কৃপালাভ করে ধন্ত হয়েছিলেন। তাঁর অনেক লক্ষণ। ইমানীং এক বাগাননার মোহে পড়ে তিনি হাবুড়ু খাচ্ছেন। বেড়াকে বিখ্যাতক মনে করে আজ তিনি মঠে এসে উঠেছেন। সুবক ঠাকুর ঐরাবতেশ্বর কৃপাপ্রাপ্ত, হুতরাং মঠবানীরা তাঁকে আশ্রয় দেন। বাজে নরেন্দ্র মঠে ফিরে রবীন্দ্রের কাহিনী শোনেন। দানাদেব ঘরে বসে নরেন্দ্র “ছাড় মোহ, ছাড়বে কুমন্ত্রণা” ইত্যাদি ও “পীলে বে অবধূত হো মতবারা” ইত্যাদি গান দুটি গেয়ে যেন রবীন্দ্রের শুভবুদ্ধিকে উদ্ভুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। চৈতন্যদেবের প্রেম বিতরণ নরেন্দ্র পাঠ করে শোনান। শশী মন্তব্য করেন : “আমি বলি কেউ কাককে প্রেম দিতে পারে না।” নরেন্দ্র বলেন : “আমার পরমহংস মশাই প্রেম দিয়েছেন।”

পরদিন মঙ্গলবার, কৃষ্ণ তৃতীয়া, ২৮শে বৈশাখ, ১২২৪ সাল। ইংরাজী ১০ই মে। মঠের ভাইরা কালীপূজা করবেন। কালীপূজার প্রস্তাবে সকলেই বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন। নরেন্দ্র বলিদানের প্রস্তাব করেছেন, মঠের কোন কোন অন্তঃবানী সার দিতে পারেন না। কাকের কাকের মনে খটকা বাধে। বিশেষ করে সেই সময়ে দয়াবতার বুদ্ধদেব ও প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চর্চাতে মঠবানীরা মেতে উঠেছিলেন। মঠের তাপসদের মতবিশিষ্টতার ছবি এঁকেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। “সম্ভবতঃ ১৮৮৭ সালে বরাহনগর মঠের প্রথম কালীপূজা বা অপর কিছু হইয়াছিল। তাহাতে পাঠাবলি দেবার কথা হয়। তাহাতে রাখাল মহারাজ মনঃক্লান্ত হইয়া রহিলেন, তাঁহার মত ছিল না। জনকয়েকের সেইরূপই মত—বলি হইবে না; কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা, বলি দেওয়া হইবে। তিনি জোর করিয়া বলিলেন, “আরে একটা পাঠা কি, যদি মাহু বলি দিলে তপসবান পাওয়া যায় তাই করতে আমি রাজী আছি।”^{১৬} বলাবাহুল্য, হির হর পাঠা বলি দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ বসিমাহাত্মা সবকে লিখেছিলেন,

১৫ মঠের মশাইর ডায়েরীতে নামটি পাই ‘জ্যোতিন’ বা ‘যোতিন’। সম্ভবতঃ সুবক দুটি নামেই পরিচিত ছিলেন।

১৬ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১১২

‘সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নির্বীৰ, ধর্মহীন, বিজ্ঞানহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন!...বলিহান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, কলও তজ্জপ। ছাগ-মহিষ-বলি ত অহুকল্পমাত্র। কৃষকের শোণিতদান, যে উদ্দেশ্যে পূজা দে উদ্দেশ্যে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার শক্তিপূজাতেই ফলসিদ্ধি অসম্ভব। সর্বত্যাগে অমরত্বলাভ, বিজ্ঞান জন্ত ত্যাগে বিজ্ঞানাত, ধনজন্য ত্যাগে ধনলাভ, প্রভুত্বের জন্য ত্যাগে প্রভুত্বলাভ, এইরূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ বা বলিমাহাত্ম্য নিত্যপ্রত্যক্ষ।’^{১৭} এখানে মঠবাসিগণের তহ-মন-প্রাণ ভগবৎ-চরণে উৎসর্গীকৃত। সেই কারণে ত্যাগের অহুকল্প গন্তবলির মাধ্যমে তাঁদের শক্তিপূজা হয় সার্থক।

মঙ্গলবার সকালবেলা। নির্মল আকাশ। মাঠার মশাই গঙ্গানানে ঘান। রবীন্দ্র মঠবাড়ীর ছাদে বেড়ান। এদিকে নরেন্দ্র ভাবাবেগের সঙ্গে স্তব করেন,

‘ও মনোবুদ্ধ্যহকারচিত্তানি নাহং
ন চ প্রোক্তমিহেন ন চ জ্ঞাপ-নেজে।
ন চ ব্যোমভূমিন তেজো ন বায়ু-
চ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।’^{১৮}

তারপর নরেন্দ্র গান ধরেন : ‘পীলে যে অবধূত হো মতবারা, প্যালা প্রেম হরিরসকা রে।’ ইত্যাদি।

নরেন্দ্র বুড়োগোপালকে পাঠিয়েছিলেন বলিহানের উপযুক্ত একটি ছাগল বা ভেড়া জোগাড়ের জন্য। গোপাল কিছুকণ পরে এসে জানান যে উপযুক্ত ছাগল বা ভেড়া জোগাড় করা গেল না। শশী পূজার আয়োজন করতে ব্যস্ত ছিলেন, নরেন্দ্র শশীকে ডেকে বলেন : তুই একবার যা না।

শশী : ছাগল সঙ্গে করে আনা—আরেকজন কাককে সঙ্গে দাঁও তো ভাল হয়।

নরেন্দ্র : তুই নিজে একবার যা না।

শশীকে বিধাগ্রস্ত দেখে নরেন্দ্র তাকে যেতে বাধ্য করেন। নরেন্দ্র

১৭ শক্তিপূজা, উষোধন, আশ্বিন, ১৩৫৭

১৮ নির্বাণঘটক

স্বহিত্তিধরে গীতাপাঠ করতে থাকেন। শশী নিজেই পূজার বিভিন্ন আয়োজন শেষ করে পূজা করতে বসেন। ১২

বেশ কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্র গীতাপাঠ সমাপ্ত করে বেরিয়ে যান বলির পুত্র জোগাড়ের জন্য। সেসময়ে মাষ্টার মশাই যান ৮ চিত্তেশ্বরী সর্বমঙ্গলার মন্দিরে। মন্দিরে প্রণামাদি সেয়ে তিনি নিকটেই মহিমা চক্রবর্তীর বাড়ীতে যান। মহিমা পাণ্ডিত্যভিনয়ী। নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। মাষ্টারমশায়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রাঙ্গণি কর্মে পুস্তকটির বিধি লক্ষ্যে শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করেন।

মাষ্টার মশাই মঠে এসে দেখেন রবীন্দ্র গন্ধামান করে ভিজে কাপড় নিয়েই ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে এসেছেন। নরেন্দ্র মাষ্টার মশাইকে বলেন : এই নেয়ে এসেছে, এবার সন্ন্যাস দিলে বেশ হয়।

মাষ্টার মশাই : জোর করে দেও না।

সাবদাপ্রসন্ন একখানা গেকরা কাপড় এনে দেন। নরেন্দ্র (মাষ্টার মশায়ের প্রতি) : “এইবার ত্যাগীর কাপড় পরতে হবে।” মাষ্টার মশাই (সহাস্তে) : “কি ত্যাগ?” নরেন্দ্র : “কামকানন-ত্যাগ।” রবীন্দ্র গেকরা বসনখানি পরে কালীতপস্বীর ঘরে ধ্যান করতে বসেন। ঠাকুরঘরে শশী নিত্যপূজার পর মহা-সারার বিশেষ পূজা করতেন। তাঁর উদ্ভাস্ত কণ্ঠে শোনা যায় ধ্যানের মন্ত্র :

ও মেঘাকীং বিগতাস্বরাং শবনিবারতাং জিনেত্রাং পরাং
কর্ণালম্বিনুগুণ্ডগুণ্ডভরদাং মুণ্ডমজাং ভীষণাম্।
বামাধোক্ষ করাধুজে নরশিরঃ খড়্গাঞ্চ সব্যোতরে
দানাতীতি বিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সৰ্বা কালিকাম্ ॥

মঠের তাইয়েরা কেউ ধ্যান করতেন, কেউ স্তবপাঠ করতেন, কেউ ভগ্নধারকের কাজ করতেন। দিব্যভাবে ঠাকুরঘর গম্গম্ করে ৮ শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমূর্তির তাব ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন : “হস্তে খড়্গ, গলার মুণ্ডমালা, পদতলে শিব, এসকলের তাব এই—জীব কালীর শরণাগত হইলে প্রাথমিক খড়্গদ্বারা ত্রিগুণিকে খণ্ডন করেন। ত্রিগু সকল খণ্ড খণ্ড হইলে তাহার কোথায়

১২ লাই মহারাজের স্মৃতিকথাতে পাই : “হরবধঃ শশী তাদের চিন্তা ছিলো ঠাকুরের সেবা কেমনভাবে চলবে, কি কি দেওয়া হবে, আর কখন কোনটা দেওয়া হবে। তাঁর পূজার সব কাজ সে নিজে হাতে করতো।...হামাদের বলতো—তোদের কোন ভাবনা নেই, তোরা সাধনভজন নিয়ে পড়ে থাক। এঁর (ঠাকুরের) ঘোঁলতে সব জুটে যাবে।” (পৃ: ২৮২-৩)

হাইবে, তাহাদিগকে স্বয়ং গলদেশে এবং হস্তে রাখিয়া দেন অর্থাৎ তাঁহাতেই থাকে। দক্ষিণ চন্ডে জীবকে বসিতেছেন, এম বাবা হরিমামে বিহঙ্গ হইয়া নৃত্য কর। পদতলে শিব তেন ? জীব অটপাশ ছেদন করিলে শিবস্ব প্রাপ্ত হয়। শিব হইয়া শব্দ অর্থাৎ যখন বোল আনা মন সেই ব্রহ্মে লীন হয়, তখন আর মন বিষয়ে না থাকে। প্রযুক্ত সংজ্ঞাসূত্র সমাধি প্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে ব্রহ্মময়ী হৃদয়ে আসিয়া উপর হন।।...”^{২০} আর স্বামীজী বলতেন : “কালীমূর্তিই ভগবানের perfect manifestation।”^{২১} সৃষ্টি স্থিতি লয় সব কিছুই যে কর্তা তিনি— এই তাবটি কালীমূর্তিতে পরিস্ফুট। লীলাময় ব্রহ্মই কালী।

এদিকে নরেন্দ্রনাথ নৈবেদ্যের ঘরে মাটির হোমকুণ্ডে ত্রিকোণযন্ত্র প্রস্তুত করেন। তন্ত্রগান-উদ্ভাসতে “বিন্দু শিবাত্মক।...বিন্দুই উচ্চুন হয়ে ত্রিকোণাকার প্রাপ্ত হয়।...বিন্দু পরাশক্তি।...ত্রিকোণ ত্রিবীজস্বরূপ। ত্রিবীজ অর্থ ত্রিপুর-স্বন্দরীর মস্তকের বাগ্‌ভব, কামরাজ এবং শক্তি এই ত্রিখণ্ডাত্মক বীজ বা কুট।... এই ত্রিকোণের তিন কোণে আছেন তিন দেবী। কামেশ্বরী অগ্রকোণে, ব্রহ্মেশ্বরী দক্ষিণকোণে এবং ভগমাপিনী বামকোণে। এই তিনজনই চক্রেব আবরণদেবতা—এদের বলা হয় অতিরহস্তযোগিনী।”^{২২}

বলিদানের পর ত্রিকোণযন্ত্রের উপর হোম হবে। হোমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে, ইন্ড্রিয়সমূহের দ্বারা বেদ সব কিছুই হবি, ইন্ড্রিয়সমূহ ক্ষু। জীব অবস্থিত পরমশিবই অগ্নি এবং জীব এখানে হোতা। হোমের অপব্যয়কাল সাধকের পারমার্থিক স্বরূপলাভ, নির্গুণব্রহ্ম সাক্ষাৎকার।

পূজক শবীর পূজা শেষ হলে সাধনা লক্ষণযুক্ত পণ্ডকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসেন উৎসর্গের জন্ত। পণ্ডর গলার রক্তমালা। নরেন্দ্রনাথ ভূতাপসারণ করে অর্ঘ্যজলে পণ্ডর প্রোক্ষণ করেন, মন্ত্র বলেন, ‘উদ্‌বুধ্যত পশো জ্ব হি নাপরম্ম শিবোহসি হি। শিবোৎকৃত্যমিদং পিণ্ডমতজ্জ শিবত্যাং ব্রহ্ম।’ (হে পণ্ড, উদ্‌বুদ্ধ হও, তুমি শিব, অপর কেউ নও। তোমার এই পিণ্ড শিবের

২০ সোদীন তারিখ ২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮২ খ্রীঃ। স্থান দক্ষিণেশ্বর।

প্রোতা—মনোমোহন রাম ব্রহ্মেন্দ্র নরেন্দ্র ও নৃত্যগোপাল। (তন্ত্র-মঞ্জরী, নবম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, পৃঃ ২৫২)

২১ শিবানন্দবাকী, প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ), পৃঃ ১৪৭

২২ উপেন্দ্রকুমার দাস : শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ ৮২৪-৫

আরা ছেদনীয়, এমনি ছিন্ন হয়ে তুমি শিবস্থ লাভ কর।) অনুষ্ঠীকরণের পর সিঁহুর গন্ধ পুষ্প দিয়ে 'ও এতে গন্ধপুষ্পে ছাগার পশবে নমঃ' মন্ত্রে পশুর পূজা করেন। বাম হাতে যজ্ঞপত্রকে ধরে মূলমন্ত্রে তত্ত্বহুতায় সাতবার প্রোক্ষণ করেন, পশুর দক্ষিণ কানে বলেন পশুগায়ত্রী, "পশুপাশায় বিদ্রুহে বিশ্বকর্মেণ বীমহি তমো জীবঃ প্রচোদহাৎ।" অতঃপর "(বীজ) কালি কালি বজ্রেশ্বরী লৌহহুতায় নমঃ" মন্ত্রে যজ্ঞপূজা করেন, স্তবপাঠ করে প্রণাম করেন। যজ্ঞের পশুকে নীচে নিয়ে বাওরা হয়। রবীন্দ্রের নবম মন। বৈষ্ণববংশে জন্ম, বাঙালিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। রবীন্দ্র আর্তনাদ করে ওঠেন : "এখানেই ওর দম আটকে যাবে—একটু দড়িটা ঢিলে করে দাও।" ছাগ-শিত্তর 'ব্যা ব্যা' তাক শুনে অতিভূত মাঠার মশাই জোরে বণ্টা বাজাতে শুরু করেন, যাতে ছাগশিত্তর তাক শুনে না হয়। রাখালেরও মন খারাপ, তাই অস্ত্র সকলে দি'ড়ি দিয়ে নেমে গেলে তিনি মাঠারমশাইকে অহুযোগ করে বলেন : "আপনি কেন বারণ করলেন না ?"

এদিকে অহুষ্ঠানে যোগদানকারী অন্ততম তাপস তারক বলিদানের সময় তাপগদের মধ্যে যে দিব্যতাবের সঙ্গার হয়েছিল তা স্মরণ করে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট বলেছিলেন : "যজ্ঞে যে পশু ব্যবহার হয় তাতে আর পশুর থাকে না। বরাহনগরে আমবা বলি দিয়ে পূজা করি। পশুর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন দেবতা ভাবনার পর আর তাকে পশু বলে বোধ হয় না—মতি্য বলছি ঠিক স্নেন দেবতা বলে বোধ হয়েছিল।" ২৩

পশুদের বাগানে বেলতলাতে ২৪ যুগলও স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হয়েছেন নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, সারদা, তাদক, হরিশ বুড়োগোপাল, মাঠার মশাই, রবীন্দ্র প্রভৃতি। কালর বণ্টা বাজতে থাকে। একজন তাপস আবার খোল বাজাতে থাকেন : ২৫ ছন্দক 'জর-মা' উচ্চারণ করে

২৩ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কথা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, উদ্বোধন, পৃ: ১৪০

২৪ ২১শে কেক্রয়ারী ১৮৮৭ খ্রি: শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এই বেলতলাতেই চার প্রহরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২৫ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : "বাবুয়ার তাত্তাতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়া খোল বাহির করিয়া আনিয়া বাজাইতে লাগিলেন। বলি হইয়া গেল, সব চুকেচুকে গেল। তার কয়েকদিন পরে সকলে বাবুয়ার মহারাজকে ঠাট্টা শুরু করিল—'ভালা বৈয়িগীর বিটকিলিমি, খোল বাজিয়ে বলি করা'।" (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ শ্রাবীজীর জীবনের

(২৫৭)

বলিদান ২৬ করেন ও সমাসেক্ষিয় ঘেবীকে নিবেদন করেন। হরিশের মনে খুব আনন্দ হয়, তিনি আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন।

বলিদানের পর শশী পূজার বাকী অঙ্কঠান সম্পন্ন করতে ব্যস্ত হন। সারদা-প্রসন্ন ধ্যান করে গিয়ে ঐক-গীতা পাঠ করতে থাকেন। ঠাকুরঘরে গিছে বলেন তারক ও হরিশ। মাটার মশাই তাঁদের নিকটেই বলেন। বলিদানে তিনি সর্থাহত হয়েছেন। তিনি ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে পারেননি। ২৭

মাটার মশাই নীচুগঙ্গার তারককে জিজ্ঞাসা করেন : “এতে (বলিদানে) কি হয় ?”

তারক : “কেন, কি হবে ?”

মাটার মশাই : “জান না ভক্তি ?”

তারক : “যারা নিজার কর্ম করে তারা কোন ফলই চায় না।”

মাটার মশাই : “জান ভক্তিও না ?”

তারক : “না।”

মাটার মশাই : “মাথায় সিঁহর এসব দিহে...।”

হরিশ : “অমন হাতে গ্রাণ গেল ওর মহাতাণ্ড।”

মাটার মশাই (হরিশকে) : “তবুও বেলতলার শিবের সম্মুখে বলিদান।”

হরিশ মাটার মশাইকে চাপা গলায় বলেন : “এদিকের দরজাটা বন্ধ করুন।”

হরিশ যেন তাবাবিষ্ট হয়েছেন। মাটার মশাই দরজা বন্ধ করলে হরিশ বলেন : “একথা কাককেবলিনি—দেখলাম কালীঘর—দেখলাম না কালী

ঘটনাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃ: ১১২) ভাপন বাবুরায় অল্পপস্থিত ছিলেন। মনে হয় অপর কেউ খোল বাজিয়েছিল।

২৬ স্বামী শিবানন্দজী বলেছিলেন : “আর একবার মঠেই স্বামীজী বলি ছোর করেন—বলেন, ‘ওসব লোভের খাওয়া টাওয়া হবে না’।” (শ্রীমহাপুরুষজীর কথা ও সংশ্লিষ্ট জীবনচরিত, পৃ: ১৪০)

২৭ শ্রীম বলেন : “যখন ছেলেবেলার মায় সজে কালীঘাটে যেতাম, লেখানকার পাঁঠাবলি দেখে মনে হত বড় হলে বলি তুলে দেব। পকে যতই বয়স হতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম, ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিবোধ করবার কারও সামর্থ্য নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ও হচ্ছে।” (স্বামী ভগদ্বানন্দ : শ্রীম কথা, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন, জীবনী-অংশে উদ্ধৃত)

সরে দাঁড়ালেন না, তাঁর পা শিবের বুক। আবার দেখি শিবই কালী হয়েছেন। 'যিনি শিব তিনিই কালী' এটা অহুমানের কথা নয়, প্রত্যক্ষ দেখলাম।" সেই সঙ্গে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনোপলব্ধির বিষয় উল্লেখ করেন।

মাষ্টার মশাই চুপ করে থাকেন। তাঁর স্মৃতিতে উদ্ভিত হয় শি'পড়ে মারার ঘটনা, যা বাবাকে ভা'গ করা সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি। তাঁর মনে পড়ে, ঠাকুর বলতেন যে, মোকদ্দমা জেতা, পাঠাবলি দেওয়া এসব তমোভক্তির লক্ষণ। ২৮

একটু পরে মাষ্টার মশাই নীচে নেমে দেখেন কোমলকন্দর স্ববীজ শি'ড়ির ধারে নির্জনে কানছেন। মাষ্টার মশাই স্ববীজকে নিয়ে নীচের ঘরে বসে কথা বলেন। বসিন্দানের অন্ত স্ববীজের প্রাণে আঘাত লেগেছে। মাষ্টার মশাই বলেন : "বলি একটি সাধনের অঙ্গ। শাক্তেরা বলিধান করেন। তবে সকলের ভাল লাগে না। কিন্তু তব্বে আছে, দোষ নাই।"

স্ববীজের মনে বিষয় বসে। একদিকে স্তম্ভ সংস্কারবাশি, অস্তদিকে বাঁধাকনার প্রতি আকর্ষণ। মাকে মাঝে তাঁর স্তম্ভচ্ছার উদয় হয়, আকাক্ষা হয় নর্যদাতীরে বা অন্তরে গিয়ে নির্জনবাস করেন। মাষ্টার মশাই তাঁকে অহুরোধ করেন মঠে বাস করে সাধুনক করার অন্ত। পরলপ্রাণ স্ববীজ খেদ করে বলেন : "আর সাধুনক ! ধ্যান করতে যাই, সেই মুখ মনে পড়ে। ঈশ্বরের নাম করতে যাই, সেই নাম করতে ইচ্ছা হয়।" মাষ্টার মশায়ের মনে পড়ে ঠাকুরের কথা, যখন ভা'কাত পড়ে তখন পুলিশে কিছু করতে পারে না। ভা'কাত হলে গেল পুলিশে এসে গ্রেপ্তার করে। মাষ্টার মশায়ের সব অহুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে স্ববীজ বাঁধাকনার কাছে কিরে যাবার অন্ত অর্ধৈর্ষ হয়ে ওঠেন, আবার বলেন : "আমি যেখানে যাই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনায় পায়ে হাত দিয়ে বসছি—আপনি বিশ্বাস করুন—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যে মিথ্যা কথা কখনই কইবো না; পরোপকার করবো সাধ্যমতে; কাপড়চোপড়, আসবাব, বাবুয়ানা এ সব তাতে কখনও লিপ্ত থাকবো না।"

২৮ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : "যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমন দেখে। তমোভুক্তী তত্ত্ব; সে "দেখে মা পাঠা ধায়, আর বলিধান দেয়।" (কথামৃত ২.১০:৪)। আবার তিনি বলেছেন : "বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, শাক্তে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। বিবিবাবীর বলিতে দোষ নাই।" (কথামৃত ৫.৪।২)

রবীন্দ্র কিছুটা প্রকৃতির হলে মাটার মশাই বলেন : “পরমহংসমশায়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, তাঁর একটু গল্প বলুন।”

রবীন্দ্র : “প্রথম দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাই। তাঁকে দেখে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আপনি দূতী হতে পাবেন ? (অর্থাৎ ষটকালি করে ঈশ্বরকে জুটিয়ে দিতে পাবেন ?) তিনি কাউতলা হতে এসে বললেন, ‘তুই কি বলছিলি, দূতী হতে পার না কি?’ তারপর লাটুকে বললেন, ‘এই কি ভাব জানিস ? বুকে কৃষ্ণকে নিতে এসেছে—শ্রীমতীর কাছে নিয়ে যাবে। শ্রীমতীকে জুটিয়ে দেবে।’^{২০} লাটুকে এই কথা বলতে বলতে পরমহংসদেবের তাৎপর্যমাধি হয়ে গেল—একেবারে নিষ্পন্দ দেহ—সমাধিস্থ।

“তারপরে বললেন, ‘তোমার দেহী হবে। তোমার ভোগ আছে। তাকাত যখন পড়ে, তখন পুলিশ কিছু করতে পারে না। তারপর গ্রেপ্তার’।”

মাটার মশায় : “তারপর ?”

রবীন্দ্র : “তারপর সন্ধ্যার সময় লক্ষবটীতে আমার জিতে তাঁর মুখামুখ আঙ্গুলে করে দিলেন ও জিতেতে কি লিখে দিলেন।”

মাটার মশায় : “তারপর ?”

রবীন্দ্র : “তারপর আমার বললেন, ‘তোমার ঠাকুর দেবতার বিশ্বাস আছে ?’ আমি বললাম, ‘আছে’। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি দেবতা ভাল লাগে ?’ রবীন্দ্র বলেন যে, দেবতার মধ্যে তাঁর প্রিয়তম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আর ‘রাধা’ নামটি তিনি ভালবাসেন। ঠাকুর তাঁকে ঐ নাম জপ করতে বলেন।

স্বভিন্ন কুঠরি উন্মোচন করে রবীন্দ্র আশ্বও বলেন যে, তিনি ‘বৃষকেতু’ নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে ঠাকুর তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি মেবার ঠাকুরের কাছে তিনদিন বাস করেছিলেন। রবীন্দ্র লক্ষ্য করেন যে ঠাকুরের ঘন ঘন ভাব হয়। ‘কেন এরূপ হয়’, রবীন্দ্র

২০ ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার পাদটীকায় মাটার মশাই লিখেছেন : “To understand the allegory it may be taken as a general rule that Radha represents the soul, the evangelist, and Krishna, of course the Deity. The glowing stanzas of Vidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human consciousness as the song of Solomon is by the Christian priest.”

—Grierson’s Vidyapati.

জানতে চাইলে ঠাকুর বলেছিলেন : “কেন হয় জানিস ? আমি দেখতে পাই ঈশ্বরই এই জীবজগৎ হয়েছেন । তিনিই সব । যেন জগতের মা নাচছেন দেখতে পাই ।”

এই কথা বলতে বলতে রবীন্দ্রের সর্বশরীর রোমাঙ্কিত হয়ে ওঠে । মাঠায় মশাই বিস্মিত হয়ে শ্রবণ করেন ঠাকুরের উক্তি, অস্তর শুদ্ধ না হলে ভগবানের নামে বা চিন্তায় রোমাঞ্চ হয় না । মুখ্য মাঠায় মশাই রবীন্দ্রকে বলেন : “তোমার মত শুদ্ধ দেখিনি । ঠাকুর স্বাক্ষর তোমাকে অত ভালবেসেছেন, আর হরিনামে তোমার রোমাঞ্চ হয় । তুমি আমার মাথায় বসবার উপযুক্ত ।”

রবীন্দ্র জিত কাটেন ও বলেন : “অমন কথা বলবেন না । আমি পাবও — এখনই হয়তো দেখানে যাব ।”

“এঁরা (ত্যাগী তাপসেরা) তাঁর ভক্ত, আর এঁদের কোমার বৈরাগ্য, এঁদের মত শুদ্ধাত্মা আর কোথায় পাবেন ?...এঁরা কামিনীকাকন ত্যাগী । আর তিনি এঁদের এত ভালবেসেছেন” ইত্যাদি বলে মাঠায় মশাই রবীন্দ্রকে আবার অত্মরোধ করেন করেকদিন মঠে বাস করার জন্য । রবীন্দ্র বলেন : “হাঁ, এঁরা মহাপুরুষ । আমি এঁদের প্রণাম করি ।”

অনেকক্ষণ হয় ত্রিঐঠাকুরের সামনে হোমাহুটান আরম্ভ হয়েছে । ঠাকুর-ঘর হতে মাঠায় মশাই ও রবীন্দ্রকে কয়েকবার ডাকা হয়েছে । দেশব ভূণে গিয়ে মাঠায় মশাই সাগ্রহে রবীন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করছিলেন । এবার তাঁরা ঠাকুরঘরে গিয়ে বলেন । কিছুক্ষণের মধ্যেই হোম সমাপ্ত হয় । তারক উপস্থিত লকলের কপালে হোমতিলক দেন । নবরত্ন বেদ ও তন্ত্র পড়াশোনা করেছেন । তিনি মঠের ভাইদের হোমের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে বলেন ।

বুড়োগোপাল মন্তব্য করেন : “দেবতারা কেবল হোমেই তুষ্ট ।”

রবীন্দ্র : “আর কিছুতে না ? যদি কেউ পরোপকার করে, তাতে কি তাঁরা তুষ্ট হন না ?”

বুড়োগোপাল : “তাঁরা উপকার, অপকার কিছু চান না ।”

ভোগারাজিকের পর সকলে একত্রে আনন্দ করে প্রসাদ ধারণ করেন । কিয়ৎক্ষণ পরে মাঠায় মশাই, রবীন্দ্র ও হরিশ পশ্চিমের বাগানে মানীর বেকের উপর বসে কথাবার্তা বলেন ।

হরিশ স্মৃতি উদঘাটন করে বলেন : “পঞ্চাঙ্গীতে তাঁর পায়ে অঙ্কিয়ে ধরলাম । বললাম একবার আমার সেই ঈশ্বরের রূপ দেখান ।”...

মাষ্টার মশাই : ‘তিনি কি বললেন ?’

হরিশ : “তিনি নিজের সেই মাহুঘমূর্তি দেখিয়ে বললেন, ‘এই ঝাথ ।’ কাটাবার জন্ত আমার ঐ কথা বললেন, কিন্তু ক্রমে আমার শরীর যেন কাঠের মত হয়ে গেল । আমার একজন কোলে করে ঘরে নিয়ে গেল । ঠাকুর বললেন, ‘একে চিনির পানা খাওয়া ।’ লাটুকে বললেন, ‘একে নাইয়ে নিয়ে আয় ।’ আমার তখন হ’ল হয়েছ আর লজ্জা হয়েছে । আমি আপনি নাইতে গেলাম ।” ৩০ কিছুক্ষণ পরে হরিশ গান ধরেন :

“বসিয়ে গোপনে একাকী বিরলে,

বিচিত্র জগৎ সৃজন করিলে,

গুরু হয়ে জ্ঞান ধর্ম শিক্ষা দিলে,

ভবার্ণবে নিজে হলে কাণ্ডারী” ইত্যাদি ।

দে-সময়ে তিনজনেই বোধ করি ত্রিগুরুর ভাবনার মশগুল । তারপর রবীন্দ্র আপনাআপনি গান ধরেন :

“হরি আপনি এসে যোগীবেশে করেছ নাম সঙ্কীর্তন ।

প্রেমের হরি প্রেমে করেছ নাম বিত্তরণ ॥” ইত্যাদি ।

বিকালবেলা মাষ্টার মশাই ও রবীন্দ্র গঙ্গার ধারে মল্লিকের ঘাট, পদামানিকের ঘাটে বেড়িয়ে মঠে কিংবদন্তি দেখেন ‘দানাদেব ঘরে’ নরেন্দ্র গান গাইছেন । রবীন্দ্রের অনুরোধে নরেন্দ্র ‘পীলে রে অবধূত হো মত্তবারা, প্যালা প্রেম হরিরসকা রে’ ইত্যাদি গানটি গান ।

সন্ধ্যার পূর্বে বাথাল ও মাষ্টার মশাই বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে গল্প করেন । মাষ্টার মশাই বলেন যে রবীন্দ্র বলির সময় সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খুব কেঁদেছিল । বাথালের ব্যথিত হৃদয়তন্ত্রীতে যেন টান ধরে । বাথাল বলেন : “নরেন্দ্র সাধকের ভাবে করেছেন । কিন্তু আমারও মন কেমন করছিল । রবীন্দ্রের ভাব আমি একটু বুঝেছিলাম—নরেন্দ্রকে বলেওছিলাম । আপনি একবার নরেন্দ্রকে বলবেন ।”

ঠাকুরঘরে আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে । ভক্তেরা সমন্বয়ে গাইছেন : ‘জয় শিব ঔকার, ভজ শিব ঔকার । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশিব হর হর মহাদেব ॥’ শব্দ ভাবোন্মত্ত হয়ে আত্মজিক করেন ।

৩০ ত্রিভুত মাষ্টার মশাইয়ের ভায়েবী, পৃ: ১৮৭ ।

স্নাত্তে আহাৰাদিৰ পৰ পানৈৰ ঘৰে হাত্তবসেৰ কোয়াৰা ছোটে । পানৈৰ ঘৰ দানাদেৰ ঘৰেৰ উত্তৰে ও স্নাত্তবসেৰ পশ্চিমে । সেখানে উপস্থিত হইলেন শশী, তায়ক, বুড়োগোশাল ও মাটোৰ মশাই । দেখা গেল বুড়োগোশাল নাচিলেন । তায়ক মাটোৰ মশায়েৰ গলা ধৰে সহাস্তে নেচে নেচে বল্লেন : “মাটোৰ মশাই, আপনাকে কেউ চিনলে না !” আহুদে তায়কনাথৰ কাও দেখে শুনে সবাই হো হো কৰে হেসে ওঠে ।

পৰদিন বুধবাৰ । সকালবেলাৰ জানা যায় যে গত বাতৰুপুৰেৰ পৰ ববীজ পানিয়েছিল । ববীজৰ অন্ত সকলেই জুখিত । নৱেন্দ্ৰ বলেন : “বহাৰায়াৰ অহু-এহ না হলেকাৰ সাধ্য বাখে ?” শশী বলেন : “তুমি বুঝিয়ে বাখতে পাৰলেনা ?”

নৱেন্দ্ৰ : “ওহে, বুঝিয়ে তৰ্কেৰ দ্বাৰা কি মাছবকে বাখা যায় ? তিনি কি আমাদেৰ তৰ্কেৰ দ্বাৰা বশ কৰেছিলেন ? তিনি ভালবাসাৰ দ্বাৰা বশ কৰেছিলেন ।”

তাঁদেৰ মনে পড়ে ঠাকুৰ ত্ৰীৰামভূঞাৰ ভালবাসাৰ মোহিনী শক্তিৰ কথা । কানীপুৰে ঠাকুৰেৰ পীড়া শুনে হীৰানন্দ ছুটে এলেছিলেন অম্বুৰ সিদ্ধেশ্বৰ হতে । ঠাকুৰ তাঁকে বড় মেহ কৰতেন । তাঁৰ বালকেৰ মত মধুৰ স্বভাব দেখে ঠাকুৰ একদিন তাঁৰ মূখে চুমো খেয়েছিলেন । শশীৰ মূখে এই ঘটনা শুনে নৱেন্দ্ৰ বলেন : “আমাৰ ববীজ বিজ্ঞাসা কৰছিল, মশ বছৰেৰ অভ্যাস যায় কিনা ? অভ্যাসেৰ দ্বাৰা একটা tendency হয় । অনেকবাৰ একটা কাজ কৰতে কৰতে tendency জন্মায় ।”

কিছুক্ষণ পৰে দানাদেৰ ঘৰে কয়েকজন সমবেত হন । নৱেন্দ্ৰ বাখাল শশী ও মাটোৰ মশাই ববীজৰে সখছে কথা বলেন । হৰিশ একটু মূৰে শুয়ে ছিলেন । মাটোৰ মশাই বাখালেৰ ইচ্ছিত অহুসৰণ কৰে নৱেন্দ্ৰকে বলেন : “(ববীজ) বলছিল, এঁৰা মহাপুৰুষ, আনি প্ৰণাম কৰি । তবে বলিহান দেখলে আমাৰ প্ৰাণ কাঁদে ।”

বাখাল (মাটোৰ মশায়েৰ প্ৰতি) : “আৰ কি বলেছে, এখানকাৰ চেয়ে আমাৰ বাড়ী ছিল ভাল ।”

মাটোৰ মশাই : “হী বলেছে বটে, সেখানে নির্জন, জনবহুল আসে না । সেখানে বেশ ঈশ্বৰ চিন্তা হয় ।”

এজন সৰু শশী বক্তব্য কৰেন : “আমাদেৰ কৰ্মকাণ্ডটা উঠে যায় তো বেশ হয় ।”

স্বাধীন (নরেন্দ্রের প্রতি) : “আচ্ছা, তোমার সমস্ত দিনের ভিতর কি একবারও মন খারাপ হয় নি ?”

নরেন্দ্র গভীরভাবে বলেন : “সাধনের জন্ত মাছুষ কাটতে পারা যায় । (সকলের হাত) খাবার জন্ত কাটা আলাদা কথা ।”

মাটির মশাই : “আচ্ছা .নরেন্দ্রবাবু৩১, আর কখন এরকম বলি হয়েছিল ?”

নরেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন । তিনি বলেন : “সাধনের জন্ত এই first আর এই last ।”

- ৩১ মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন : বরানগরের মঠে পরস্পরকে নাম ধরে বা বারু বলে ডাকা হত । যার সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ, যেমন সাধারণে পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া থাকে সেইরূপই হ’ত ।... ‘মহারাজ’ শব্দটা আলমবাজার মঠের শেষকালে বা বেলুড় মঠে হয়েছে । (মহাপুরুষ শ্রীমৎ শ্রী শিবানন্দ মহারাজের অস্থধ্যান, পৃ: ৪৬-৪৭)